মনভ্রমরা

সুবোধ ঘোষ

ক্যালকাটা পাবলিশার্স
১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

নূতন সংস্করণ : ফাল্গুন, ১৩৬৬

প্রকাশক : মলয়েন্দ্রকুমার সেন
১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রক : প্রাণকৃষ্ণ পাল
শ্রী শশী প্রেস
৪৫, মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ শিল্পী : গণেশ বসু

॥ দাম তিন টাকা

॥ মনভ্রমরা ॥

এই লেখকের

ভারত প্রেমকথা

সীমন্ত সরণি

ফসিল

শ্রেয়সী

সুজাতা

মনভ্রম

মনভ্রমরা

মনভ্রমরা অর্থ মন নয়, ভ্রমরাও নয়। দেখতে বেশ সুন্দর যে-মেয়ে যখন তখন গুন্‌গুন্‌ ক'রে গান করে, তাকে বলে মনভ্রমরা।

সেদিন কথাটার অর্থ আমরা এইরকম বুঝেছিলাম, কারণ এইরকমই বুঝতে শিখেছিলাম; কিন্তু শিখিয়েছিলেন যাঁরা, সেই সতুদা হীরুদা আর কানুদারাও বোধহয় কথাটার সে-অর্থ আজ একেবারে ভুলে গিয়েছেন।

সেই অর্থটা ভুলে গেলেও সেই কথাটা কি তাঁরা ভুলে যেতে পেরেছেন? সেই মনভ্রমরার কথা?

আমার তো মনে হয়, মনে করিয়ে দিলে সতুদা নিশ্চয় এখনো মনে করতে পারবেন। কানুদা আর হীরুদাও নিশ্চয় আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে স্বীকার করবেন, হ্যাঁ, এখনো তাঁদের মনে আছে সেই কথা। মনে করিয়ে দিলে মনে পড়ে বৈকি। উঃ, সে কতদিন আগেকার কথা!

অনেকদিন আগেরই কথা বটে। সেদিন আর আজ, মাঝখানে প্রায় পঞ্চাশ বছর সময়ের ব্যবধান। আমারই মাথা আজ সাদা হয়ে গিয়েছে, আর সতুদা হীরুদা ও কানুদার মাথার অবস্থা যা হয়েছে তা'তো বোঝাই যায়।

সেদিন ঐ কথাটার অর্থ যা বুঝেছিলাম, তা'তো বুঝেই ছিলাম। কিন্তু যেটুকু স্পষ্ট ক'রে সেদিন বুঝতে পারিনি, আজ মনে হয়, সেটুকু যেন স্পষ্ট বুঝতে পারছি। মনভ্রমরার অর্থ মনই বটে, তবে সে-মন হলো চৈত্র মাসের ভ্রমরার মতো, ভালবাসে গন্ধের ফুল, রঙের ফুল নয়। রঙ দেখে গুনগুনিয়ে গান হয়তো করে, কিন্তু গন্ধের কাছে ছুটে যাবার জন্য গুনগুনিয়ে কাঁদে।

সতুদা সম্প্রতি মেধাতিথির মনু-টীকার এক দার্শনিক টীকা রচনা করেছেন। জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করে তাঁকে, কি বলে আপনার দার্শনিক মন? আমার এই কাব্যিক ব্যাখ্যাটা কি ঠিক নয়?

যাক গিয়ে এসব তত্ত্বের কথা। আজ সতুদার সঙ্গে দেখা হলে কোনরকম তত্ত্বের নাম ক'রেও তাঁদের অতীতকালের কোন ছেলেমানুষী বাচালতার কথা তুলতে পারব না বোধ হয়, তোলা উচিতও নয়। সেদিনের সেই ঘটনার অর্থ

বুঝবার জন্য সতুদার মনে আজ আর কোন পুরনো অথবা নতুন দুশ্চিন্তা আছে বলেও মনে হয় না। কিন্তু আজকের এই মেধাতিথি সতুদার সেই ছেলেবয়সের মুখ থেকেই তো আমরা ঐ কথাটা প্রথম শুনেছিলাম। আর, সতুদাদের কথা থেকেই সেদিন আমরা বুঝেছিলাম যে, দেখতে বেশ সুন্দর যে-মেয়ে যখন-তখন গুন্‌গুন্‌ ক'রে গান করে, তাকে বলে মনভ্রমরা।

সতুদারা ছিলেন দাদাদের দল, আর আমি ভুতো ও বলাই ছিলাম ভাইদের দল। আমাদের চেয়ে বয়সে ওঁরা ছিলেন পাঁচ-বছরের বড়। আমাদের বয়স তখন দশের উপর, আর ওঁদের বয়স তখন পনর'র উপর। তখন শুধু বেবিরা পড়ত ছোট স্কুলে। আমরা তখন মিডল স্কুল ছেড়ে সবেমাত্র হাইস্কুলে ঢুকেছি, আর সতুদারা হাইস্কুল ছেড়ে সবে মাত্র কলেজে ঢুকেছেন। কাজেই সতুদা যখন তাঁর দলবল নিয়ে তাঁদের বাড়ির বাইরের ঘরে ক্যারম খেলতেন, তখন আমরা শুধু বাইরে থেকে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে উঁকি ঝুঁকি দিয়ে দেখতাম। বড়-দের আড্ডার কাছে থাকা দূরে থাকুক, কাছাকাছি থাকারও অধিকার আমাদের ছিল না। জানালা দিয়ে খুব সাবধানে আর খুব নিঃশব্দে উঁকি-ঝুঁকি দিতে হতো। দেখতে পেলেই তেড়ে আসতেন সতুদা - ভাগ ভাগ ডেঁপোর দল। ঠ্যাং ভেঙ্গে দেব, যদি দেখি আবার কখনো বড়দের আড্ডার কাছে গা ঘেঁষতে এসেছ।

তখনকার মত ভেগে পড়লেও আবার ফিরে আসতাম, সেদিন না হোক আর একদিন, ঠিক সেই জানালার কাছেই দাঁড়াতাম, আর সতুদাদের ক্যারম খেলা দেখতাম।

এইভাবেই একদিন শুনলাম, ক্যারম খেলার খুট্‌স খুট্‌স হঠাৎ থামিয়ে সতুদা যেন নিজের মনেই বলে উঠলেন—আজও শুনলি তো হীরু?

হীরুদা হাত গুটিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করেন— কি?

সতুদা – মনভ্রমরা গুনগুন্‌ করে গান করছিল।

হীরুদা বলেন শুনেছি, এই নিয়ে দশবার শুনলাম।

কানুদা বিস্মিত হয়ে বলেন – এর মানে কিছু বুঝতে পারছিস?

সতুদা বলেন—কিছু একটু ব্যাপার আছে, নিশ্চয়ই আছে।

জানালার দিকে হঠাৎ সতুদা তাকিয়ে ফেললেন, সঙ্গে সঙ্গে এক লাফ দিয়ে উঠে এসে হাত বাড়িয়ে ধরে ফেললেন ভুতোর ডান হাতের কব্জি। বললেন – কি রে বকাটে, এখানে দাঁড়িয়ে কি করছিস?

ভুতো আর্তনাদ করে—আপনাদের খেলা শুনছি সতুদা।

গর্জন করলেন সতুদা—খেলা শুনছিস? কি শুনেছিস বল?

করুণ মুখ ক'রে ভুতো বলে—খেলা দেখছিলাম সতুদা, কিছু শুনতে পাইনি।

হীরুদা উঠে এসে চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে থাকেন। প্রশ্ন করেন—সত্যিই কিচ্ছু শুনতে পাসনি তো?

ভুতো বলে এবং আমরাও বলি—কিচ্ছু না হীরুদা।

ভুতোকে ছেড়ে দিলেন সতুদা এবং তখনকার মতো আমরাও জানালার কাছ থেকে সরে গেলাম। কিন্তু সেদিন যে কথাগুলি ওদের মুখে প্রথম শুনলাম, ঠিক সেই কথাগুলিই আরও কয়েকবার ঠিক ঐভাবেই নিঃশব্দে সতুদাদের ক্যারম-খেলার ঘরের ঐ জানালার কাছেই নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থেকে শুনতে পেলাম এবং আমাদেরও আর বুঝতে বাকি রইল না যে, ছোট স্কুলের দিদিমণি সুধাদিই হলেন মনভ্রমরা।

কথাটা শুনে আমরা কিন্তু মনে মনে সতুদাদের উপর রাগই করেছিলাম। সুধাদি গুন্‌গুন্ ক'রে গান করেন তো তোমাদের তাতে কি? গুরুজনের সম্পর্কে মনে কোন মান্যি নেই, যা তা একটা নাম তৈরী করে দিলেই হলো!

ভুতো বলে—সুধাদি তো সতুদাদের গুরুজন নন।

বলাই বলে—নিশ্চয় গুরুজন। সুধাদি সতুদাদের চেয়ে বয়সে অনেক বড়।

ভুতো বলে—সতুদারা তো আর সুধাদির কাছে পড়েননি। সুধাদি আসবার আগেই ওরা হাইস্কুলে চলে গিয়েছিল। ওরা আমাদের চেয়ে অনেক সিনিয়র।

কথাটা ঠিকই বলেছে ভুতো। আমরা পড়েছি সুধাদির কাছে, কাজেই সুধাদির জন্য আমাদের মনে যে-মায়া আছে, সে মায়া সতুদাদের সিনিয়র মনে থাকবে কেন? মিডল স্কুলে যাবার আগে ছোট স্কুলের শেষ বছরটা আমরা সুধাদির কাছেই পড়েছিলাম। সুধাদির সঙ্গে এখনো যে আমাদের কত ভাব আছে, তার কোন খবরই জানেন না ক্যারম মার্কা সতুদা হীরুদা আর কান্তদা। বিকাল বেলা ওরা যখন বড় মাঠে হকি খেলে হাঁপায়, তখন সুধাদির সঙ্গে ছুটাছুটি ক'রে ছোট স্কুলের মাঠে কাঠবিড়ালী ধরবার চেষ্টা করি। হকি খেলার শেষে ওরা যখন পয়সা খরচ ক'রে মালাই বরফ কেনে আর খায়, আমরা তখন সুধাদির কাছ থেকে কুচো নিমকি নিই আর খাই। রবিবারের সকালে ওরা যখন মাঠের উপরে সাইকেল রেস খেলে, আমরা তখন ছোট স্কুলের পাঁচিলের উপর চুপ করে বসে থাকি।

সে রবিবারে সকালবেলা ছোট স্কুলের পাঁচিলের উপর বসেছিলাম আমরা।

সুধাদিকেই আমরা জিজ্ঞাসা করতাম—এ খেলায় পাপ হচ্ছে না তো সুধাদি।

সুধাদি বলতেন—হচ্ছে বৈকি।

ভয় পেয়ে আবার জিজ্ঞাসা করতাম—তাহ'লে এই পাপের কি উপায় হবে সুধাদি?

হেসে ফেলেতন সুধাদি। বলতেন—উপায় তো আমিই আছি?

—তার মানে?

প্রথম প্রথম বুঝতে না পারলেও পরে সবই জেনেছিলাম আর বুঝেও ফেলেছিলাম। সুধাদির কাছেই এসেছিল লছমনের মা, এসেছিল রজ্জাক ধুপী। যার ছাগল আর যার গাধা আমরা খোঁয়াড়ে জমা দিয়ে এক-আনা আর দু' আনা রোজগার করেছিলাম, তাদেরই হাতে দু' আনা আর চার আনা পয়সা দিয়ে সুধাদি আমাদের পাপ কাটিয়ে দিয়েছিলেন। ঐ পয়সা দিয়ে তাদের ছাগল আর গাধা খোঁয়াড় থেকে ছাড়িয়ে এনেছিল লছমনের মা আর রজ্জাক ধুপী। সুধাদি সত্যিই সুধাদি। তারপর থেকে পাপের ভয় ছেড়ে দিয়েই আমরা ঐ খেলা খেলতাম, কারণ পাপ কাটাবার উপায় ছিলেন সুধাদি।

পাঁচিলের উপর বেশিক্ষণ বসে থাকতে হয়নি। এলেন সুধাদি, জিজ্ঞাসা করলেন—কি ব্যাপার?

—ব্যাপার খুব ভাল সুধাদি। হরিদা'র বুড়োকে আজ আবার হাতের কাছে পাওয়া গিয়েছে।

হরিদা'র টাট্টু ঘোড়া, তারই নাম বুড়ো। অনেকদিন অনেক চেষ্টা করেছি বুড়োকে ধরবার জন্য। কিন্তু বুদ্ধিতে কি ভয়ানক ঝানু ঐ বুড়ো। যেন আমাদের ছায়ার শব্দও শুনতে পায় বুড়ো। কতবার চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছি বুড়োকে, কিন্তু প্রত্যেকবার ঐ বাঁধা-পা নিয়েই মুহূর্তের মধ্যে তিন লাফে যেন বাতাসে ঘাই মেরে পালিয়ে গিয়েছে বুড়ো। আমাদের সব ধৈর্য সতর্কতা ও পরিশ্রম ব্যর্থ হয়েছে।

মাঠের উপর নিশ্চিন্ত মনে চরন্ত টাট্টু ঘোড়াটার দিকে তাকিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠলেন সুধাদি। বললেন—আজ কিন্তু যেমন করেই হোক্ ধরা চাই হরিদা'র ঐ বুড়োকে। পারবে তো?

আমরাও বললাম—পারতে হবেই সুধাদি। আজ আমরা প্রতিজ্ঞা করেছি।

অনেক হাসলেন সুধাদি, আর অনেক হাততালি দিলেন, আর আমরা অনেক চেষ্টা করলাম, কিন্তু হরিদা'র বুড়োকে ধরতে পারা গেল না। সেই রকমই তিন

লাফে বাই মেরে পালিয়ে গেল বুড়ো। মাঠ পার হয়ে একেবারে সড়কের উপর উঠে আর ঘাড়ের রোঁয়া ঝাঁকিয়ে পিছনের মাঠের দিকে তাকিয়ে রইল। না, আজ আর কোন চান্স পাওয়া যাবে না।

সুধাদি বললেন—ছি ছি, হবিদা'র বুড়োর কাছে আবার হেরে গেলে?

একে তো হাঁপাচ্ছিলাম, তার উপর আবার ছি-ছি করলেন সুধাদি। বড় বেশি দমে গেলাম। তবু বললাম—আর একদিন চান্স পাওয়া যাবেই সুধাদি।

সুধাদি নিজেই তখনি আবার নতুন উৎসাহে হেসে উঠলেন। বললেন—আবার চান্স পাওয়া যাবেই। আর হবিদাকে জব্দ করতে হবেই।

হ্যাঁ, হবিদাকে জব্দ করতেই হবে। এ শহরের সবাই হবিদাকে জব্দ ক'রে আনন্দ পায়, শুধু আমরাই আজ পর্যন্ত সে-আনন্দ পাইনি। শুধু তিন আনা পয়সার লোভ নয়, বুড়োকে ধরবার জন্য আমাদের এই আগ্রহের মধ্যে আর একটা জিনিস আছে, হবিদাকে জব্দ করার প্রতিজ্ঞা।

হবিদাকে সতুদারা বলেন, জন গিলপিন হবি। মাথার উপর মস্ত বড় এক শোলার হ্যাট চাপিয়ে আর মালকোঁচা মেরে এই টাট্টু বুড়োর পিঠের উপর সওয়ার হন হবিদা। টাট্টুর পিঠের এক পাশে ঝুলতে থাকে চটে জড়ানো একটা ওষুধের বাক্স, আর অপর পাশে হবিদার কম্বল-জড়ানো বিছানা ও একটা ঘটি। শহরের বুকের উপর দিয়ে এইভাবেই সড়কের যত কুকুরকে বাগাতে বাগাতে শহরের বাইরের অনেক দূরের গাঁয়ে ডাক্তারি করতে চলে যান হবিদা, ফিরে একদিন দু'দিন বা এক সপ্তাহ পরে।

হবিদাকে জব্দ করার প্রতিজ্ঞা রাখতে পারব তো? ক্লান্ত হয়ে পাঁচিলের গায়ে হেলান দিয়ে ঘাসের উপর ব'সে আমরা এই কথাই ভাবছিলাম। কিন্তু বেশিক্ষণ ভাবতে দিলেন না সুধাদি, বললেন—চলো বেড়িয়ে আসি।

ব'লেই চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন সুধাদি। কিছুক্ষণ কি যেন ভাবলেন। তারপরেই বললেন—নাঃ, থাক্‌গে।

আমরা জানতাম, এই কথাই বলবেন সুধাদি। সেই যে কবে বাসন্তী পূজার দিনে আমাদের সঙ্গে একবার বেড়াতে বের হয়েছিলেন সুধাদি, তার পর থেকে আজ পর্যন্ত আর কোনদিনই বের হলেন না।

সেই বাসন্তী পূজার দিন বড় সড়ক ধরে হাঁটতে হাঁটতে সুধাদির সঙ্গে আমরা ঐ পলাশতলা পর্যন্ত গিয়েছিলাম। বড় সুন্দর সাজ করেছিলেন সুধাদি। একে তো দেখতে খুবই সুন্দর, এ শহরের সব মেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সুন্দর

সুধাদি, তার উপর অমন সুন্দর একখানা চাঁপা রঙের শাড়ি পরে কি সুন্দরই যে সেদিন হয়ে উঠেছিলেন, সেটা আমরা পথে বের হয়েই বুঝতে পেরেছিলাম।

হীরুদাদের বাড়ির জানালায় দাঁড়িয়ে অমন স্টাইলের পুঁটিদিও গম্ভীর হয়ে, বোধহয় একটু রাগ ক'রেই তাকিয়ে দেখেছিলেন সুধাদিকে। কানুদাদের বাড়ির কাছে পৌছতেই দেখেছিলাম, চারমাসী পর্যন্ত ঘরের ভিতর থেকে ছুটে এসে বারান্দায় দাঁড়ালেন, আর হাঁ ক'রে তাকিয়ে রইলেন। সবচেয়ে বেশি গর্ব আমাদের। আমরাও প্রত্যেক বাড়ির বারান্দা আর জানালার দিকে তাকিয়ে শহরের যত দিদি মাসী আর খুড়িমাদের লক্ষ্য ক'রে সুধাদির পরিচয় শুনিয়ে যাচ্ছিলাম— সুধাদি, রেবিদের ছোট স্কুলের দিদিমণি সুধাদি।

পলাশতলার কাছে পৌছতেই দেখেছিলাম, শান্তিদা বসে বসে একমনে ছবি আঁকছেন। হঠাৎ হাতের তুলি থামিয়ে সুধাদির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন শান্তিদা। শান্তিদার দিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠলেন সুধাদি। দেখলাম, যেন হঠাৎ পলাশ ফুলের রঙ ছড়িয়ে পড়েছে সুধাদির মুখের উপর। অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন সুধাদি। ভুতোর কাঁধে হাত রেখে ব্যস্তভাবে একটা ঠেলা দিয়ে বললেন —চলো, এখান থেকে চলো।

সেই যে চলে এলাম, তারপর আর কোনদিন সুধাদির সঙ্গে চলবার সুযোগ পাইনি। তাই আজ আবার বললাম—চলুন না সুধাদি।

সুধাদি বললেন—যাব কোথায় রে ভাই?

—চলুন না, সেদিনের মতো ঐ পলাশতলা পর্যন্ত গিয়ে···।

কথা শেষ করতে আর পারলাম না। ডাকপিওন এসে সুধাদির হাতে একটা খামের চিঠি দিয়ে চলে গেল। রঙীন খামের এক কোণে একটা ফোটা পলাশের ছবি।

যদিও সুধাদি কোনদিনও বলেননি, কিন্তু আমরা বুঝি, এই রঙীন চিঠি আসে ঐ পলাশতলা থেকেই। প্রায়ই আসে চিঠি। এবং আর এক রকমের রঙীন খামের চিঠি এদিক থেকেও চলে যায় ঐ পলাশতলার দিকে।

সুধাদির অন্য সব চিঠি ডাকবাক্সে ফেলে দিয়ে আসে, হয় স্কুলের মাসী, না হয় আমি কিংবা ভুতো কি বা বলাই। কিন্তু এই রঙীন চিঠি সুধাদি নিজের হাতেই ডাকবাক্সে ফেলে দিয়ে আসেন। বেশি দূরে নয় ডাকবাক্স। ছোট স্কুলের ফটক থেকে বড় জোর দশ গজ দূরে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে লাল রঙের ডাকবাক্স। ডাকবাক্সের ঠিক অপর দিকে রাস্তার ওপাশে এক সারি দোকান ঘরের মধ্যে

একটি ঘর হলো জন গিলপিন হরিদা'র। হরিদা'র ঘরের জানালার কাছে একটা পেয়ারা গাছ। সেই পেয়ারা গাছের সঙ্গে বাঁধা থাকে হরিদা'র প্রিয় টাট্টু অর্থাৎ বুড়ো।

বুঝতে পারি, পলাশতলার দিকে বেড়াতে যাবার আর কোন দরকার নেই সুধাদির। শান্তিদার রঙীন চিঠির ভিতর দিয়ে পলাশতলাই এখানে আসে। সুধাদিরও যত চাঁপা রঙের কথা এখান থেকে রঙীন চিঠির ভিতর দিয়েই পলাশতলায় পৌঁছে যায়।

আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে চিঠি পড়লেন সুধাদি। পড়া শেষ ক'রে নিজের মনেই গুন্‌গুন ক'রে বলে উঠলেন—পলাশের স্বপ্ন কি বৃথা হবে! চম্পার ঘুম কি ভাঙবে!

ভুতো জিজ্ঞাসা করে—কি বলছেন সুধাদি?

সুধাদি বলেন—কিছু না। আমার একটা কাজ ক'রে দিতে হবে।

আমি ও বলাই একসঙ্গে বলি—বলুন।

—টাউন ক্লাবের লাইব্রেরি থেকে কয়েকটা কবিতার বই আমার জন্য এনে দিতে হবে। পারবে তো?

বললাম—নিশ্চয় পারব।

রবিবারের সকাল শেষ হলো। আমরাও ছোট স্কুলের ফটক পার হয়ে বাড়ির দিকে চললাম। শুনতে পেলাম, গুন্‌গুন্ ক'রে গান করছেন সুধাদি।

সেদিন সন্ধ্যার সতুদাদের ক্যারম-খেলার ঘরে উঁকি দিতে এসে আমি ভুতো আর বলাই শুনতে পেলাম, সতুদা বলছেন—আজও আবার শুনলি তো হীরু।

হীরুদা বললেন—কি?

সতুদা—মনভ্রমরা গুন্‌গুন্ ক'রে গান করছিল।

হীরুদা বলেন—হ্যাঁ শুনেছি, এই নিয়ে এপার বার হলো।

কানুদা বলেন- সত্যিই কি যেন হয়েছে মনভ্রমরার, কিন্তু ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।

অনেকগুলি রবিবারের সকাল পার হয়ে গেল, তবু হরিদা'র বুড়োকে ধরবার সুযোগ পেলাম না। বুড়োর পিঠের উপর জন গিলপিন হয়ে হরিদা ডাক্তারী করতে কখন যে চলে যান, আর কখন্ যে ফিরে আসেন, কিছুই জানতে পারছি না। ছোট স্কুলের ফটকে ঢুকবার আগে একবার হরিদা'র ঘরের দিকে তাকিয়ে

দেখি, ঘরের দরজার কড়ায় তালা ঝুলছে। হরিদা নেই, পেয়ারা গাছের তলায় বুড়োও নেই! নিরাশ হয়ে স্কুলের পাঁচিলের উপর গিয়ে বসি, বড় মাঠের দিকে তাকাই। দু' একটা টাট্টু আর ছাগলকে চরতেও দেখা যায়। কিন্তু এগুলিকে ধরতে মনের ভিতর থেকে আর খুব বিশেষ উৎসাহ পাই না। চেষ্টা করলে ওগুলিকে এখনি ধরতে পারি। কিন্তু তাতে দু' আনা এক আনা হলেও এবং মালাই বরফে পেট ঠাণ্ডা হলেও হরিদা'র বুড়োকে না ধরা পর্যন্ত মন ঠাণ্ডা হবে না।

সবাই জব্দ করে যে হরিদাকে, সেই হরিদাকে জব্দ না করলে যে আমাদের মনের একটা প্রতিজ্ঞাও জব্দ হয়ে যায়। বার বার ছি-ছি করবেন সুধাদি, এই গ্লানি বার বার সহ্য করাও যায় না।

এক সারি দোকান ঘরের মধ্যে ঐ ঘরটাতেই থাকেন হরিদা। পথ দিয়ে যাবার সময় কতবার দেখতে পেয়েছি, ঘরের ভিতর রান্না করছেন হরিদা, আর পেয়ারা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে বিচালি চিবোচ্ছে আর কান নেড়ে মাছি তাড়াচ্ছে বুড়ো।

হরিদা যে কি ধরনের মানুষ, আর কি ধরনের ডাক্তারী করেন, তার বিশেষ কিছুই খবর রাখিনা আমরা। শহরের এতগুলি ভদ্রলোকের মধ্যে বোধহয় কেউ-ই সে-খবর রাখেন না। হরিদা'র মুখটা দেখতে বেশ, যদিও রোদে পুড়ে তামাটে হয়ে গিয়েছে। কুয়োতলার কাছে যখন আদুড় গায়ে স্নান করেন হরিদা, তখন কিছুক্ষণ তাকিয়ে দেখতে ইচ্ছা করে হরিদা'র চেহারাকে। হরিদাকে দেখতে অভিশাপে বনবাসী রাজপুত্তুরের মতোই মনে হয়, শুধু শরীরটা রোদে জলে খেটে খেটে একটু ময়লা হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু হরিদা নামে একটা মানুষ থাকে এই শহরে, এটা যেন স্বীকারই করতে চায় না এই শহর। কোনদিন কোন বিয়ে-বাড়ির নিমন্ত্রণে হরিদাকে দেখতে পাইনি। কোন উৎসবেই হরিদাকে নিমন্ত্রণ করবার কথা কখনো কোন ভদ্র-লোকের মনেও পড়ে না। পথ দিয়ে যাবার সময় চারুমাসী যে-কোন ভদ্রলোককে দেখতে পেলেই মাথার কাপড় টেনে বড় করেন, কখনো বা ঘোমটা টানেন, কিন্তু একটু আশ্চর্য হয়েই দেখেছি, হরিদাকে দেখলে চারুমাসীর মাথার কাপড় নির্বিকার হয়েই থাকে। হাত দিয়ে মাথার কাপড়টা একটু স্পর্শ করবার চেষ্টাও করেন না চারুমাসী। সতুদাকে দেখেছি, সাইকেল থেকে নেমে এক লাফে হরিদা'র ঘরের দরজার কাছে এসে বলেন—দেশলাই টা একবার দাও তো জন গিলপিন। বয়সে এত বড় হরিদা, তবু তাঁরই কাছ থেকে দেশলাই চেয়ে নিয়ে তাঁরই সামনে সিগারেট ধরিয়ে নিতে সতুদার একটুও বাধে না। পথ দিয়ে যেতে এস-ডি-ও

সাহেবের মোটর গাড়ী একবার বিকল হয়ে গিয়েছিল। হরিদাকে দেখতে পেয়েই ডাক দিলেন এস-ডি-ও—এই ইধার আও, গাড়ি ঠেল। সতুদাকে যেমন কোন কথা না বলে দেশলাই এগিয়ে দেন হরিদা, ঠিক তেমনি কোন কথা না বলে গাড়িও ঠেলে দিলেন। সামনের বাড়ির অক্ষয়বাবুর বাচ্চা ছেলেটা যখন না ঘুমিয়ে চেঁচাতে থাকে, তখন অক্ষয়বাবুর স্ত্রী বাচ্চাকে শান্ত করার জন্য হরিদা'র ঘরের দিকে তাকিয়ে বেশ জোর জোরে চেঁচিয়েই বলতে থাকেন—চুপ চুপ চুপ, বাঘে ধরেছে হরিকে, মস্ত বড় বাঘ। বড় বড় থাবা দিয়ে একেবারে মেরে ফেলেছে হরিকে। চুপ চুপ চুপ।

এই রকমেই তুচ্ছ হয়ে আছেন হরিদা। সম্ভ্রম দূরে থাক, হরিদা'র যেন অস্তিত্বও নেই। যেটুকু আছে সেটুকুও বাঘের মুখে ফেলে দিয়ে একেবারেই শেষ করে দিচ্ছেন অক্ষয়বাবুর স্ত্রী। কিন্তু সকলের কাছে এত জব্দ হয়েও হরিদা যেন প্রতিজ্ঞা করেছেন, আমাদের কাছে কখনই জব্দ হবেন না। হাতের কাছে পাচ্ছি না হরিদা'র বুড়োকে, আর দিনগুলি ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে।

সুধাদি পড়ছিলেন বঙিন চিঠি। আমরা এসে বললাম—আজও কোন চান্স পাওয়া যাবে না সুধাদি। হরিদা তাঁর বুড়োকে নিয়ে গাঁয়ের দিকে ডাক্তারী করতে চলে গিয়েছেন।

আমাদের কথাগুলি বোধ হয় শুনতে পেলেন না সুধাদি। চিঠি পড়া শেষ হলেই নিজের মনে গুন্‌গুন্ ক'রে বলে উঠলেন—সময় যেদিন আসিবে আপনি যাইব তোমার কুঞ্জে ...।

বুঝতেও পারলাম না কিছু। তবে এইটুকু বুঝলাম যে, সুধাদি ঐ রঙীন চিঠিরই কোন একটা কথাকেই গুন্‌গুনিয়ে বলছেন।

উঃ এত চিঠিও আসে, আর চিঠিতে এত কথাও থাকে, আর পলাশতলার শান্তিদার মনে এত কথাও ছিল?

সুধাদির মনে ঐরকম আর কি-কথা ও আর কত কথা আছে জানি না। কিন্তু দেখেছি তো, সুধাদিও সমানে চিঠি লিখছেন। কিরকম যেন মনে হয়, কিছুটা বুঝতেও পারি, তারপর আর কিছু বুঝতে পারি না।

আজ দেখলাম, সুধাদি আমাদেরই সামনে বসে চিঠি লিখলেন। আমরা যে কবিতার বইগুলি লাইব্রেরি থেকে এনে দিয়ে ছিলাম, তারই মধ্যে একটা বই তুলে নিয়ে একটা কবিতা বের করলেন সুধাদি। তার পরেই চিঠি লিখতে শুরু করলেন। দু' মিনিটের মধ্যেই চিঠি লেখা শেষ হয়ে গেল।

রঙীন খাম বন্ধ ক'রে নিয়ে তারপর সুধাদি আমাদের দিকে তাকালেন। বললেন—পলাশতলার শান্তিদাকে তোমরা নিশ্চয়ই চেন?

আমরা বলি—খুব চিনি সুধাদি। খুব ভাল লোক। যেমন চেহারা, তেমনি গুন। আর তেমনি শৌখিন।

হেসে ফেলেন সুধাদি।—এত খবরও জান?

ভুতো বলে—অনেক টাকা আছে শান্তিদার। সেদিন পথে যেতে যে গালা-কুঠিটা দেখেছিলেন, ওটা শান্তিদারই গালাকুঠি।

আমি বলি—খুব ভাল ফটো তুলতে আর ছবি আঁকতে পারেন শান্তিদা।

বলাই বলে—এ শহরে শান্তিদার চেয়ে ভাল বেহালা বাজাতে আর কেউ পারে না।

গুন্‌গুন ক'রতে ক'রতেই হঠাৎ যেন আনমনা হয়ে চুপ করেন সুধাদি। রঙীন খামে বন্ধ চিঠিটার দিকে তাকিয়ে থাকেন। আমাদের মনে হতো, সুধাদিকেও যেন কি এক রঙীন খেলায় পেয়েছে। শান্তিদাকে চেনেনও না, একদিনের জন্য শান্তিদার সঙ্গে একটি কথাও হয়নি সুধাদির, তবুও কত রকম রঙের কথা আর মিষ্টি কথার আসা যাওয়া চলেছে দু'জনের মধ্যে।

উঠে গিয়ে, স্কুলের ফটক পার হয়ে ডাকবাক্সের ভিতর চিঠিটা ফেলে দিয়ে এসে সুধাদি বলেন—বলো এবার, তোমাদের খেলার খবর কি? হরিদাকে জব্দ করবার প্রতিজ্ঞা ভুলে গিয়েছ বোধহয়।

আমরা বলি—ভুলিনি সুধাদি, কিন্তু আজ আর কোন ভরসা নেই।

সুধাদি—কেন?

ভুতো বলে—হরিদা'র বুড়ো এখন শহরের বাইরে।

সুধাদি—তা'হলে কি করবে আজ?

বলাই বলে—আজ আর না-ই বা খেললাম সুধাদি। কাঠবিড়ালীর পিছু পিছু ছুটে আর লাভ কি?

সুধাদি হাসেন—তা'হলে আজ আমার একটা কাজ করে দাও ভাই।

ঘরের ভিতরে গিয়ে বাক্স খুলে একটা কাগজ নিয়ে এলেন সুধাদি। তার মধ্যে অনেকগুলি ওষুধের নাম লেখা।

সুধাদি আমাদের হাতে পাঁচটা টাকা দিয়ে বললেন—এই ওষুধগুলি আমাকে এনে দাও।

আমি প্রশ্ন করলাম—আপনার কি কোন অসুখ করেছে সুধাদি?

সুধাদি—হ্যাঁ, ক'দিন থেকে জ্বর হচ্ছে। এখন থেকেই সাবধান না হলে আমাকে আবার সেই ম্যালেরিয়ায় ধরবে। আর……।

বলাই বলে—আর কি সুধাদি?

সুধাদি হেসে হেসে বলেন—আর তোমাদের সুধাদির চেহারা হয়ে যাবে ঐ লছমনের মায়ের মতো, ঝিরঝিরে জিরজিরে কাঠিকাঠি।

কথাগুলি হেসে হেসে বললেও সুধাদির চোখ দুটো কেমন ছলছল করছিল। ভুতো ঘাবড়ে গিয়ে বলে—আপনাকে কেউ নজর দেয়নি তো সুধাদি?

সুধাদি বেশ জোরে হেসে ওঠেন—তাই হবে, নিশ্চয় কেউ নজর দিয়েছে।

ভুতোর মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারি, ভুতো ভাবছে, কে নজর দিল সুধাদিকে? জানতে পারলে তা'কে আচ্ছা ক'রে হঁটিয়ে……।

আমি বললাম—দিন সুধাদি, ওষুধের নাম লেখা কাগজটা দিন, এখনি ওষুধ এনে দিচ্ছি।

সারা বিকাল আর সন্ধ্যা শহরের সব ওষুধের দোকানে ঘুরেও সুধাদির ঐ ওষুধগুলি পেলাম না। কেউ বললেন, দশ দিন পরে পাওয়া যাবে, কেউ বললেন, এক মাস পরে নতুন চালানের সঙ্গে আসবে। একজন বললেন, স্টেশনের বাজারে যে ফার্মাসি আছে, সেখানে এই সব ওষুধ পাওয়া যাবে।

কিন্তু এ যে একটা সমস্যা! কে যাবে স্টেশনের বাজারে? এখান থেকে তের মাইল দূরে রেল-স্টেশন, পথের উপর আবার একটা ভয়ানক জঙ্গল। কাল সকালে সার্ভিস বাসে চড়ে অবশ্য স্টেশনে যাওয়া যেতে পারে। কিন্তু যাবে কে? বাবার অনুমতিই বা বাড়ি থেকে পাবে কে?

সুধাদির ঐ সুন্দর চেহারাকে সুন্দর ক'রে বাঁচিয়ে রাখতে হবে, তারই জন্য তো আমাদের এত উদ্বেগ, আর এত পরিশ্রম। কিন্তু সবই যে ব্যর্থ হলো, সুধাদির এই উপকারটুকু আমরা করতে পারব না, এটা একটা দুঃখ বৈকি।

সন্ধ্যার শেষে ছোট স্কুলে ফিরবার সময় দেখলাম, হরিদা ফিরে এসেছেন। রান্না করছেন হরিদা। টাট্টু বুড়ো পেয়ারা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছে।

মুখ ভেংচে ভুতো বলে হুঁঃ, আমাদের সব চান্স নষ্ট ক'রে এতক্ষণে এত রাত ক'রে মহারাজ ফিরে এসেছেন।

সুধাদির কাছে এসে বললাম, ওষুধ পেলাম না সুধাদি। এখানে পাওয়া যাবে না, যেতে হবে স্টেশনের বাজারে।

সুধাদিও যেন একটু হতাশ হয়ে পড়লেন। বললেন—তা'হলে উপায়?

ভুতো হঠাৎ বলে—একটা উপায় হতে পারে সুধাদি। হরিদাকে বললে নিশ্চয়ই এ কাজটা করে দেবেন।

সুধাদি বলেন—বলে দেখ।

আমাদের সব কথা চুপ ক'রে শুনলেন হরিদা। কিছুক্ষণ অবাক্ হয়ে তাকিয়ে রইলেন, যেন একটা স্বপ্নের দিকে তাকিয়ে আছেন।

তার পরেই হাত বাড়িয়ে ওষুধের নাম-লেখা কাগজটা আর পাঁচটা টাকা আমাদের হাত থেকে নিয়ে পকেটে ফেললেন হরিদা। বললেন—এখনি যাচ্ছি।

আমি বলি—এখনি কি ক'রে যাবেন হরিদা? এখন তো কোন গাড়ি নেই?

হেসে হেসে হরিদা বলেন—আমার বুড়া আছে, ওর চেয়ে ভাল গাড়ি হয় না।

বলাই বলে—এই রাত্রে ঐ ভয়ানক জঙ্গল পার হতে আপনার ভয় করবে না হরিদা?

হরিদা বলেন—একটুও না।

বলাই প্রশ্ন করে—কি ক'রে এরকম নির্ভয় হলেন হরিদা, আমাদের বলুন না?

অনুরোধ শুনে হরিদা হাসতে থাকেন। তারপর বলেন—আমার কাছে অ্যাকোনাইট নামে একরকম ওষুধ আছে, এক ড্রপ খেলেই অন্তত চার ঘণ্টার মতো মৃত্যুভয় থাকে না।

ভুতো বলে—এখন তাহ'লে ঐ অ্যাকোনাইট খেয়েই আপনি টাট্টু চড়ে জঙ্গলের পথে……।

হরিদা বলেন—হ্যাঁ, এখনই যাব।

সবাই উৎফুল্ল হ'য়ে দৌড়তে দৌড়তে স্কুল-ঘরে ফিরে এসে সুধাদিকে শুভ-সংবাদ জানালাম। হরিদাকে যা বলেছি, আর হরিদার কাছ থেকে যা শুনেছি, সবই বললাম সুধাদিকে।

শুনে হেসে ফেললেন সুধাদি। বললেন—হরিদাকে আর এক রকমের জব্দ করা হলো, তাই না?

তারপরেই কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন এবং তারপরে বড় বেশি গম্ভীর হয়ে গেলেন সুধাদি। বললেন—যা'ই বলো, এরকম ক'রে লোকটাকে জব্দ করা উচিত হলো না। এই রাত্রে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যাবে, যদি কোন বিপদ আপদ ঘটে, তবে •••।

সুধাদি হঠাৎ কিরকম একটা রাগের সুরেই বলে ওঠেন—লোকটাকে বারণ করা উচিত ছিল তোমাদের।

বারান্দার থামের গায়ে হাত দিয়ে আরও কিসব ভাবতে থাকেন সুধাদি। তারপর নিজের মনেই বলে ওঠেন—লোকটাই বা কি রকম? বলা মাত্র ছুট চলল?

সুধাদির মেজাজ দেখতে ভাল লাগছিল না আমাদের। বললাম—আসি সুধাদি।

বাড়ি যাবার জন্য আমরা তৈরি হতেই সুধাদি বললেন—আমি কি ক'রে জানব, লোকটা নিরাপদে ফিরল কি না?

আমি বললাম—সকাল হলেই খোঁজ নেব সুধাদি।

সুধাদি বললেন—না, এত খোঁজাখুঁজির দরকার নেই। যাও, এখনি গিয়ে হরিদাকে বারণ ক'রে দিয়ে বলে এস, ওষুধ আনবার দরকার নেই।

দৌড়ে গেল ভুতো, আর ফিরে এসেই বলল—চলে গিয়েছেন হরিদা।

সুধাদি রাগ ক'রে বললেন—রাত হয়েছে, তোমরাও বাড়ি যাও এবার।

বাড়ি ফিরবার সময় অনেক চিন্তা করেও ঠিক বুঝতে পারলাম না, সুধাদি এরকম রাগারাগি করলেন কেন? প্রথম তো বেশ হেসেছিলেন।

মনে হয়, সুধাদির সম্মানে খুব লেগেছে। যে হরিদা একটা মানুষ নয়, যে হরিদা হলো লোকের হাসি আর জব্দের জিনিষ, সেই হরিদা'র কাছ থেকে উপকার নিতে সুধাদির লজ্জা করবে বৈকি। পলাশতলা থেকে রঙীন চিঠি আসে যে সুধাদির কাছে, তার উপকার করবার জন্যি পিন হরিদা, এটাও তো ভালো কথা নয়।

যাক্, কোন রকম বিপদ-আপদ হয়নি। মৃত্যুভয়হীন হরিদা সকাল হতেই ওষুধ নিয়ে হাজির হলেন, আর আমি এক দৌড়ে সেই ওষুধ সুধাদির হাতে পৌঁছিয়েও দিলাম।

একটু পরেই এলো ভুতো আর বলাই। সুধাদি হেসে হেসে বললেন—আজ তো চান্স এসে গিয়েছে।

হ্যাঁ, মনে পড়ে গেল, সুযোগ আবার এসেছে। হরিদার বুড়ো টাট্টুকে নিশ্চয় আজ বিকাল বেলা মাঠের মধ্যে পাওয়া যাবে। পেলে আজ আর রক্ষা নেই।

সুধাদির হাসি দেখে খুশি হয়, আর আমাদের প্রতিজ্ঞাটা সুধাদির কাছে

আর একবার ঘোষণা ক'রে বাড়ি ফিরে এলাম আমরা। আর, সন্ধ্যা হবার আগেই ছোট স্কুলের পাঁচিলের উপর গিয়ে বসলাম।

দেখে রাগ হলো, মাঠে ঘাস খাবার জন্য আসেনি হরিদা'র বুড়ো। দু' চারটে ছাগল ছানা শুধু চরে বেড়াচ্ছে। ঘরের কাছে গিয়ে সুধাদিকে ডাক দিয়ে বললাম—আজও চান্স হলো না সুধাদি।

সুধাদি হেসে ফেললেন—তোমাদের ভাগ্যটাই এই রকম।

দেখলাম, ফস্ ক'রে একটা রঙীন খাম ছিঁড়িলেন সুধাদি। এক মিনিটের মধ্যে চিঠি পড়া শেষ করলেন। ঝট্ ক'রে একটা কবিতার বই খুললেন। তার পর দু'মিনিটের মধ্যে একটা চিঠি লিখে ফেললেন।

শুধু চিঠি আর চিঠি। দেখতে আর ভাল লাগে না আমাদের। যেন পলাশতলায় আর এখানে দু'টো চিঠির কল বসে রয়েছে। চেনা নেই, জানা নেই, মুখ দেখাদেখি নেই, তবু দু'দিক থেকে কতগুলি রঙীন লেখার খেলা চলছে।

সুধাদি জিজ্ঞাসা করেন—হরিদা'র সঙ্গে দেখা হতেই কি বললেন?

আমি বললাম—বললেন, তোমাদের সুধাদি কেমন থাকেন, তার জ্বর কমছে কি না, আমাকে মাঝে মাঝে জানিয়ে যেতে ভুলো না ভাই।

সুধাদি বলেন—বলে দিও, খুব ভাল আছি, ওকে কোন চিন্তা করতে হবে না।

তার পরেই বলেন—থাকগে, ওসব কথা ওকে বলা উচিত নয়, বলার দরকার নেই।

ভুতো বলে—তবে কিছু একটা বলতে হবেই তো সুধাদি।

সুধাদি—বলো, ভাল আছেন সুধাদি, ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

অনেকক্ষণ ধরে আনমনাভাবে স্কুলের মাঠে, ফুলগাছের পাশে পাশে পায়চারি করলেন সুধাদি। খুব বিমর্ষ দেখাচ্ছিল সুধাদিকে। আমরা আবার দুশ্চিন্তায় পড়লাম। মনে হচ্ছে, আজও আমাদের সঙ্গে কোন খেলায় মেতে উঠবেন না সুধাদি।

আমরা নিঃশব্দে ঘুরঘুর করছিলাম সুধাদির আশেপাশে। হঠাৎ সুধাদি বলে উঠলেন—আর ভাল লাগে না এই ছাই চাকরি। পঁচিশ টাকা তো মাইনে। ছেড়েই দেব এই চাকরি।

সত্যিই বুক কেঁপে উঠল আমাদের। সুধাদি চলে যাবেন, তবে ছোট স্কুলের এই পাঁচিল আর এই সব খেলার উপর কি আর কোন মায়া থাকবে আমাদের? কখনই না।

চুপ করেই রইলেন সুধাদি। আমরা ধীরে ধীরে সরে পড়লাম।—আসি সুধাদি। বেশ জোরে কথাটা বললেও সুধাদি কোন সাড়া দিলেন না।

সমস্তায় পড়লাম আমরাই। সুধাদির চলে যাওয়া বন্ধ করতেই হবে। মাইনে কিছু বেশি ক'রে দিলে সুধাদি নিশ্চয়ই চলে যাবেন না। কিন্তু আমরা কি আর তাঁর মাইনে বেশি ক'রে দিতে পারি?

তিনজনে মিলে আলোচনা ক'রে শেষকালে একটা বুদ্ধি বের করলাম। এলাম হরিদা'র কাছে। বললাম—সুধাদি ভাল আছেন, আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

সেই রকমই অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন হরিদা, যেন একটা স্বপ্নের দিকে তাকিয়ে আছেন। জীবনে এই বোধ হয় প্রথম ধন্যবাদ পেলেন হরিদা। সত্যিই তো, স্বপ্নেও নিশ্চয়ই এতটা আশা করতে পারেন নি হরিদা।

আমরা বললাম—সুধাদি কিন্তু চলে যাবেন।

চমকে উঠলেন হরিদা—কেন?

ভুতো বলে—পঁচিশ টাকা মাইনেতে চাকরি করতে পারবেন না সুধাদি।

শুনে চুপ করে আর চোখ দুটো বন্ধ ক'রে বসে রইলেন হরিদা।

বলাই বলে—কিন্তু একটা উপায় তো বের করতেই হবে হরিদা।

হরিদা বলেন—হ্যাঁ, দেখি কি উপায় হয়।

জয় হোক হরিদা'র। মনে মনে হরিদা'কে জীবনে প্রথম সম্মান জানিয়ে আমরা যে যার বাড়ি চলে গেলাম।

কিন্তু মাত্র একটি দিন আমাদের মনে এই জয়ের আশা বেঁচেছিল, মরে গেল পরের দিনই।

উঁকি দিয়েছিলাম সতুদার ক্যারম খেলার ঘরে।

সতুদা বলছিলেন—শুনেছিস তো হীরু, জন গিলপিন কি কাণ্ড করেছে, আর তার কি ফল হয়েছে?

হীরুদা বলেন—না।

সতুদা—মনভ্রমরবাব মাইনে বাড়িয়ে দেবার জন্য ছোট স্কুলের সেক্রেটারির কাছে গিয়ে কিসব আবোল-তাবোল কথা বলেছে।

চেঁচিয়ে হেসে উঠেন হীরুদা—সর্বনাশ, জন গিলপিনের পেটে পেটে এত ফন্দিও ছিল।

কানুদা বলেন—দুঃস্বপ্ন! হরিটা একটা অন্ধ।

সন্তুদা বললেন—ফলও ফলে গিয়েছে।

হারু—কি হয়েছে?

সন্তুদা—সেক্রেটারি চরণবাবু হরির গর্দানে হাত দিয়ে একটা ধাক্কা দিয়ে তাঁর বৈঠকখানা থেকে সোজা বের ক'রে দিয়েছেন হরিকে।

ভেবে ছিলাম এই সব ব্যাপার সুধাদিকে কিছু জানাব না। কিন্তু হরিদা মার খেয়েছেন শুনে মনটা এত খারাপ লেগেছিল যে, পরের দিনই সন্ধ্যাবেলা গিয়ে সুধাদির কাছে সব বলে ফেললাম।

শুনে সুধাদি বড় বেশি রেগে উঠলেন আমাদেরই উপর। এরকম শক্ত কথা বলতে আর এত ধমক দিতে কখনো তাঁকে দেখি নি।—বকাটে ছেলে সব, পরামর্শ করবার আর লোক পেলে না? হরিদা'র কাছে এসব কথা বলতে গেলে কেন তোমরা? যে লোকটা একটা ইসে, যার মাথার কোন ঠিক নেই, তার কাছে গিয়ে ......।

বলতে বলতে মুখ ঘুরিয়ে একেবারে চুপ করে গেলেন সুধাদি। আমরাও ভয়ে একেবারে বোবা হয়ে গিয়েছিলাম।

যেন একটা যন্ত্রণায় ছটফট ক'রে ধিক্কার দিয়ে উঠলেন সুধাদি—ছি ছি ছি, শেষে লোকটাকে তোমরা মার খাওয়ালে?

তার পরেই সুধাদির সুন্দর মুখেরই মধ্যে চোখ দুটো কি ভয়ংকর দপ্‌ ক'রে জ্বলে উঠল!—কি ভেবেছেন চরণবাবু, সামান্য কারণে একটা মানুষকে অপমান করবেন আর মারবেন?

স্কুল বারান্দার থামের গায়ে হাত দিয়ে ফটকের দিকে তাকিয়ে রইলেন সুধাদি। আস্তে আস্তে খুব ক্লান্ত স্বরে বললেন—লোকটাই বা কি রকম! কেন মিছামিছি পরের জন্য মাথা ঘামাতে গিয়ে গলা ধাক্কা খায়?

আলো জ্বেলে দিয়ে গেল স্কুলের মালী, সুধাদি তেমনি থাম ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আর বারান্দার উপর আমরা চুপ ক'রে গুটিগুটি হয়ে বসে আছি। মনে মনে ঠিক করে ফেলেছি, বাড়ি যাবার সময় সুধাদির কাছে ক্ষমা চাইব।

ফটক খোলার শব্দ শুনে ফটকের দিকে তাকালাম। বোধ হয়, সন্ধ্যার ডাকপিয়ন চিঠি নিয়ে আসছে। কিন্তু আসছিলেন যিনি, তাঁকে দেখামাত্র আমরা এমন চমকে উঠলাম যে, কি-যে করব কিছুই ভেবে পেলাম না। থাকব, না যাব, কিংবা একটু দূরে সরে গিয়ে দাঁড়াব।

আসছিলেন শান্তিদা। হাতে ছোট একটা ক্যামেরা ঝুলিয়ে আর রঙীন শালে

তাঁর শৌখিন চেহারা জড়িয়ে হাসিমুখে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছেন শান্তিদা।

আমরা তো চমকে উঠলাম, কিন্তু সুধাদি যে চুপ করে দাঁড়িয়ে শুধু একটু আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে রয়েছেন। কি আশ্চর্য, সুধাদি কি শান্তিদাকে চিনতে পারছেন না?

সুধাদি আমাদেব দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা কবলেন—কে আসছেন, চেন তোমবা?

—সে কি সুধাদি? শান্তিদা আসছেন।

চমকে উঠলেন সুধাদি, শান্তিদাও কাছে এসে পড়েছেন, আব এসেই হেসে হেসে বললেন—বোধ হয় ভাবতে পাব নি, আমি এইভাবে হঠাৎ এসে তোমাকে একদিন চমকে দেব।

কাঠ হযে দাঁডিযে রইলেন সুধাদি। বোধ হয সতিাই ভাবতে পাবেন নি যে, চিঠিব মানুষ একদিন এসে কথা বলবে। এত বঙীন কথাব মানুষকে এত কাছে চোখে দেখাব পব এত অ চনা ও অজানা ব'লে মনে হবে তা'ও বোধ হয আগে বুঝতে পাবেন নি সুধাদি।

আমবাই চেযাব টেনে নিযে এসে শান্তিদাকে বসতে দিলাম। সুধাদি সেই বকমহ কেমন শক্ত হযে দাঁডিয়ে বইলেন। শান্তিদা আমাদেব দিকে তাকালেন, বোধ হল আমাদেব বযসগুলিব দিকে একবাব তাকিয়ে নিলেন। তাব পবেই সুধাদিব দিকে তাকিয়ে বললেন—কলকাতা থেকে মা চেযে পাঠিয়েছেন তোমার তোমাব একখানি ফটো।

উত্তব দিলেন না সুধাদি। যেন একেবাবে অপবিচিত একটা মানুষ এসে সুধাদিব সঙ্গে কথা বলছেন, তাই ভয় পেযে একেবাবে নীবব হযে গিয়েছেন সুধাদি।

শান্তিদা হাসিমুখে বলেন—আজ শুধু জানিয়ে গেলাম, কাল আসব ফটো তুলতে। তাবপব যা ব্যবস্থা কববাব সবই কববেন মা।

সুধাদি বলেন—না, কাল আসবেন না।

শান্তিদা চেয়াব ছেডে ওঠেন। সুধাদিব কাছে এগিযে যেয়ে গলাব স্বর নামিয়ে আস্তে আস্তে বলেন—না, আব দেবি কবা উচিত নয সুধা, আমি কালই এসে তোমাব ফটো নিয়ে যাব। কেমন?

হাঁ বা না কোন উত্তবহ দিলেন না সুধাদি। শান্তিদা কিন্তু হাসিমুখেই চলে গেলেন।

দু'হাতে কপাল চেপে বারান্দার মেজের উপর বসে পড়লেন সুধাদি। বললেন—তোমরা এবার বাড়ি যাও।

দিনটা ছিল রবিবার। সকাল হতেই শহরের পুবের পাহাড়ের মাথা অন্য দিনের মতো সেদিনও রঙীন হয়ে উঠল। চটপট তৈরি হয়ে নিয়ে আমরা ছোট স্কুলের দিকেই ছুটে চললাম। পলাশতলার ক্যামেরা আসবে আজ সুধাদির ঘরে। সুধাদিও বোধ হয় সেই বাসন্তি পুজার মতো চাঁপা রঙের শাড়ি প'রে বড় সুন্দর হয়ে উঠবেন। ফোটা পলাশের রঙ আবার ছড়িয়ে পড়বে সুধাদির মুখের উপর। নানারকম আশায় ছট্‌ফট্ করছিল আমাদের মন।

ছোট স্কুলের ফটকে ঢুকবার আগেই থমকে দাঁড়ালাম আমরা। রঙীন খড়ি দিয়ে ফটকের পাশের দেওয়ালে লেখা রয়েছে—শান্তি সুধা শান্তি-সুধা।

কে লিখল এই কথা? কে জেনে ফেলল পলাশলতার রঙীন চিঠির কথা? আমরা তো কোনদিনই সতুদার কাছে কিংবা কোন দাদার কাছে শান্তিদা আর সুধাদির চিঠির গল্প করি নি। তবে কি কাল সন্ধ্যাবেলা ছোট স্কুলের ফটক দিয়ে শান্তিদাকে ঢুকতে কিংবা বের হয়ে যেতে কেউ দেখেছে?

ভুতো বলে—এটুকুও বুঝতে পারলি না বোকা। যারা এতদিন ধরে জানবার চেষ্টা করছিল, তারাই জেনেছে আর লিখেছে।

এইবার বুঝলাম, এই রঙীন খড়ির লেখা কা'দের হাতের কীর্তি। সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়ল, রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে রঙীন খড়ির শান্তি-সুধার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন হরিদা। দু'চোখের পলক পড়ছে না, পাথরের মতো চোখ নিয়ে দেখছেন হরিদা। তার পরেই মনে হলো, হরিদা'র পাথুরে চোখ দুটো যেন চিক-চিক করছে। ডাকলাম—ও হরিদা, কি দেখছেন?

সাড়া দিলেন না হরিদা। শুনতে পেলেন কিনা, তা-ও বুঝলাম না।

যাক গিয়ে, হরিদা'র পাথুরে চোখ আর চোখের চিকচিক। সুধাদির চাঁপা-রঙের সাজ দেখবার লোভে তখন আমরা ছটফট করছি। ফটক পার হয়ে সুধাদির ঘরের কাছে এসে দাঁড়ালাম।

সুধাদি তখন তাঁর ঘরের ভিতর খাটের উপর বসে বই পড়ছিলেন। আমরা ডাক দিতেই বললেন—ভেতরে এস।

অসুখ হয় নি, কিন্তু ভয়ানক অসুখের মতো দেখাচ্ছিল সুধাদির চেহারাটা। হেসে হেসে বললেন সুধাদি—আমাকে আজ বাঁচাতে পারবে তো?

মুখ কালো হয়ে গেল আমাদের—আপনার কি অসুখ হয়েছে সুধাদি?

সুধাদি বলেন—অসুখ নয় ভাই।

ভুতো প্রশ্ন করে—তবে কি?

উত্তর দিলেন না সুধাদি। বই বন্ধ ক'রে অনেকক্ষণ আবার আনমনার মতো চোখ নিয়ে কি-যেন চিন্তা করলেন। তার পর বললেন—হরিদা'র খবর কি? ভাল আছেন তো?

আমরা চুপ ক'রেই ছিলাম। সুধাদিই আবার ব্যস্ত ভাবে প্রশ্ন করলেন—কি? হরিদা'র সঙ্গে তোমাদের কি আর দেখা হয় নি?

বলাই বলে—এই তো এখনি ফটকের কাছেই দেখা হল হরিদা'ব সঙ্গে। ডাক দিলাম, কিন্তু কোন সাড়াই দিলেন না।

উঠে বসলেন সুধাদি—কি রকম? কি করছিলেন হরিদা?

খুলে বলতে সত্যিই সঙ্কোচ হচ্ছিল আমাদের সবারই। পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে চোখে চোখে পরামর্শ করছিলাম, সত্যিই ব্যাপারটা বলে ফেলব কি না? বলাই বলল—তুই বল না ভুতো।

ভুতো বলে—ফটকেব পাশের দেয়ালে কে যেন রঙীন খড়ি দিয়ে লিখে রেখে দিয়েছে।

সুধাদি—কি লিখেছে?

ভুতো—শান্তি-সুধা।

হাতের বই ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সুধাদি চেঁচিয়ে ওঠেন—কে লিখল? কোন্ মুখ্‌খু এসব মিথ্যা কথা লিখল?

আমি বললাম—আমরা কি ক'বে বলব সুধাদি।

ঘর ছেড়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন সুধাদি। সত্যিই যেন জ্বর হয়েছে, আর সেই জ্বরের জ্বালা সহ্য করতে পারছেন না। ছটফট ক'রে বলে উঠলেন—কে জানে, তোমাদের হরিদাও বোধ হয় এতক্ষণে ঐ মিথ্যা কথাটা দেখে ফেলেছেন।

ভুতো—হরিদা দেখে ফেলেছেন সুধাদি।

সুধাদি—ছি ছি ছি, কি ভাবল লোকটা!

আর একবার ছটফট ক'রে ওঠেন সুধাদি। বলেন— যাও, এখনি গিয়ে লেখাটা মুছে দিয়ে এস।

রঙীন খড়ির লেখা মুছে ফেলবার জন্য আমরা দৌড় দিয়েই চলে যাচ্ছিলাম। পিছন থেকে সুধাদি ডাকলেন—শোন।

শোনবার জন্য ফিরে এলাম। সুধাদি আঁচল দিয়ে কপাল মুছে নিয়ে আস্তে আস্তে বললেন—হরিদাকে গিয়ে বলো, তিনিই যেন ঐ লেখাটা নিজের হাতে মুছে দেন। বলো, আমি বলেছি।

এক দৌড়ে ফটক পার হয়ে রাস্তার উপর এসে দাঁড়ালাম। দেখলাম, হরিদা সেখানে আব নেই। চলে এলাম হরিদা'র ঘরের কাছে। কিন্তু এখানেও নেই হবিদা। দরজায় কোন তালাও ঝুলছে না, পেয়ারা গাছের তলায় বুড়ো টাট্টুও আর নেই। একেবারে খোলামেলা শূন্য হয়ে পড়ে আছে হরিদা'র ঘর। হরিদা'র সেই ছোট খাটিয়াও আর নেই।

খোঁজ নিলাম পাশের ঘরের দোকানী রতনলালের কাছে। রতনলাল বলে—চলে গিয়েছে হবি ডাক্তার, ঘর ছেড়ে দিয়েই চলে গিয়েছে।

জিজ্ঞাসা করি—কোথায় গিয়েছেন?

রতনলাল বলে—জানি না।

সুধাদির কাছে ফিরে এসে খবরটা দিতে কেন যেন বড় ভয় করছিল। ভীরু বলাইয়েব চোখটা তো প্রায় কাঁদ-কাঁদ হয়ে উঠল। তবু ব'লে ফেললাম—হরিদা চলে গিয়েছেন সুধাদি।

সুধাদি—কোথায়? ডাক্তারি কবতে?

ভুতো বলে—না, একেবারে ঘর ছেড়ে দিয়ে চলে গিয়েছেন। রতনলালও জানে না, কোথায় গিয়েছেন হরিদা।

চোখের তাবা দু'টো নিশ্চল ক'বে তাকিয়ে রইলেন সুধাদি। যেন নিজের মনেই ভাঙা নিঃশ্বাসেব ব্যথার মতো অস্পষ্ট স্ববে বললেন—চলেই গেল মানুষটা, রঙীন খড়ির একটা বাজে লেখাও সহ্য করতে পাবল না!

সুধাদির চোখ থেকে টপ ক'রে বড় একটা জলের ফোটা ঝরে পড়ল সুধাদির হাতের চুড়ির উপব। দৌড়ে ঘরের ভিতব গিয়ে ঢুকলেন সুধাদি। কাগজ কলম টেনে নিয়ে একটা চিঠি লিখতে শুরু করলেন।

আবার চিঠি? কা'র কাছে, কিসের চিঠি? বুঝতে পারছিলাম না কিছুই। লেখা শেষ ক'রে একটা সাদা খামের ভিতর চিঠিটা পুরে খামের উপর নাম লিখলেন সুধাদি—হরিপদবাবু শ্রদ্ধাস্পদেষু।

তারপর আমাদের বললেন—এখনি যাও, সব জায়গায় খুঁজে দেখ। যেখানেই লুকিয়ে থাকুক হরিদা, তাঁকে খুঁজে বের করতেই হবে। দেখা পেলেই এই চিঠি হরিদা'র হাতে দেবে।

ভয়ে ভয়ে বললাম—যদি দেখা না পাই সুধাদি ?

সুধাদি চেঁচিয়ে উঠলেন—নিশ্চয় দেখা পাবে, এরই মধ্যে কোথায় পালিয়ে যাবেন তোমাদের হরিদা ?

সকাল থেকে সারা দুপুর পর্যন্ত শহরের সব জায়গায় খোঁজ করলাম। কোথাও দেখা পেলাম না হরিদা'র। মোটর বাস কোম্পানিতে এসে খোঁজ নিলাম। দারোয়ান বলল, হ্যাঁ, সকাল ন'টার মোটর বাসে চলে গিয়েছেন হরি ডাক্তার।

চকের কাছে এসে অনেকক্ষণ ধরে আমরা ভাবলাম, কি গতি করব এই চিঠিটার ? হরিদা'র কাছে লেখা সুধাদির এই চিঠি, কি আছে এর মধ্যে কে জানে ?

ভুতোর একবার ইচ্ছা হয়েছিল, চিঠি খুলে নিয়ে পড়া যাক। বাধা দিল বলাই—ছিঃ, গুরুজনদের চিঠি পড়তে নেই।

সুতরাং সকলে মিলে ঠিক করলাম, একটা ডাক টিকিট লাগিয়ে চিঠিটাকে ডাক-বাক্সেই ফেলে দেওয়া যাক। কে জানে কপালে যদি থাকে, তবে একমাস দু'মাস বা কয়েক বছর পরেও হয় তো হরিদা'র হাতে পৌঁছে যাবে এই চিঠি। এই রকম ঘটনার গল্পও তো কত শুনতে পাওয়া যায়।

বিকাল হবার পর ছোট স্কুলের পাঁচিলের দিকে যেতেই চোখে পড়ল, শান্তিদা দাঁড়িয়ে রয়েছেন সুধাদির ঘরের বারান্দায়। আর সুধাদি দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর ঘরের দরজায়। শান্তিদার হাতে ক্যামেরা ঝুলছে ঠিকই, কিন্তু সুধাদির গায়ে চাঁপা-রঙের শাড়ি তো দেখা যাচ্ছে না। বরং কি রকম আলুথালু চুল নিয়ে আর ধুতির মতো সরু পাড়ের একটা আধময়লা শাড়ি প'রে দাঁড়িয়ে আছেন সুধাদি।

আস্তে আস্তে এগিয়ে যেয়ে সুধাদির আশে পাশে আমরা দাঁড়িয়ে পড়লাম। শান্তিদা তখন আশ্চর্য হয়ে বলছিলেন—কি বললে, আমাকে তুমি চেন না ?

সুধাদি—আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনার কতটুকু পরিচয়ই বা আমি জানি ? কিছুই জানি না।

রঙীন খামের চিঠির মস্ত বড় একটা মালা সুধাদির ঘরের দেয়ালে তখনো ঝুলছিল। সেই দিকে আঙুল তুলে শান্তিদা বললেন—তবে ওগুলি কি ?

সুধাদি—কতগুলি রঙীন চিঠি ?

শান্তিদা—কি আছে ঐ চিঠির মধ্যে, জান না ?

সুধাদি—জানি, কি আছে।

শান্তিদা—কি আছে ?

সুধাদি—কবিতা, গান, রঙ, কথা, ছবি।

শান্তিদা বললেন—শুনে সুখী হলাম। তাহ'লে তোমার আর কিছু বলবার নেই ?

সুধাদি—আছে।

শান্তিদা—কি ?

সুধাদি—ক্ষমা করবেন।

শান্তিদা কিছুক্ষণ কি ভাবলেন, তারপর বললেন—একটা কথা জিজ্ঞাসা করব ?

সুধাদি—বলুন।

শান্তিদা—বোধহয় আমাকে অপমান করবার জন্যই ইচ্ছে ক'রে এরকম বিধবার মতো সাজ করেছ ?

চোখ দুটো শক্ত ক'রে উত্তর দিলেন সুধাদি—আজ্ঞে না।

শান্তিদা—তবে ?

সুধাদি—বিধবা হয়েছি।

শান্তিদা ভ্রুকুটি করেন—কবে ?

সুধাদি—আজ।

শান্তিদা বিদ্রূপের সুরে প্রশ্ন করলেন—আজ ক'টার সময় ?

চুপ করে রইলেন সুধাদি। শান্তিদা বিশ্রী রকমের চোখের দৃষ্টি তুলে তাকালেন সুধাদির দিকে—কি ? একটা বাজে কথা ব'লে চুপ ক'রে গেলে কেন ? উত্তর দাও।

চট ক'রে উত্তর দিয়ে দিল ভুতো—আজ সকাল ন'টার সময়।

চমকে উঠেন শান্তিদা—তার মানে ?

ভুতো বলে—আজ সকাল ন'টার গাড়িতে চলে গিয়েছেন হরিদা, আর ফিরে আসবেন না হরিদা।

পকেট থেকে রুমাল বের ক'রে কপালের ঘাম মোছেন শান্তিদা।—ওঃ এইবার বুঝলাম। ধন্যবাদ।

হন্ হন্ ক'রে হেঁটে ফটক পার হয়ে চলে গেলেন শান্তিদা। সুধাদি ঘরের ভিতর ঢুকে খাটের উপর শুয়ে বালিশে মুখ গুঁজে দিয়ে পড়ে রইলেন। আমরা একেবারে মন-মরা হয়ে পাঁচিলের উপর গিয়ে বসলাম। তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে আর ছোট একটা ভাঙা চাঁদও উঠেছে পশ্চিমের আকাশে।

ভাল লাগছিল না কিছু। নিঝুম হয়ে রয়েছে স্কুলঘর। বড় মাঠের বুকে হাওয়া খেলছে খুব, আব ঘাসের উপর চাঁদের আলোও পড়েছে। পাঁচিল থেকে নেমে আমরা মাঠের ঘাসের উপর গল্প করতে বসলাম।

হঠাৎ তীরের মতো বেগে আর খুটখুট শব্দ ক'রে যেন একটা ছায়া ছুটে এসে আমাদের কাছ থেকে একটু দূরে দাঁড়াল। দেখলাম, ছায়া নয়, হরিদা'র বুড়ো। বুড়োর পায়ে আজ আর কোন দড়ির বাঁধন নেই। বুড়োব পায়ের বাঁধন খুলে বুড়োকে যেন একেবারে মুক্তি দিয়ে চলে গিয়েছেন হরিদা।

কিন্তু আমাদের কি চিনতে পারছে না বুড়ো? যদি চিনতে পেরেই থাক, তবে পালিয়ে যায় না কেন?

কি আশ্চর্য, একপা দু'পা ক'বে আস্তে আস্তে আমাদেরই দিকে এগিয়ে আসতে থাকে বুড়ো। সাহসী ভুতো ভয় পেয়ে লাফিয়ে ওঠে।—ওরে বাবা!

এক দৌড় দিয়ে ছুটে এসে স্কুলের পাঁচিলের উপরে আমরা উঠলাম। হরিদা'র বুড়ো সেই খোলা মাঠের হাওয়াতে বোঁ বোঁ ক'রে একটা চক্কর দিয়ে ঠিক আবার আমাদের এই পাঁচিলের কাছেই এসে দাঁড়াল। আমাদের দিকে মুখ তুলে একেবাবে স্থির ও শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল বুড়ো। আরও ভয় পেয়ে আব হুড়মুড় ক'বে আমরা পাঁচিল থেকে নেমে সুধাদির ঘরের বারান্দায় এসে উঠলাম।

ঘবে ভিতর থেকে সুধাদি বললেন—কে?

—আমরা?

সুধাদি ভিতর থেকে বেব হয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন—এখন আবার পাঁচিলেব কাছে গিয়ে কি করছ তোমরা?

—হরিদা'র বুড়ো আজ নিজের থেকেই ধরা দিতে আসছে সুধাদি।

কেঁপে উঠল সুধাদির উদাস চোখ দুটো। বললেন—থাক, কিছু বলো না।

বড় শান্ত হয়ে গিয়েছেন সুধাদি। বড্ড আস্তে আস্তে কথা বলছেন। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম—আপনার শরীব ভাল আছে তো সুধাদি।

সুধাদি বলেন—হ্যাঁ।… এবার তোমরা বাড়ি যাও।

—আসি সুধাদি। সুধাদির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চললাম আমরা। বেশ বুঝতে পারছিলাম, ছোট স্কুলের পাঁচিলের মায়া আর খেলা এতদিনে শেষ হলো। আর খেলা কোনদিনই জমবে না। খেলা আর হবেই কিনা, ঠিক কি? হরিদাকে জব্দ করবার আর কোন চান্স নেই।

সুধাদি ডাকলেন—একটা কথা শুনে যাও।

কাছে আসতেই হেসে হেসে জিজ্ঞাসা করলেন—আমার চিঠিটা কই?

সাহসী ভুতো গলা কাঁপিয়ে বলে—ডাকবাক্সে ফেলে দিয়েছি সুধাদি।

দু'হাতে মুখ ঢাকেন সুধাদি। আমরাও সরে এলাম। ছোট স্কুলের ফটক পার হয়ে রাস্তায় পা দেবার আগেই শুনতে পেলাম, গুন্ গুন্ ক'রে কাঁদছেন সুধাদি।

ক্যারম খেলার শব্দ শুনে সতুদাদের ঘরের জানালার কাছে এসে দাঁড়ালাম। উঁকি দেওয়া মাত্র শুনাম, সতুদা বলছেন—শুনেছিস্ হীরু, মনভ্রমবাবর খবর?

হীরুদা বলেন—কি খবর?

সতুদা—কার ওপর মজেছে বল দেখি?

হীরুদা—কার ওপর?

সতুদা—শান্তিপদ নীলকমলে।

আমার পাশে দাঁড়িয়েই জানালার গরাদ ধরে ভুতো চেঁচিয়ে ওঠে।—হরিপদ নীলকমলে।

চমকে আর রেগে একটা লাফ দিয়ে উঠে এসে সতুদা খপ্ ক'রে ভুতোর একটা কান ধরলেন। বল্ ছোঁড়া, এর মানে কি?

ভুতো আর্তনাদ করে—আঃ, মানে হচ্ছে, হরিদা চলে গিয়েছেন, তাই সুধাদি গুন্ গুন্ ক'রে কাঁদছেন।

ভুতোর কান ছেড়ে দিয়ে অবাক হয়ে হীরুদা আর কানুদার মুখের দিকে বার বার ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকাতে থাকেন সতুদা।—এ কী বলছে রে হীরু!

সতুদাই কিছুক্ষণ কি যেন ভাবেন। মুখ কালো ক'রে বসে থাকেন। তার পরেই বলেন—আমারও কি-রকম মনে হচ্ছে হীরু।

হীরুদা—কি মনে হচ্ছে?

সতুদা মনে হচ্ছে, ঠিকই বলেছে স্টুপিড ভুতোটা।

কানুদা বলেন—হ্যাঁ, ঠিকই বলেছে।

হীরুদা বলেন—আমারও তাই মনে হয়।

সতুদা কিছুক্ষণ বোকার মতো তাকিয়ে থাকেন, তারপরেই বলেন—তবে চল্, লেখাটা মুছে দিয়ে আসি।

উপেনবাবুর ছেলে নেই, একথা তাঁরা সকলেই জানেন যাঁরা উপেনবাবুকে জানেন। সন্তান বলতে শুধু দুটি মেয়ে আছে উপেনবাবুর।

নিকট আত্মীয় অথবা বন্ধুস্থানীয় যাঁরা উপেনবাবু সম্পর্কে আরও বেশি খবর রাখেন, তাঁরা জানেন যে, উপেনবাবুর মেয়ে হলো একটি এবং আর একটি হলো মেয়ের মতো।

রমা আর অম্বি। একটি হলো উপেনবাবুর আত্মজা, আর একটি হলো পালিতা। একটি মেয়ে এবং একটি মেয়ের মতো, এই দুই সন্তানকে নিয়ে সপত্নীক উপেনবাবু একটা বহু পর্যটনার সার্ভিস খাটতে খাটতে সারা ভারতের প্রায় অর্ধেক ভূখণ্ডের জল বাতাস উপভোগ ক'রে এখন কলকাতায় এসে অবসর উপভোগ করছেন। পণ্ডিতিয়ার পশ্চিমে পুরনো বস্তি ভেঙ্গে যে নতুন রাস্তাটা হয়েছে, তারই পাশে উপেনবাবুর নতুন বাড়ি।

প্রতিবেশিনীদের মধ্যে যাঁরা নবাগত উপেন পরিবারের সঙ্গে পরিচিত হন নি, তাঁরা অনুমান করেন, এই দুটি মেয়ে নিশ্চয় যমজ মেয়ে। দু'জনেই মাথায় মাথায় সমান। দু'জনেই বেশ দেখতে, মুখের ধাঁচে দু'জনের মধ্যে কোন পার্থক্যও দেখা যায় না। দু'জনেরই চোখ দুটো একই রকমের টানা-টানা। তবে একজনের গায়ের রঙ হলো মায়ের গায়ের রঙের চেয়ে একটু বেশ উজ্জ্বল, এবং আর একজনের গায়ের রঙ মায়ের তুলনায় একটু কম ফরসা। কেমন যেন একটা শ্যামল ছায়া দিয়ে মাখানো রঙ। বয়স দু'-জনের তো একেবারে সমানই মনে হয়, এবং স্বভাবও যে একই রকমের। প্রতিবেশিনীদের মধ্যে সব চেয়ে নিন্দুক চক্ষুগুলিও দেখে খুশি হয়েছে, আলাপে আচরণে এবং চলায়-বলায় দু'জনেই বেশ শান্ত। যেমন লাজুক, তেমনি ভদ্র। এত মিল যখন, তখন এ'দুটি মেয়ে নিশ্চয় যমজ মেয়ে।

পরিচিত হবার পর প্রতিবেশিনীদের ভুল ভাঙ্গে। উপেনবাবুর স্ত্রী চারুবালাই আগন্তুকা আলাপকারিণীর ভুল ভেঙ্গে দেন।

চারুবালা বলেন—রমা হলো আমার মেয়ে, আর অম্বিকে আমার মেয়ের মতোই মনে করতে পারেন।

প্রতিবেশিনীদের কৌতূহল আর মুখের প্রশ্নগুলির সামনে রমা হাসিমুখে বসে থাকে, আর অম্বি মুখে হাসি আনবার চেষ্টা করে। কিন্তু চেষ্টা ব্যর্থ হয়। হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে আনমনার মতো দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকে অম্বি।

প্রতিবেশিনীরা বলেন—তাই বলুন! আমরা তো ভেবেই পেতুম না, দু'বোন হয়েও দু'জনের মধ্যে একটুও মিল নেই কেন।

রাজশাহীর পিসিমা প্রায় কুড়ি বছর পরে এলেন তাঁর ভাই উপুকে দেখতে। রমা পিসিমার পায়ে হাত দিয়ে সামনে বসে থাকে, আর অম্বি পাখা হাতে নিয়ে পিসিমার মাথায় বাতাস দেয়।

পিসিমা প্রশ্ন করেন—এটি কে রে উপু?

উপেনবাবু—ও হলো রমা, আমার মেয়ে।

পিসিমা—আর এটি কে?

উপেনবাবু—ওর নাম অম্বালিকা, আমার মেয়ের মতোই।

হঠাৎ ব্যথা পাওয়ার মতো অম্বির হাতটা চমকে ওঠে, হাতের পাখা তুলে মুখ ঢাকা দেয় অম্বি। কে জানে, নিজের পরিচয় শুনে এভাবে চমকে উঠে অম্বি, না ঐ পরিচয়টাকেই সহ্য করতে পারে না? কিংবা একটা অহেতুক লজ্জা? চারুবালা জানেন, অম্বির এই একটা বেয়াড়া অভ্যাস।

পিসিমা প্রশ্ন করেন—তোদের কাছেই মেয়েটা মানুষ হয়েছে বুঝি?

উপেনবাবু—হ্যাঁ।

পিসিমা—নামটা ওরকমের কেন?

উপেনবাবু—নামে কি আসে যায় বড়দি। মুখে একটা নাম চলে এল, সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দিলাম, ব্যাস্।

এর বেশি কিছু আর বড়দিকে জানাবার প্রয়োজন আছে ব'লে মনে করেন না উপেনবাবু। কাউকেই এর বেশি কিছু কোনদিন বলেনও নি। উপেনবাবুর এই অল্প কয়েকটি কথার ভিতর দিয়ে প্রায় কুড়ি বছর আগের যে-ঘটনার ছবি তাঁর মনের মধ্যে চকিতে উঁকি দিয়ে চলে গেল, সে ঘটনা শুধু জানেন উপেনবাবু এবং তাঁর স্ত্রী চারুবালা। অম্বালিকা, এই নামের ইতিহাসের সঙ্গে অম্বির জীবনেরই ইতিহাস মিশে রয়েছে। সে বড় পুরনো ইতিহাস, আজ সেটা নিছক একটা আষাঢ়ে কাহিনীর মতোই অবাস্তব ব'লে মনে হয়।

পূর্ব গোদাবরী জেলার ভিতর তখন যে নতুন রেল লাইন তৈরী করা শুরু

হয়েছিল, তার তদারকের ভার ছিল রেল-ইঞ্জিনিয়ার উপেনবাবুরই উপর। গোদাবরীর একটা শাখাস্রোতের ধারে রেল ইঞ্জিনিয়ারের বাংলো। কুলিরা মাস ছয়েক বয়সের একটি মেয়েকে নিয়ে এসে বাংলোর বারান্দায় শুইয়ে দিল।

উপেনবাবু বিরক্ত হন—কা'র মেয়ে? এখানে কেন?

কুলিরা বলে—আপনার ট্রলিম্যানের মেয়ে।

উপেনবাবু—কোন্ ট্রলিম্যান? সেই ভাল্লুকে আঁচড়ানো মুখ, রোগা-মতন লোকটা?

কুলিরা— হাঁ সাব।

উপেনবাবু—সে কোথায়?

কুলিরা—কলেরায় মরেছে। ওর বউও মরেছে। দু'জনকেই নদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। শুধু এই মেয়েটা এখনো বেঁচে আছে; কিন্তু এটাকে তো আর ভাসিয়ে দেওয়া যায় না সাব।

উপেনবাবু—নিশ্চয় না, কিন্তু এ সব ঝামেলা আমার এখানে কেন? গাঁয়ের কোন লোকের বাড়ীতে ওকে রেখে দিয়ে এস।

কুলিরা আক্ষেপ করে—এ জাতের মেয়েকে এই গাঁয়ের কেউ ঘরে রাখবে না সাব।

উপেনবাবু চুপ ক'রে থাকেন। একটা কুলি বলে—ওকে তো শেয়ালে টেনে নিয়েই যাচ্ছিল। যদি আমরা ঠিক সময় মতো না পৌঁছে যেতাম, তবে এতক্ষণে ওর ।

ঘরের ভিতরে দু'মাসের রমাকে আয়ার কোলে তুলে দিয়ে চারুবালা বাইরে বের হয়ে আসেন।—শেয়ালে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল? এই মেয়েকে?

কুলিরা বলে—হাঁ মেমসাব।

চারুবালা বলে—মেয়েটা রইল, তোমরা যাও।

কুলীরা চলে যায়, এবং আবার ঘরের ভিতরে এসে দু'মাসের রমাকে আয়ার কাছ থেকে নিজের কোলে নিয়ে চারুবালা বলেন—ঐ মেয়েটাকে এখনি গরম জল আর সাবান দিয়ে স্নান করিয়ে একটা জামা পরিয়ে দাও আয়া।

কাজে বের হয়ে যান রেল ইঞ্জিনিয়ার উপেনবাবু। দশ মাইল দূরের অফিস-তাঁবু থেকে ট্রলি ক'রে ফিরে এসে যখন আবার এই বাংলো-বাড়ির বারান্দায় উঠলেন উপেনবাবু, তখন রাত মন্দ হয় নি। বারান্দায় চেয়ারে বসে ধুলোমাখা

বুটের ফিতা খুলতে খুলতেই চেঁচিয়ে চারুবালাকে ডাক দিয়ে জিজ্ঞাসা করেন—মেয়েটা ঘুমিয়েছে নাকি?

চারুবালা—কোন মেয়েটা?

উপেনবাবু—ঐ যে, সেই মেয়েটা। আজ সকালে যে অম্বালিকাটি এসেছে।

চারুবালা—হ্যাঁ, দুধ খেয়ে আয়ার ঘরে ঘুমিয়ে আছে।

যেমন আকস্মিক মেয়েটার আবির্ভাব, তেমনি আকস্মিক মেয়েটার নামকরণ। প্রায় কুড়ি বছর আগে ঐ ছয়-মাসের যে একটা প্রাণ শিয়ালের মুখ থেকে উদ্ধার পেয়ে রেল-ইঞ্জিনিয়ার উপেনবাবুর কোয়ার্টারের একটি ঘরে দুধ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল, সেই প্রাণটাই আজ উপেনবাবুর নিজের মেয়ের মতো হয়ে গিয়েছে।

এ মেয়েকে নিজের মেয়ের মতো মনে করবার অথবা গড়ে তুলবার কোন ইচ্ছা ছিল না উপেনবাবুর, চারুবালারও না। শুধু একটা প্রাণকে ক'টা দিন আশ্রয় দিয়ে আর খেতে দিয়ে বাঁচিয়ে রাখা, এইমাত্র। থাকুক কিছুদিন। আর এক বছর পরেই তো এদিকের কাজ শেষ হবে, নতুন সার্ভের কাজে গঞ্জামে বদলি হয়ে চলে যাবার আগেই এই মেয়েকে ওরই একটা জাতের লোকের হাতে সঁপে দিয়ে এবং কিছু টাকা দিয়ে চলে গেলেই হবে।

এক বছর পরেই, বদলি হবার আগে খোঁজ-খবর করায় মাইল দশেক দূরের এক গাঁ থেকে ক'জন জাতের লোকও এসেছিল। মাত্র পঞ্চাশটা টাকা পেলেই তারা এই মেয়েকে মানুষ করবার ভার নিতে রাজি আছে।

ঘরের ভিতর থেকেই চারুবালা বলেন—দূর কর; দূর কর! কোথেকে কতগুলো অলক্ষুনে আপদ এসে জুটেছে।

লোকগুলির দিকে ভ্রূকুটি ক'রে উপেনবাবুরও বলেন—আগে নিজেরা মানুষ হও, তারপর পরের মেয়েকে মানুষ করবে।

চেয়ার থেকে উঠে সত্য সত্যই তাড়া দিলেন উপেনবাবু—ভাগো, ভাগো, ভাগো!

অমানুষগুলিকে তো ভাগিয়ে দেওয়া হলো, কিন্তু অস্থির মনুষ্যত্বের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা না ক'রে পারেন নি উপেনবাবু, চারুবালাও। যদি এই মেয়ে এভাবে বড় হয়ে উঠতে থাকে, এবং যদি এভাবে কারও কাছে এ মেয়েকে তাঁরা ছেড়ে দিতে না পারতে থাকেন, তবে এই মেয়ের পরিণামই বা কি হবে? সমস্যাটা কল্পনা করতে পেরেছিলেন উপেনবাবু। এ মেয়ে তা'হলে যে বাড়ির মেয়ের মতো হয়ে উঠবে।

কিন্তু বাড়ির মেয়ের মতো হয়ে উঠলে ক্ষতি কি? কিসের ভয়? এই প্রশ্নগুলিকেও দূরদর্শী উপেনবাবু বিচার ক'রে দেখতে আর বুঝতে ভুলে যান নি।

ক্ষতি, মেয়েটারই ক্ষতি। মেয়েটার মনটা হয়ে যাবে এ বাড়ির মেয়ের মন, অথচ বিয়ে দেবার জন্য খুঁজতে হবে এ-বাড়ির চেয়ে অনেক নীচের জাতের একটা বাড়ি। সে বাড়িকে তখন এই মেয়েটাই বা সহ্য করবে কেমন ক'রে?

উপেনবাবু আর চারুবালার ক্ষতিটাই বা কি কম হবে? একটা মমতার ভুলে মেয়েটাকে যদি একেবারে বাড়ির মেয়ের মতো ক'রে ফেলা হয়, তবে যার-তার হাতে আর যে-সে ঘরে মেয়েটাকে তুলে দিতেও যে মনটা কেমন কেমন ক'রে উঠবে!

সতর্ক হয়েছিলেন, এবং একটা পরিকল্পনাও করেছিলেন উপেনবাবু। চারুবালাও সায় দিয়ে বলেছিলেন—তাই ভাল। গঙ্গামে থাকতে থাকতে একটা ব্যবস্থা ক'রে ফেললেই হবে।

গঙ্গামে থাকতে থাকতেই কোন একটা চাপরাশি বা ভেণ্ডারের ছেলের সঙ্গে অম্বির বিয়েটা দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে। এই রকম শিশু বয়সেই তো এ জাতের বিয়ে হয়। শুধু খোঁজ ক'রে বের করতে হবে, ভাল একটা ছেলের-বাপ। খেটেখুটে খেয়েপরে আছে, এই রকম একটি শ্বশুরের হাতে অম্বির ভাগ্যকে সঁপে দিতে পারলেই দায়মুক্ত হওয়া যাবে। মোটামুটি এই ছিল উপেনবাবুর পরিকল্পনা।

আশ্চর্যের বিষয়, গঙ্গামের তিনটি বছরের মধ্যে একটি দিনও অম্বির জন্য পাত্র খুঁজবার চেষ্টা করেন নি উপেনবাবু। চারুবালাও স্মরণ করিয়ে দেন নি। গঙ্গাম থেকে বদলি হয়ে যাবার আগে উপেনবাবু বললেন—না, আর বেশি দেরি করা উচিত নয়। সাসারামে গিয়েই একটা ব্যবস্থা ক'রে ফেলতে হবে। মেয়েটাকে আর বেশি ভদ্র ক'রে তুলে লাভ নেই। বয়স অল্প থাকতে থাকতে, আর মনটা পেকে উঠবার আগেই রেল-অফিসের কোন ছোকরা পিওন-টিওনের সঙ্গে ওর বিয়ে দিয়ে দিলেই হবে।

চারুবালা বলেন- দিতেই হবে। একটু ভাল পণ দিলে ওরকম পাত্রও পেয়েই যাবে।

সাসারামের পাঁচ বছর কাটিয়ে দিয়ে রাঁচি যাবার সময় আক্ষেপ করলেন উপেনবাবু—এ তো বাড়ির মেয়ের মতোই হয়ে উঠছে দেখছি। এখন কি যে করি ভেবে পাচ্ছি না।

চারুবালা বলেন—রমার মাস্টার পড়াতে এলে রমার দেখাদেখি অম্বিও আজ-কাল মাস্টারের সামনে গিয়ে বসতে আরম্ভ ক'রেছে।

উপেনবাবু—কেন ?

চারুবালা—লেখাপড়া শিখতে চায় অম্বি।

উপেনবাবু—না না, কোন লাভ নেই। মাস্টারকে আড়ালে ব'লে দিও, অম্বিকে যেন কিছু না শেখায়।

চারুবালা—আমি অম্বিকেই বারণ ক'রে দিয়েছি।

উপেনবাবু—ভাল করেছ। একটু এ-বি সি ডি আর কবিতা শিখে লাভ তো কিছু নেই, উল্টো মেয়েটার না-এদিক না-ওদিক একটা অবস্থা হবে। মুটে-মজুরের ঘরকে ঘেন্না করবে অথচ কোন ভদ্র ঘরে ঠাঁই পাবে না। সুতরাং……।

চারুবালা বলেন—ঝাঁসিতে থাকতে থাকতেই মেয়েটাকে পাত্রস্থ করার যাহোক একটা উপায় বের করতেই হবে।

বহু দূর অতীতের সে-সব চেষ্টার কাহিনী এখন অতীতের একটা স্মৃতি মাত্র। আজ দেখা যাচ্ছে, উপেনবাবু ও চারুবালার প্রত্যেকটি পরিকল্পনা যেন ব্যর্থ ক'রেই বড় হয়ে উঠেছে অম্বি। যে মেয়েকে বাড়ির মতোও মনে করতে চান নি উপেনবাবু, সেই মেয়েই আজ তার নিজের মেয়ের মতো হয়ে উঠেছে।

কিন্তু, ঐ মেয়ের-মতো পর্যন্তই। বাস্, আর না, আর বেশি নয়। অম্বিকে মানুষ করতে করতে হঠাৎ এক জায়গায় এসে যেন থেমে গিয়েছেন উপেনবাবু আর চারুবালা। কারণ, সমস্যাটা এসেই পড়েছে। রমার বিয়ে দিতে হবে, অম্বিরও বিয়ে দিতে হবে। ভয় হয়, অম্বিও যেন রমার মতো, অর্থাৎ লেখাপড়া-জানা ভদ্রলোকের মতো শখ আর মন না পেয়ে যায়। রমার জন্য যেরকম পাত্র পাওয়া যাবে সেরকম পাত্র তো আর অম্বির জন্য পাওয়া যাবে না। অম্বির জীবনটাই যে একটা সমস্যা। জাত-পাত-জন্মের ইতিহাস নিয়ে একটা পরিচয় তো আছে অম্বির। আর পরিচয়টা তো সুবিধার নয়। সুতরাং কে বিয়ে করবে অম্বিকে, জাত-পাত শিক্ষা-দীক্ষা আর অবস্থার দিক দিয়ে একটু নীচু গোছের লোক ছাড়া ? তাই এবার একটু বেশি কঠিনভাবেই সতর্ক হয়েছেন উপেনবাবু আর চারুবালা। যতই খারাপ লাগুক, অম্বির মন আর মনের শখগুলিকে একটু নীচু করিয়েই রাখতে হবে।

বাইয়ের চোখে রমা ও অম্বির মধ্যে কোন পার্থক্য ধরা পড়ে না। কিন্তু মেয়ে আর মেয়ের মতো, এই দু'য়ের মধ্যে যে পার্থক্য আছে, সেটা চোখে পড়বে তাদেরই, এ বাড়ির ভিতরে চোখ দিয়ে দেখবার সুযোগ যাদের আছে।

রমা লেখা পড়া শিখেছে। কলেজে পড়ে। এই তো থার্ড ইয়ার চলেছে। ইংরাজীতে নিয়েছে অনার্স। আর নিরক্ষরা অম্বি, কোনকালেই লেখা পড়া শেখে নি, শেখানোও হয় নি। ও শুধু বই-এর ছবি দেখে বইয়ের মর্ম বুঝতে চেষ্টা করে তার বেশি কোন সাধ্য নেই।

রমার কাছে উপেন বাবু ও চারুবালা হলেন বাবা ও মা। কিন্তু ঠিক এক-রকমের সম্বোধনের অধিকার পায় নি অম্বি। অম্বির কাছে উপেনবাবু হলেন আপ্পি এবং চারুবালা হলেন আম্মি। কে জানে কবে থেকে, বোধ হয় গণ্ডাম থেকেই এই সম্বোধনের ইতিহাসের শুরু।

রমা শোয় চারুবালারই ঘরে, তার পাশের খাটের বিছানায়। আর অম্বি শোয় পাশের ঘরের একটা খাটে, মাঝে একটা দেয়ালের ব্যবধান, যদিও দেয়ালে একটা দরজা আছে এবং দরজাটা খোলাও থাকে।

এই মাত্র, এ ছাড়া রমাতে ও অম্বিতে আর কি পার্থক্য? কিছুই না।

পার্থক্য বলাও ঠিক নয়, বলা উচিত, সতর্কতার ছোট একটি প্রাচীর। বাপ-মা'র মন নামে কতগুলি দুর্ব্বলতা আর মমতা দিয়ে তৈরী একটা জগতের কোথায় যেন একটা ভয় আছে। তাই সতর্ক না থেকে পারেন না উপেনবাবু আর চারুবালা।

এখনো এক একদিন নিভৃতে দু'জনের মধ্যে আলোচনা হয়; এবং আলোচনাও শেষ পর্যন্ত কথায় কথায় কি রকম যেন হয়ে যায়।

চারুবালা বলেন—সেই তো, সেই সমস্যাই দাঁড়াল। পরের মেয়ে নিজের মেয়ের মতো হয়ে উঠল, অথচ……।

উপেনবাবু—কি হলো?

চারুবালা—কে এখন বিয়ে করবে এই নিরেট মুখ্খু মেয়েকে?

কিছুক্ষণ নীরবে চিন্তা করেন উপেনবাবু। তারপর বলেন—ঠিকই বলেছ, সমস্যাই বটে। তবে, ধর, বাঙালী সমাজেরই মধ্যে যদি এমন ছেলে পাওয়া যায়, জাতে যা-ই হোক, লেখা-পড়া কিছু শিখেছে আর ছোটখাট চাকরি বা দোকানদারী ক'রে খেয়ে পরে থাকবার মতো রোজগারও করছে…।

চারুবালা—পাওয়া আর যাবে না কেন, খোঁজ করলেই পাওয়া যাবে।

উপেনবাবু—যদি ভাল পণও দেওয়া যায়…।

চারুবালা—তাহ'লে কোন আপত্তিই করবে না। অম্বির মতো মেয়েকে খুশি হয়েই বিয়ে করতে রাজি হয়ে যাবে।

—কিন্তু। উপেনবাবু কেমন যেন একটু চেঁচিয়ে এবং রুক্ষস্বরেই বলেন, —কিন্তু অম্বি রাজি হবে কি ?

চারুবালাও রাগ ক'রে বলেন—তা, আমার ওপর চোখ রাঙাচ্ছ কেন ? দোষ তো তোমার। তুমিই ভুল করেছ ; তাই…।

উপেনবাবু—ভুল করেছ তুমি।

কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপ ক'রে থাকেন। তারপর দু'জনেই শান্ত হয়ে আর বেশ গম্ভীর হয়ে আলোচনা করতে করতে একমত হয়ে একটা সিদ্ধান্ত ক'রে ফেলেন—যাতে রাজি হয় অম্বি, তাই করতে হবে। আর ভুল করলে চলবে না।

সত্যিই দেখা যাচ্ছে, আর ভুল করতে চান না উপেনবাবু আর চারুবালা। এবার থেকে তাঁরা দু'জনেই আরও বেশি সতর্ক হয়েছেন।

কারণ, সেই সমস্যাটা এতদিনে এসে পড়েছে। রমার আর অম্বির বিয়ের জন্য ভাবতে হচ্ছে। রমাকে নিয়ে কোন সমস্যা নেই, বিয়ের খোঁজ খবর চেষ্টা করলেই করা যাচ্ছে। কিন্তু অম্বির জন্যে যে কোন চেষ্টাও করা যাচ্ছে না।

আগে অনেক ভুল করলেও অম্বিও এইবার যেন বুঝতে পেরেছে, আর ভুল করা চলবে না। সতর্ক হয়েছে অম্বিও। এখন তো সে আর গঙ্গামের সেই চার বছর বয়সের একটা জেদী অবুঝ আর আবদেরে মেয়ে নয়। কুড়ি বছর বয়সের টানা-টানা দু'চোখের দৃষ্টি দিয়ে সে আজ আপ্পি আর আম্মির মনের সমস্যাটাকে সহজেই বুঝতে পারে।

উপেনবাবু ডাকেন—অম্বি।

অম্বি উত্তর দেয়—যাই আপ্পি।

উপেনবাবু—রমা আর তুই তৈরী হয়ে নে তাড়াতাড়ি। পরেশনাথ মন্দিরে আরতি দেখতে যাব।

বের হবার আগে অম্বির সাজসজ্জার রূপ আর রকম দেখে রমা ভ্রুকুটি করে—এ কি একটা বাজে শাড়ি পরে বের হচ্ছিস ? কানপাশা দুটো খুলে রাখলি কেন ?

অম্বি বলে—ঠিক আছে। তুই বাজে বকিস্ না।

উপেনবাবু আর চারুবালা তাকিয়ে তাকিয়ে সবই দেখতে পান এবং

কানেও সব শুনতে পান। কিন্তু কেউ কোন মন্তব্য করেন না। যেন এটাই তাঁদের ইচ্ছা। অম্বিকে একটা বাজে শাড়ি পরিয়ে পৃথিবীতে ছেড়ে দিতে তাঁদের আপত্তি নেই। উপেনবাবু অন্যদিকে চোখ ঘুরিয়ে নেন, আর চারুবালা অন্য একটা দরকারের কথা ব্যস্তভাবে ঘোষণা করেন—ফেরবার পথে নতুন পঞ্জিকা একটা কিনে আনবে, ভুলে যেও না যেন।

পঞ্জিকা কিনতে সেদিন ভুলেই গেলেন উপেনবাবু এবং ঘরে ফিরে হাত মুখ না ধুয়ে চুপ ক'রে বসে রইলেন অনেকক্ষণ। চারুবালা জিজ্ঞাসা করেন—কি হলো?

উপেনবাবু কিরকম বিদ্রূপের সুরে গম্ভীরভাবে বলেন—দেখা হলো তোমার ছোট মামার সঙ্গে।

চারুবালা—কি বললেন ছোট মামা?

—রমাকে দেখেই বললেন, এইটিই বুঝি তোমার সেই পালিতা মেয়ে?

চারুবালার কণ্ঠস্বরও তিক্ত হয়ে ওঠে—কিন্তু ওভাবে বাঁকা ক'রে কথা শুনিয়ে আমাকে কি বোঝাতে চাইছ তুমি?

উপেনবাবু অন্যমনস্কের মত বলতে থাকেন—ছোটমামার কথা শুনে অম্বি তো হেসে কুটি কুটি। সারা রাস্তা হাসতে হাসতে এসেছে, বোধ হয় এখনো হাসছে।

বলতে বলতে উপেনবাবুর গম্ভীর মুখটাই একটা শুকনো হাসি হেসে ফেলে।

উপেনবাবু হাত মুখ ধুতে চলে যান। চারুবালা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকেন। মনে হয়, ছোটমামার প্রশ্নটা সত্যই একটা কঠিন বিদ্রূপ। কিন্তু তার চেয়ে বড় বিদ্রূপ ব'লে মনে হয়, অম্বির ঐ হাসি। এবং এই বিদ্রূপ মনে মনে সহ্য করতে গিয়ে অম্বির উপর মনটা অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে।

কিন্তু বেশি দুশ্চিন্তা করতে হয় না চারুবালাকে, উপেনবাবুকেও না। কারণ, অম্বিই সতর্ক হয়ে যায়।

বাড়িতে আত্মীয়-স্বজনের মেলামেশার আসরও এক একদিন বেশ জমে ওঠে। রমা গান গায়। এলাহাবাদে থাকতেই গানের মাস্টারের কাছে সুর সেধে গলা মিষ্টি করেছে রমা। রমার গান শুনে সকলেই প্রশংসা করে—বেশ গান, বেশ গলা।

আর, অম্বি যেন ঘুরে বেড়ায় এই গানের আশে পাশে। গানের কাছে আসতে চায় না। গানের স্বরলিপি বইটা রমার কাছে এনে দিয়েই সরে

যায়। একটু দাঁড়িয়ে গান শোনে, তার পরেই আরও দূরে সরে গিয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে থাকে।

বমা হঠাৎ ব'লে ফেলে—অম্বিও তো গাইতে পারে।

আতঙ্কিতের মতো এক দৌড় দিয়ে অন্য ঘরে পালিয়ে যায় অম্বি, বমার ডাকাডাকি শুনতে পেয়েও আব এমুখো হয় না।

আত্মীয়-স্বজনের মেলা ভাঙবাব পর ভিতবেব বারান্দার একদিকে চুপ করে বসে থাকেন উপেনবাবু। কাছে এসে বসেন চারুবালা। শোনা যায়, পাশের ঘবে একটা মুখচোবা সঙ্গীত যেন ভয়ে ভয়ে বাতাসেব কাঁপন এড়িয়ে আস্তে আস্তে ঘুবে বেড়াচ্ছে। গান গাইছে অম্বি।

উপেনবাবু জিজ্ঞাসা করেন—এলাহাবাদে থাকতে গানেব মাস্টারের কাছে অম্বিও কি গান শিখেছিল?

চারুবালা বললেন—না।

উপেনবাবু বড় করুণভাবে হাসতে থাকেন—এটা আবাব কিরকমেব একটা ব্যাপাব হলো? শেখানো হলো না, তবুও শিখল!

উত্তর দেন না চারুবালা। শুধু বুঝতে পাবেন তাদেব কথাবার্তার সাড়া পেয়ে মুখচোরা সঙ্গীতটা চুপ করে গিয়েছে, গান বন্ধ করে দিয়েছে অম্বি।

অম্বির এইসব সতর্কতা দেখে একটু খুশিও হন উপেনবাবু, চারুবালাও।

সেদিন দুপুরবেলা ভাঁড়াব ঘবের ভিতর হতে বিস্মিত হয়েই ডাক দিলেন চারুবালা।—অম্বি অম্বি।

—যাই আম্মি।

অম্বি কাছে এসে দাঁড়াতেই এক গাদা লেস হাতে তুলে নিযে চারুবালা বললেন—একি? এগুলি বুনলো কে? তোরই কীর্তি নিশ্চয়।

—হ্যাঁ।

—তোকে কে শিখিয়েছে এসব বুনতে? বমা?

—না।

—বমার দেখাদেখি শিখেছিস?

—হ্যাঁ।

—কি দরকাব তোর এসব শিখে আর মিছিমিছি সময় নষ্ট ক'রে?

চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে অম্বি। চারুবালা গম্ভীরভাবে বলেন—কিন্তু এই সব শিশি-বোতলের পেছনে এগুলি লুকিয়ে রেখেছিস্ কেন? নিয়ে যা।

লেসের গাদা হাতে নিয়ে নিজের ঘরের খাটের কাছে এসে দাঁড়ায় অম্বি। এ লেস সহ্য করতে পারল না আম্মি, ভাবতে গিয়ে অম্বির চোখ দুটো একবার চিকচিক ক'রে ওঠে। এই তো সেদিন আম্মি নিজের হাতে রমার হাতের তৈরি লেস নিয়ে পাশের বাড়ির বৌদিকে দেখাচ্ছিলেন। থাক্ সে কথা। লুকিয়ে রাখতেই তো চেয়েছিল অম্বি। কিন্তু লুকোবার মতো জায়গা কই?

সামনের আলমারিটার মাথার উপর লেসের গাদা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, বিছানার উপর গড়িয়ে পড়ে অম্বি। বুঝতে পারে অম্বি, আরও বেশি সতর্ক হতে হবে।

আপ্পি ও আম্মির সতর্কতা দেখে দুঃখ করে না অম্বি। এসবের জন্য কোন ভাবনা নেই অম্বির মনে। আপ্পি আর আম্মিকে সুখী করবার জন্য দু'টো কানপাশা খুলে রাখতে, আর সব গান ও লেস লুকিয়ে রাখতে কষ্ট হলেও এমন কি কষ্ট? ও ছাই কষ্ট খুব সহ্য করা যায়।

কিন্তু একটা ভয় অম্বির ভাবনাগুলিকে মাঝে মাঝে অস্থির ক'রে তোলে। বিছানার উপর শুয়ে ছটফট করতে করতে কেঁদেই ফেলে অম্বি। কি হবে উপায়, আপ্পি আর আম্মি যদি একদিন ব'লে ফেলেন—তুই আর নিজের হাতে খাবার জল টল আমাদের দিস না অম্বি!

বাজার থেকে ক্লান্ত হয়ে ফিরে এসে চেয়ারের উপর বসবার পর আপ্পি যদি একদিন ব'লেই দেন—থাক, তোর পাখার বাতাসে আর দরকার নেই; অম্বির এই হাত দু'টো যে তাহ'লে চিরকালের মতো অসাড় হয়ে যাবে!

সেই যে কবে, স্মৃতি হাতড়ে খুঁজতে থাকে অম্বি, সেই যে বেবিলিতে থাকতে অসুখের সময় অম্বির মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছিলেন আম্মি, তার পর আর কই? ভাবতে গিয়ে অম্বির মাথাটাই যেন তৃষ্ণার্ত হয়ে বালিশের এপাশে আর ওপাশে আশ্রয় খুঁজতে থাকে। কিন্তু এটা তো অম্বির জীবনের ভয় নয়। একটা দুঃখ বলা যেতে পারে, এবং সে দুঃখ গোপন করার মতো শক্তি আছে অম্বির।

ভয় হলো সেই ভয়। আম্মির যখন মাথা ধরবে, আর আম্মির মাথা টিপে দেবার জন্য যখন হাত বাড়াবে অম্বি, তখন যদি আম্মি মাথা সরিয়ে নিয়ে আপত্তি ক'রে বলে ফেলেন—সর সর, তোর হাতের সেবার দরকার নেই! তবে কি হবে উপায়? আপ্পি ও আম্মির গা ছুঁয়ে পড়ে থাকবার

অধিকারও যদি একদিন বন্ধ হয়ে যায়, তবে সে দুঃখ গোপন করার মতো মনের জোর থাকবে তো?

কেন থাকবে না? একটু শান্ত হয়ে ভাবতে থাকে অম্বি। তা হ'লেও সহ্য করতে হবে, আর আপ্পি ও আম্মি যেন একটুও বুঝতে না পারেন, কত কষ্টে সহ্য করেছে অম্বি সেই দুঃখকে।

বিছানা ছেড়ে উঠে বসে অম্বি। কাজ করতে হবে। কিন্তু কোন কাজ? রমার সঙ্গে যেন কোন তুলনার মধ্যে না পড়তে হয়, সেই সব কাজ। রমা যেসব কাজ করে না, সেই সব কাজেই এই হাত দুটোকে এবার উৎসর্গ ক'রে দেবার জন্য মনে মনে প্রস্তুত হয় অম্বি। রমা থাক লেখাপড়া গান আর লেস নিয়ে। আর অম্বি থাকবে শুধু ···ঐ তো দেখা যায় আপ্পির জুতোগুলিতে একেবারেই পালিশ নেই। মনে পড়ে, ঝিএর হাতের কাচা কাপড় দেখে একটুও খুশি হন না আম্মি।

বিছানা থেকে উঠে কাজে মন দেয় অম্বি। এ ঘর থেকে ও ঘরে ঘুরে ঘুরে হাত দু'টোকে দিয়ে জুতো পালিশ করিয়ে আর কাপড় কাচিয়ে যেন জীবনের সেই ভয়টাকেই একেবারে ক্লান্ত ক'রে দিতে থাকে অম্বি।

উপেনবাবু বললেন –ভাবতে ভালও লাগছে, আবার আর একদিকে মনটা খারাপও লাগছে।

চারুবালা—কেন?

উপেনবাবু—রমার সঙ্গে অধীনের বিয়ের জন্য যদি প্রস্তাব করি, তবে অধীর আপত্তি করবে না বলেই মনে হচ্ছে।

চারুবালা—আমারও তাই মনে হয়।

উপেনবাবু—রমাকে নিয়ে তো আর সমস্যা নেই। কথা হলো, তারপর অম্বির জন্য কি উপায় হবে? সেই জন্যই মনটা খারাপ লাগছে।

সম্পর্কে উপেনবাবুদের আত্মীয়ই হয় অধীর, এবং খুব বেশি দূরের সম্পর্কও নয়। বেশ ভাল ছেলে। গনিতের এম. এ; প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছে, এবং এক বীমা কোম্পানীতে আজ এক বছর হলো ভাল মাইনের কাজও পেয়ে গিয়েছে। অধীরের খুড়িমাও এসে বলে গিয়েছেন—ভাল পাত্রী পেলে, এইবার ছেলেটাকে সংসারে বসিয়ে একবার কেদার বদরী ঘুরে আসতাম।

এর মধ্যে অধীরও কয়েকবার এসেছে, পণ্ডিতিয়ার পশ্চিমে এই নতুন

বাড়িতে। উপেনবাবু আর চারুবালার সঙ্গে গল্প ক'রে চলে গিয়েছে অধীর। একটু তফাতে একটা সোফার উপর পাশাপাশি বসে গল্প শুনেছে রমা ও অম্বি।

উপেনবাবু বলেছেন—ঐ, ওদের মধ্যে ঐটি হলো আমার মেয়ে রমা, আর ঐটি হলো অম্বি, আমার মেয়ের মতোই।

মুখ ঘুরিয়ে অন্য দিকে তাকায় অম্বি, যেন নির্মম এক বিদ্রূপের আঘাত ওর মুখের রং মুহূর্তের মধ্যে কালো ক'রে দিয়েছে।

একদিন এসে, কলেজ ম্যাগাজিনে লেখা রমার একটা প্রবন্ধের খুবই প্রশংসা করে অধীর। সুন্দর ভাষা, এবং ইংরেজী কবিতা সম্বন্ধে এই সব নতুন নতুন কথা এমন ভাল ক'রে গুছিয়ে যে বলতে পারে, তার মন ও মনের সুরুচির প্রশংসা না ক'রে পারা যায় না।

প্রশংসা শুনে রমা লজ্জা পেয়ে মুখ ঘুরিয়ে নেয় উপেনবাবু ও চারুবালার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। উপেনবাবু বলেন -রমার গান তো তুমি এখনো শোন নি অধীর।

অধীর বলল- হ্যাঁ, একদিন এসে শুনতেই হবে।

অম্বি রমার কানে কানে কি যেন বলে। চারুবালা ও উপেনবাবু দু'জনেই উদ্বিগ্নভাবে ও ব্যস্ত ভাবে বলেন—কি? কি শেখাচ্ছে অম্বি?

রমা লজ্জিতভাবে বলে— এখনি গাইতে বলছে। কিন্তু…।

[illegible]—না না, এত তাড়াহুড়োর কি আছে। আর একদিন হবে।

অধীর চলে যাবার পর চারুবালা অম্বিকে বলেন—বাইরের লোকের সামনে ছেলেমানুষি করিস না অম্বি।

দিন পার হয়ে যাচ্ছে একের পর এক। ভালটাতো পার হতেই চলল। ব্যস্ত হয়ে উঠছিলেন উপেনবাবু আর চারুবালা। এইবার প্রস্তাবটা ক'রে ফেলতেই হয়। অধীরের খুড়িমাকে হয় একবার নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে এসে, নয় তো নিজেরাই গিয়ে…।

ট্যাক্সির হর্নের শব্দে ফটকের দিকে তাকাতেই দেখা যায়, অধীরের খুড়িমা ধীরে ধীরে আসছেন।

উপেনবাবু উল্লাসের সুরেই বলেন—আপনার কথা চিন্তা করা মাত্র যখন আপনি এসে গিয়েছেন, তখন বুঝছি নিশ্চয় সুসংবাদ আছে।

খুড়িমা হাসেন—হ্যাঁ, সুসংবাদ আছে। ছেলে বিয়ে করবে, পাত্রীও সে পছন্দ ক'রে ফেলেছে। এখন তোমাদের যদি আপত্তি না থাকে তাহালেই…।

আকস্মিক আনন্দে বিচলিত হয়ে চারুবালা বলেন—কোনই আপত্তি নেই। তবে উনি চাইছিলেন, পরীক্ষাটা হয়ে যাবার পরে কোন তারিখে যদি বিয়ের দিন…।

খুড়িমা—কার পরীক্ষা ?

চারুবালা—রমার।

খুড়িমা—রমার পরীক্ষা রমা দিক না। অম্বির তো আর কোন পরীক্ষা টরীক্ষা নেই।

চারুবালা চেঁচিয়ে ওঠেন অম্বি !

উপেনবাবু প্রশ্ন করেন—আপনি কি অম্বির কথা বলছেন ?

খুড়িমা —হ্যাঁ, অম্বিকেই তো বিয়ে করতে চায় অধীর।

নীরব হয়ে গেলেন উপেনবাবু ও চারুবালা।

খুড়িমা বলেন—কি হলো ? তোমাদের দিক থেকে কি কোন অসুবিধা আছে ?

উপেনবাবু বলেন—না, আমাদের আর অসুবিধা কি ? কিন্তু…।

খুড়িমা—আমিও কিছু কিন্তু ভেবেছিলাম, কিন্তু ছেলে সে সব আপত্তি শুনতে চায় না।

উপেনবাবু বলেন – কার মেয়ে, আর কি জাতের মেয়ে, সে সব কথা অধীর যদি জানতে পেত, তবে বোধ হয়…।

খুড়িমা—জানতে চায়ই না। আমি কি আর সেকথা তুলি নি মনে করেছ কিছু বললেই বলে, এখন তো অম্বি উপেনবাবুরই মেয়ে।

চমকে ওঠেন উপেনবাবু, চারুবালাও। বোবার মতো তাকিয়ে থাকেন উপেনবাবু।

চারুবালা বলেন অম্বি যে লেখা-পড়া কিছুই শেখে নি।

খুড়িমা--তা'ও জানি, আর ছেলেও সব শুনেছে। তবুও…।

কি কঠিন ও নির্মম খুড়িমার মুখের এই কথাটা—তবুও। উপেনবাবু ও চারুবালার সারা জীবনের সতর্কতা ও সাধনা ব্যর্থ করে আর মিথ্যা করে দিয়ে সংসারে একটা ভয়ংকর তবুও জেগে উঠেছে। তাঁদের সব সংকল্প ও পরিকল্পনার পিছনে একটা বিদ্রূপের অম্বি যেন কুড়ি বছর ধ'রে আক্রোশ নিয়ে ছুটে ছুটে এসে এতক্ষণে চরিতার্থ হয়েছে

চারুবালা খুড়িমার দিকে তাকিয়ে বলেন—আমাদের কোনই আপত্তি নেই, অম্বি যদি আপত্তি না করে।

খুড়িমা উঠলেন—তাহ'লে তাই কর। অম্বিকে জিজ্ঞাসা ক'রে, তারপর খবর দিও।

চলে গেলেন খুড়িমা।

বার বার মনে পড়ে খুড়িমার মুখের ঐ ভয়ানক কথাটা—তবুও। উপেনবাবুর মনের সব ভাবনা যেন ভয় পেয়ে এলোমেলো হয়ে গিয়েছে। এত বাধা এত নিষেধ, তবুও। এত সতর্কতা, তবুও আজ কুড়ি বছর ধরে সব অবণ্যের বাধা ভেদ ক'রে আর পাহাড়ের বাধা ছাপিয়ে গোদাবরীর সেই শাখাস্রোতের আত্মাটা ছুটেই এসেছে, কেউ তার গতি রোধ করতে পারে নি।

—এ কি ক'রে সম্ভব হয়? করুণ আক্ষেপের মতো উপেনবাবুর কথাগুলি কাঁপতে থাকে।

চারুবালা গম্ভীরভাবে বলেন—কি?

উপেনবাবু—এই যে রমাকে পছন্দ না ক'রে অম্বিকে পছন্দ করল অধীর।

চারুবালা—ত্া জানে তোমার ভগবান, আমি এ ছাই অনাসৃষ্টির কিছু বুঝি না।

—তাহ'লে কি ...। কথাটা সমাপ্ত না ক'রেই নীরব হয়ে রইলেন উপেনবাবু। যেন বিরাট একটা প্রশ্ন ভূমিকম্পের মতো তাঁর মনের অতলের ঢেউগুলিকে ছন্দহারা ক'রে দিয়েছে। তাহ'লে কি রূপগুণ কুলমান ও শিক্ষা ছাড়াও এবং এসবের উপরেও কিছু আছে? কুয়াশামাখা স্বর্গের মতো রহস্যময় একটা কিছু। নইলে রমাকে পছন্দ না ক'রে অম্বিকে পছন্দ করে, এ কোন প্রেমের চক্ষু?

জোরে নিঃশ্বাস ছেড়ে উপেনবাবু বলেন থাক, এসব ফিলসফি চিন্তা ক'রে আর কোন লাভ নেই। অম্বিকে জিজ্ঞাসা ক'রে অধীরের খুড়িমাকে একটা চিঠি পাঠিয়ে দাও। লেঠা চুকে যাক্।

চারুবালা—অম্বিকে জিজ্ঞাসা করবার আর দরকার বা কি? রাজি তো হয়েই আছে। এই কাণ্ডটি করবার জন্যই তো এ বাড়িতে মেয়ের মতো হয়ে ঢুকেছিল। খুব শিক্ষা দিল অম্বি। শত্রুতেও যেন আ। পরের মেয়েকে আপন মেয়ের মতো ক'রে না পোষে।

চারুবালার ক্ষোভ যেন থামতে চায় না। উপেনবাবুও শুকনো হাসি হেসে বলতে থাকেন—কি অদ্ভুত অদৃষ্ট। নিজেরই মেয়ের মতো, তবু ওর বিয়ের কথা শুনে আনন্দ করতে পারছি না।

চারুবালা বলেন—বেরিলিতে থাকতে নিউমোনিয়া ক'রে যে অম্বি আমাকে একমাস রাত জাগিয়ে ছ'মাস কালি ক'রে দিয়েছিল, সেই অম্বিই কি না আজ…।

বোধহয় বলতে চান চারুবালা, সেই অম্বিই আজ তার আপ্পি ও আম্মির স্নেহমমতার ঋণ শোধ দিল এইভাবে? এই রকম অপমান ক'রে আর সব সতর্ক পরিকল্পনা মিথ্যা ক'রে দিয়ে?

আরও স্পষ্ট ক'রে এবং হিসাব ক'রে আজ উপেনবাবু অনুভব করতে পারছেন—আজ এই প্রথম নয়, সেই গঙ্গাম থেকেই শুরু হয়েছে অম্বির জয়ের আর তাদের পরাজয়ের ইতিহাস। পরাজয়টা শুধু এতদিনে চরমে এসে পৌঁছেছে। মেয়ের মতো হয়েও অম্বি আজ কি জানি কিসের গর্বে তাদের নিজের মেয়েকে ছোট ক'রে দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। সহ্য করতে কষ্ট হয়, ভাবতেও ভাল লাগে না। উপেনবাবু আর চারুবালার এই কুড়ি বছরের যত স্নেহ ও মমতার সব শ্রী ও গৌরব চূর্ণ ক'রে দিল অম্বি।

—যাক্ অনেক ভুল হয়েছে, আর ভুল করতে চাই না। উপেনবাবু বেড়াতে বের হবার জন্য চাদর কাঁধে তুলে নিয়ে তাঁর শেষ সতর্কতার সংকল্প ব্যক্ত করেন। যাক্, পরের মেয়েকে কুড়ি বছর ধরে পোষা আর নিজের মেয়ের মতো মনে করাই ভুল হয়েছে। এখন ভালয় ভালয় পরকে পরের মতই বিদায় করে দাও।

সবে মাত্র সন্ধ্যা হয়েছে। বাইরে থেকে ফিরে এসে [illegible] উপেনবাবু বারান্দার উপর আরাম চেয়ারে শুয়েছিলেন। হঠাৎ চমকে [illegible]। পাশের ঘরের ভিতরে লুকিয়ে থেকে একটা করুণ শব্দ যেন বোবা হয়ে যাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু কি আশ্চর্য; এ তো সেদিনের সেই মুখচোরা গানের শব্দ নয়, মুখচোরা কান্নার শব্দ।

ব্যস্তভাবে চারুবালাকে ডাক দিয়ে জিজ্ঞাসা করেন উপেনবাবু—কাঁদছে কেন অম্বি?

চারুবালা - ও কাঁদছে ওর মনের শখে, আমি কি করব বলো?

উপেনবাবু— বিয়ের কথা বলছ ওকে?

চারুবালা- হ্যাঁ।

উপেনবাবু—কি বললে অম্বি?

চারুবালা—ঐ তো শুনতে পাচ্ছ, যা বলছে।

উপেনবাবু—এ তো কাঁদছে শুধু। হাঁ-না কিছু বলে নি?

চারুবালা—না, কোন কথা বলে নি।

উপেনবাবু—তার মানে হলো, রাজি আছে।

চারুবালা অপ্রসন্নভাবেই বলেন—তাই তো, রাজি না হবার কি আছে?

অস্বস্তি বোধ করছিলেন, এবং বিচলিতভাবে নিঃশ্বাসও ফেলছিলেন উপেনবাবু। চারুবালাও থেকে থেকে ছটফট ক'রে উঠছিলেন। কিন্তু না, আর না, মনের দুয়ার বন্ধ ক'রে এইবার বেশ একটু শক্ত হয়েই বসেছেন দু'জনেই। আর ভুল নয়। যে মেয়ে নিজের মেয়ে নয়, মেয়ের মতোও নয়, একেবারে আস্ত একটা পরের মেয়ে, তার কান্নার কাছে নিজেদের আর দুর্বল ক'রে ফেলতে চান না উপেনবাবু আর চারুবালা।

—আপ্পি। দরজা খুলে আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে একটা পাখা হাতে নিয়ে উপেনবাবুর সামনে দাঁড়ায় অম্বি। উপেনবাবুর ক্লান্ত শরীরের উপর বাতাস দেবার জন্য পাখা তুলতেই উপেনবাবু বলেন—থাক, পাখা রেখে দিয়ে বস।

চমকে ওঠে অম্বির হাত। অম্বির হাতের পাখা মেজের উপর প'ড়ে গিয়ে যেন অস্ফুট আর্তনাদ ক'রে ওঠে। উপেনবাবুর মুখের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে দাড়িয়ে থাকে অম্বি। এতদিনের সেই ভয়ের চাবুকটা এসে এইবার সত্যিই অম্বির মনের সব কল্পনাকে একটি আঘাতেই একেবারে বিমূঢ় ক'রে দিয়েছে।

চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে অম্বি। যেন সহ্য করবার শক্তি খুঁজছে অম্বি। আপ্পি আর আম্মি যেন কিছুতেই না বুঝতে পারেন, অম্বির মনের ভিতর কোন দুঃখ অভিযোগ আর বিদ্রোহ আছে।

অম্বিই দেখে আশ্চর্য হয়, আর চোখ দুটো ছলছল ক'রে ওঠে, আপ্পি আর আম্মি বসে রয়েছেন মুখ করুণ ক'রে, যেন দু'টো শিশুর মুখ। কেউ যেন দু'জনকে অসহায়ের মতো ফেলে রেখে আর ফাঁকি দিয়ে চলে যাচ্ছে, তাই অভিমান।

উপেনবাবুর গায়ের উপরেই ঝাঁপিয়ে পড়ে অম্বি। উপেনবাবুর একটা হাত শক্ত ক'রে চেপে ধ'রে অম্বি বলে—আমায় বিয়ে দিও না আপ্পি।

উপেনবাবু—সে কি কথা?

অম্বি বলে—আমাকে পরের বাড়ি পাঠিও না। আমি চিরকাল এখানেই থাকব। যতদিন তোমরা বেঁচে থাকবে ততদিন আমিও বেঁচে থাকব।

চারুবালা বলেন—আবোল তাবোল কথা বন্ধ ক'রে শান্ত হয়ে বস অম্বি।

অশান্ত, দুরন্ত, আর অবুঝ মেয়ের মতো চিৎকার করে বলতে থাকে অম্বি।—আমার বিয়ে হবে, রমারও বিয়ে হবে, তারপর তোমাদের দেখবার জন্যে থাকবে কে? আমি বিয়ে করব না আম্মি।

চমকে ওঠেন উপেনবাবু, আর চারুবালা নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে থাকেন। একি বলে অম্বি, পূর্ব গোদাবরীর একটা পাড়ার ঘরের ভিতর থেকে কুড়িয়ে আনা আর শেয়ালের মুখ থেকে ছিনিয়ে আনা অতি অন্ত্যজ একটা পরের মেয়ের প্রাণ? এসব কথা কি একটা মেয়ের-মতো প্রাণের উদ্বেগ? না, মেয়ের চেয়ে-বড় একটা সন্তার ব্যাকুলতা?

চারুবালা বলেন—সে চিন্তা ভেবে কেন অম্বি?

অম্বি—চিন্তা না ক'রে পারছি না আম্মি।

উপেনবাবু বিচলিতভাবে বলেন—হেসে হেসে কথা বল অম্বি, নইলে আমি তোর কোন কথাই শুনব না।

অম্বি—হাসতে পারছি না আম্মি। আমি যে তোমাদের · ।

চুপ করে অম্বি। ঘরের অন্তরাত্মা যেন ক্ষণিকের নিস্তব্ধতার মধ্যে দু'কান সজাগ রেখে একটা কথা শুনবার প্রতীক্ষায় রয়েছে, যে কথা আজ পর্যন্ত অম্বির মুখে কোনদিন শোনা যায় নি।

অম্বি বলে—আমি তো তোমাদের ছেলের মতোই। চিরকাল তোমাদের কাছেই থাকব।

বুকের ভিতরে যেন একটা ধাক্কা লেগেছে, আবার চমকে ওঠেন উপেনবাবু ও চারুবালা। কুড়ি বছরের একটা নীরব বিদ্রোহ, একটা শান্ত অভিমান যেন এতদিনে মুখ খুলে ফেলেছে।

—আমাকে কথা দাও আম্মি। চারুবালার একটা হাত শক্ত ক'রে দু'হাতে জড়িয়ে ধ'রে চারুবালার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে অম্বি। অন্য দিকে চোখ ঘুরিয়ে অম্বির মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকেন চারুবালা।

অম্বির দিকে চকিতে একবার তাকিয়েই চোখ বন্ধ করলেন উপেনবাবু। অকস্মাৎ একটা বিস্ময়ের ঝড় এসে যেন তাঁর মনের যত ভুলের আবর্জনা উড়িয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে। মেয়ের মতো তো নয়, তাঁদের আত্মারই মতো

এই মেয়েটা আজ বিশ বছর ধরে তাঁদের সব ভুলগুলিকে হারিয়ে দিয়ে এসেছে। পরাজয় সম্পূর্ণ হলো এতদিনে, এবং এই পরাজয়েও এত আনন্দ ছিল?

গলার স্বরের কাঁপুনি সংযত ক'রে আস্তে আস্তে উপেনবাবু বলেন—তোর বিয়ে না দিয়ে পারব না অম্বি, তুই তো আমাদেরই ·।

চেঁচিয়ে আর্তনাদ ক'রে ওঠে অম্বি—ব'লো না, আর ওকথা ব'লো না আপ্পি। সহ্য করতে পারি না।

হেসে ফেলেন উপেনবাবু।—তুই তো আমাদেরই মেয়ে।

ঘরের বাতাস কয়েক মিনিট একেবারে নিস্তব্ধ হয়েই থাকে। চারুবালার কাঁধের উপর মুখ গুঁজে দিয়ে একেবারে শান্ত হয়ে বসে থাকে অম্বি। যেন বিশ বছরের একটা অভিযোগ এতদিনে শান্ত হলো।

উপেনবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে চারুবালা বলেন—অধীরের খুড়িমাকে কালই চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিতে হবে, তারপর……।

চারুবালার কথা শেষ না হ'তেই ফুঁপিয়ে ওঠে অম্বি।—আম্মি!

উপেনবাবু আর চারুবালা এক সঙ্গেই বিচলিত স্বরে বলতে থাকেন।—ছি ছি, ওরকম করতে নেই অম্বি। সব মেয়েরই বিয়ে হয়, আর বাপ-মা'কে ছেড়ে থাকতেও হয়।

রুপো ঠাকরুনের ভিটা

খিদিরপুরের সঙ্গে এই ছোট জগৎপুরের কোন মিল নেই। জায়গাটাকে সত্যিই ছোটখাট একটা ভিন্ন জগৎ বলেই মনে হয়েছে শুক্তির। পাঁচ ক্রোশ দূরে রেললাইন, আর তিন ক্রোশ দূরে টেলিগ্রাফের লাইন। তবুও ভাল।

এই তো মাত্র তিনটি দিন পার হয়েছে। মস্ত বড় একটা পালকি রেল-স্টেশন থেকে খিদিপুরের মেয়ে শুক্তিকে তুলে নিয়ে চলে এসেছে এখানে। আট জোড়া বেহারার পা তিন ক্রোশ কাঁচা সড়কের ধুলো আর দু'ক্রোশ ডাঙ্গা ও জাঙ্গালের ধুলো মাখতে মাখতে ছোট জগৎপুরের ভিতরে ঢুকতেই চাষীদের ঘরের আঙিনা থেকে চিৎকার ক'রে ছুটে এল এক পাল ছোট ছোট ছেলেমেয়ে—বউরানী, বউরানী। চলন্ত পালকির দরজার কাছে এগিয়ে এসে উঁকিঝুঁকি দিয়ে ছোট জগৎপুরের বউরানীকে দেখতে থাকে ছেলে মেয়ের দল। তারপরেই ব্যস্তভাবে পথের এক পাশে সরে গিয়ে দাঁড়ায়। কারণ, পালকির ঠিক পিছনেই ঘোড়ায় চড়ে আসছেন রাজাবাবু। ঘোড়ার গলার ঘুঙুর বাজে ঝুন ঝুন ক'রে। বিয়ে হয়ে গিয়েছে রাজাবাবুর, বউরানীকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতা থেকে ফিরছেন।

এরই মধ্যে একদিন বৌ-কথা-কও-এর ডাক শুনেছে শুক্তি। অনেক চেষ্টা করেছে পাখিটাকে দেখবার জন্য, কিন্তু দেখতে পায় নি। ঠিক বুঝতে পারা যায় না, কোন্ গাছের আড়ালে কোথায় বসে পাখিটা ডাকছে। মনে হয়, শুধু একটা ডাক এই বাতাসের মধ্যেই গা-ঢাকা দিয়ে আকাশের এদিক ওদিক উড়ে বেড়াচ্ছে। তিন দিনের মধ্যেই শুক্তির বড় বেশি ভাল লেগে গিয়েছে ছোট জগৎপুরের পাখির ডাক।

তিন দিন ধ'রে নহবতের স্বর অশ্রান্তভাবে বেজে বেজে আজ থেমেছে। কুটুম্ব-আত্মীয় যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরাও সবাই বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছেন। প্রজা বাড়ির যত ছেলেমেয়ে এসেছিল মেঠাই নেবার জন্য, তাদেরও হুল্লোড় থেমেছে, চলে গিয়েছে সবাই। বিকাল হবার আগে একদল চাষী-মেয়েও এসেছিল বউরানীর মুখ দেখবার জন্য। মুখ দেখে খুশি হয়েছে তারা, তারপর আধ সের ক'রে চিঁড়ে পেয়ে আরও খুশি হয়ে সবাই চলে গিয়েছে।

তিন দিন ধরে মুখ দেখাতে দেখাতে একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল শুক্তি। অমুক পণ্ডিত মশাই, অমুক গুরুঠাকুর, আর অমুক বড়ঠাকুর, দূরের এই গ্রাম আর সেই গ্রাম থেকে নানা ধরনের মানুষ এসেছে আশীর্বাদ করতে। শুধু মুখ দেখাতে দেখাতে নয়, প্রণাম করতে করতেও ঘাড়ে যেন ব্যথা ধ'রে গিয়েছে। তবুও ভাল, একটুও খারাপ লাগে না শুক্তির।

একটু হাঁফ ছাড়বার জন্যই, অথবা ছোট জগৎপুরের আকাশটাকে একটু ভাল ক'রে দেখবার জন্যই বাড়ির ছাদের উপর এসে দাঁড়ায় শুক্তি। যতদূর দেখা যায়, দূরের ও নিকটের সব দৃশ্যগুলিকেই দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেখতে থাকে।

হঠাৎ চমকে ওঠে শুক্তি। দূরের ঐ নদীর পাশে গাছের ভিড়ের ভিতর থেকে সেই রকমের একটা মন্দির মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখা যায়। চূড়ার উপর আবার ঠিক সেই রকমই একটা ত্রিশূলও যে রয়েছে! অন্য দিকে চোখ ঘুরিয়ে আর মুখ কালো-কালো ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে শুক্তি।

একটু অশান্ত হয়ে ওঠে শুক্তির মন। একটা অস্বস্তি কাঁটার মতো মনের ভিতর বিঁধতে থাকে। ঐ দুঃসহ দৃশ্যটা যে চার বছর আগের একটা আর্তনাদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়! শুক্তির এই নতুন জীবনের শান্তি ও আনন্দকে বিদ্রূপ করবার জন্যই দৃশ্যটা যেন একটা হিংসুক চোরা দৃষ্টির মতো দূর খিদিরপুরের গাছপালার ভিতর থেকে বের হয়ে, আর আড়ালে পা টিপে টিপে এগিয়ে এসে এখানে ঠাঁই নিয়েছে। খিদিরপুরে আর ছোট জগৎপুরে কোথাও কোন মিল নেই। সেকেলে দুর্গের মতো গড়ন এই বাড়িটার সঙ্গে খিদিরপুরের একেলে বাড়িগুলির কোন মিল নেই, তবে এক জায়গায় এই মিল আর এত কুৎসিত মিল কেন?

চার বছর আগের একটি সামান্য একটা ঘটনা মাত্র, বুদ্ধিহীন কয়েকটা মুহূর্তের ভুল মাত্র। খিদিরপুরের বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে যে দৃশ্যটার দিকে মুগ্ধভাবে তাকিয়ে আর পাশের একটা পরিচিত মুখের কাছ থেকে গল্প শুনতে শুনতে হঠাৎ চমকে উঠেছিল শুক্তি, সেই ধরনের একটা দৃশ্যকে যে এখানেও তেমনি ক'রে দেখছে ঐ নদীর তীর, গাছের ভিড়, মন্দিরের চূড়া আর ত্রিশূল। যতবার এমনি লুব্ধ ও উন্মাদ অনুরোধের কাছ থেকে সরে যেতে পারে নি শুক্তি, যে ঘটনা মনে পড়তে কতবার মুখ কালো করেছে, আর সন্ধ্যার অন্ধকারে বসে কতদিন কেঁদেও ফেলেছে শুক্তি, যে ঘটনার কথা স্মরণ করে আজ চার বছর ধরে নিজেকে ঘৃণা করেছে, অশুচি

বোধ করেছে, আর হঠাৎ আতঙ্কে সুস্বপ্নও ভেঙে গিয়েছে শুক্তির, সেই ঘটনাকে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য ঠিক সেই ধরনের একটা দৃশ্য এখানে আবার কেন ?

কিন্তু এটা তো খিদিরপুরের বাড়ির ছাদ নয়; ছোট-জগৎপুরের রাজবাড়ির ছাদ। তবে আর কিসের ভয়? মিথ্যা ও অকারণ ভয়? আনমনার মতো কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল শুক্তি, তা সে জানে না। হঠাৎ চোখে পড়ে, পুব দিকের আকাশটা সত্যিই মেঘলা হয়ে উঠেছে। সেই রকমই একটা মেঘ ভেসে আসছে ঐ মন্দিরের দিকে। সূর্য প্রায় ডুবে এসেছে। পশ্চিমের আকাশ সেই রকমের লাল আর পুবের আকাশটা সেই রকমের কালো। ঐ মেঘটা মন্দিরের ত্রিশূলকে তো এইবার ছুঁয়েই ফেলবে। সঙ্গে সঙ্গে হয়তো ঝিলিক দিয়ে উঠবে সেই চার বছর আগের দিনটার মতো ও সেই রকমেরই একটা বিদ্যুৎ। সেই মুহূর্তে কানের কাছে বেজে উঠবে একটা ভয়ংকর অনুরোধ। তারপর সে ঘটনার কথা মনে পড়লে এখনো শিউরে ওঠে শুক্তি। মনে পড়ে, তার কিছুক্ষণ পরেই তৃপ্ত ও সফলকাম একটা সর্বনেশে পায়ের-শব্দ আস্তে আস্তে সিঁড়ি ধরে নিচে নেমে চলে গিয়েছিল। মাগো!

চোখের উপর আঁচল চেপে ছটফট করে, ঠিক চার বছর আগে খিদিরপুরের বাড়ির ছাদে যেভাবে চোখে আঁচল দিয়ে ভুলের জ্বালা চাপা দেবার চেষ্টা করেছিল শুক্তি।

আস্তে আস্তে একটা শান্ত পায়ের শব্দ সিঁড়ি ধরে উপরে উঠতে থাকে, তারপরেই ব্যস্তভাবে যেন ছুটে এসে শুক্তির কাছে দাঁড়ায়।

শুভেন্দু বিস্মিত ও ব্যথিত হয়েই বলে--এ কি, তুমি কাঁদছো শুক্তি?

চোখের উপর থেকে আঁচল তুলে নিয়েই হেসে ওঠে শুক্তি—কে বললে কাঁদছি? চোখে জল দেখছো?

শুভেন্দু হাসে—না। তবে চোখে আঁচল চেপে কি করছিলে?

শুক্তি—তোমার পায়ের শব্দ শুনছিলাম।

শুভেন্দু—কি ক'রে বুঝলে যে আমার পায়ের শব্দ। অন্য কারও তো হতে পারতো?

শুক্তির মুখের হাসি হঠাৎ নিষ্প্রভ হয়ে যায়। চোখের দৃষ্টিটাও কেমন করুণ হয়ে ওঠে। কিন্তু পরমুহূর্তেই হেসে অস্থির হয়ে মুখের উপর আঁচল চাপে শুক্তি—ধেৎ।

শুভেন্দু—কি হলো?

শুক্তি—যা খুশি তাই বলা হচ্ছে, মুখে একটুও বাধছে না!

হাসিয়ে দেবার আর ভুলিয়ে দেবার ক্ষমতা আছে শুক্তির। শুভেন্দু সত্যিই প্রসন্নভাবে হাসতে থাকে। সে-হাসির ছোঁয়া লেগে শুক্তির এতক্ষণের যন্ত্রণাটাও যেন নিঃশেষে মুছে যেতে থাকে। ও ছাই একটা দৃশ্য দেখে এত বিচলিত হবার কোনও দরকার ছিল না। কবেকার কোন্ এক অন্ধকারের দাগ, পৃথিবীর কারও চোখে ধরা পড়ে নি, কোনদিন কেউ জানতেও পারবে না। তবে বৃথা আর মনটাকে এত ভাবিয়ে তুলে লাভ কি? শুক্তির মুখের হাসি দেখে যে ছোট জগৎপুরের মন এরই মধ্যে ভুলে গিয়েছে, সেই ছোট জগৎপুরকে চিরকাল এমনি ক'রেই হাসিয়ে ও ভুলিয়ে রাখলেই তো হলো। শুক্তি জানে, সে ক্ষমতা তার আছে।

শুভেন্দুরও ভাবতে একটু আশ্চর্য লাগে, এই যে এত সুন্দর দেখতে একটি মানুষ—যার সঙ্গে জীবনে কোনদিন পরিচয় ছিল না, সে কি ক'রে মাত্র সাতটা দিনের মধ্যে শুভেন্দুর সঙ্গে এত আপন হয়ে গেল, আর শুভেন্দুকে এত আপন ক'রে নিতে পারল? অন্য মেয়ে হলে কি করত বলা যায় না, কিন্তু শুক্তি আশ্চর্য করেছে, এই ক'দিনের মধ্যে এই গেঁয়ো ছোট জগৎপুরকেও ভালবেসে ফেলেছে শুক্তি। ঝিঁ ঝিঁ ডাকা সন্ধ্যা আর কেউ ডাকা রাত্রিকেও অবাক হয়ে জানালার ধারে বসে চোখ মেলে দেখছে শুক্তি। এতটা আশা করে নি শুভেন্দু। বরং একটু আশঙ্কাই ছিল, শহরের শিক্ষিতা মেয়ে ছোট জগৎপুরের মতো এমন একটা অজপাড়াগাঁ গামকে ভাল লাগিয়ে নিতে পারবে কি না। কিন্তু সে আশঙ্কা মিথ্যা করে দিয়েছে শুক্তি। আজই সকালে, একটা বাচাল বউ-কথা-কও'কে দেখবার জন্য ঘর থেকে বের হয়ে একেবারে দেউড়ির বাইরে গিয়ে গাছের মাথার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল শুক্তি, অনেকক্ষণ। ভুলেই গিয়েছিল শুক্তি, সে হলো এ বাড়ির বউ, নতুন বউ, আর জগৎপুরের বউরানী। তা ছাড়া, বাড়িতে এতগুলি কুটুম মানুষ যখন রয়েছে তখন...কিন্তু এই ছোট জগৎপুরের আলোছায়া আর শব্দকে আপন ক'রে নেবার টানে সে সব ঘোমটা ঢাকা নিয়মও ভুলে গিয়েছে শুক্তি।

আরও সুখের কথা, শুক্তিকে দেখে, তার চেয়ে বেশি শুক্তির ব্যবহার দেখে কুটুমেরা একটু মুগ্ধ হয়েই গিয়েছেন। এই তো চাই। এরই মধ্যে যে মেয়ে এত আপন ক'রে নিয়েছে শ্বশুরবাড়ির জীবনকে, সে মেয়ে সুখী হবেই হবে।

সবচেয়ে বেশি খুশি হয়েছেন শুভেন্দুর মা। তাঁর ইচ্ছা, নতুন বউ যেন এক মুহূর্তের জন্যও মনে না করতে পাবে যে সে পরের বাড়িতে আছে। এরই মধ্যে শুভেন্দুকে সাবধান করে দিয়েছেন মা।—বউ আমার হাসবে খেলবে আর ঘুরে বেড়াবে। বাড়ির মেয়ের মতো থাকবে। যা, কালই সকালে দু'জনে গিয়ে জগৎলক্ষ্মীর মন্দিরে পুজো দিয়ে আয়।

শুক্তির মুখের দিকে তাকিয়ে শুভেন্দু বলে—কাল তোমার একটা পরীক্ষা আছে।

শুক্তি—পরীক্ষা? কিসের?

শুভেন্দু হাসে—তুমি কত বড় লক্ষ্মী সেটা প্রমাণ হয়ে যাবে।

চুপ ক'রে কিছুক্ষণ কি যেন ভাবে শুক্তি। শুভেন্দু ঠাট্টা করে—কি, ভয় পেয়ে গেলে নাকি?

শুক্তি—ভয়? ভয় করবার কি আছে?

শুভেন্দু—না করলেই হলো।

শুক্তি—আমি ভয় করবার মানুষ নই। নইলে এখানে আসতাম না।

শুভেন্দুর হাত ধ'রে টান দেয় শুক্তি।—চল কোথায় যাবে? কোথায় তোমার পরীক্ষা?

শুভেন্দু হাসে—আজ নয়, কাল সকালে।

এখন তো কোন ভয় নেই শুক্তির মনে, এখানে আসবার আগেও খুব বেশি কিছু ছিল না। বরং ভয় দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন বাড়ির আর সবাই।—স্টেশন থেকে দশ মাইল ধুলো কাদা আর চোরকাঁটা ডিঙিয়ে তবে পৌঁছতে পারা যায় ছোট জগৎপুর, চিঠি পৌঁছয় তিন দিনে। এ তো প্রায় জগৎছাড়া একটা জায়গা।

মনের মধ্যে একটু কিন্তু কিন্তু ভাব নিয়েই ছোট জগৎপুরের পাত্র সম্বন্ধে চিন্তা করেছিলেন বাড়ির সকলেই। পাত্র ভালই। ছোট জগৎপুরের ষোল আনার মালিক। বয়স আর চেহারার দিক দিয়ে পাত্র ভালই। লেখাপড়ার দিক দিয়েও। ঐ জেলারই সদরের কলেজে পড়ত, বি এ পাশ করেছে আজ চার বছর হলো। তবে এটা বোঝা যায়, শহরের জীবন আর চাল চলন থেকে ছেলেটি যেন একটু দূরে সরে থাকতে চায়। কলকাতায় একটা ভাল চাকরি পেয়েও নেয় নি। দুটো ট্র্যাক্টর কিনেছে এবং মাইনে দিয়ে একজন পাশ করা কৃষি ওভারশিয়ারকেও রেখেছে। ছেলেটির মতিগতি দেখে মনে হয়, নিজের

রাজ্যে রাজাবাবু হয়ে আর ছোট জগৎপুরের মাটি ঘেঁটে ঘেঁটেই সে তার জীবন কাটিয়ে দিতে চায়। ভালই তো।

কিন্তু ভয় ছিল, শুক্তি পছন্দ করবে কি না এই বিয়েব প্রস্তাব। যে-রকম মুখচোরা মেয়ে, মনে আপত্তি থাকলেও মুখে কিছু বলবে না। আজ চার বছব ধ'রে কত প্রস্তাবই তো এল আব গেল, কিন্তু শুক্তিব মুখ থেকে পছন্দ-অপছন্দেব একটা সামান্য হাঁ, বা না, মুখেব ভাবে আগ্রহ বা অনিচ্ছার সামান্য একটু ইঙ্গিতও কোনদিন দেখা গেল না। এই সম্বন্ধটা আবার একটু অন্য রকমের। একেবাবে গাঁ দেশের সঙ্গে সম্বন্ধ, যে গাঁ দেশেব চেহাবা সম্বন্ধে কোন ধাবণাই নেই শুক্তিব। সুতবাং শুক্তিব মনে আপত্তি থাকিলে, এই বিয়ের অর্থ হবে মেয়েটাকে জোব কবে বনবাসে পাঠানো।

কিন্তু মুখচোবা মেযেই সবাইকে আশ্চর্য কবে দিয়ে মুখ খুলল।—এখানেই ভাল। হোক না গাঁ দেশ, শহরেব চেয়ে আব কত বেশি খাবাপ হবে?

এমনিতে দেখে মনে হয়, যেন কিসেব একটা ঘেন্নায গাড়ি ঘোড়াব শব্দে অশান্ত ও জনতাপীড়িত এই শহুবে জীবনেব স্পর্শ থেকে বনবাসে চলে যাবার জন্যই একটা জেদ মনেব মধ্যে পুষে নিযে চারটা বছব অপেক্ষা কবছিল শুক্তি। যেই সুযোগ এল অমনি চলে গেল।

ছোট জগৎপুরকে এত ভাল লেগে যাবে, এটাও কল্পনা কবতে পাবে নি শুক্তি। ভাবতে গিয়ে আবও আশ্চর্য হয় শুক্তি, ছোট জগৎপুরক চোখে দেখবার আগেই যেন জায়গাটাকে ভাল লেগে গিয়েছিল। কবে, কোন্‌দিন থেকে, তা'ও মনে কবতে পাবে শুক্তি। ছোট জগৎপুবেব মানুষটিব সঙ্গে পাঁচ মিনিটেব আলাপেব পরেই, এই তো মাত্র পাঁচ দিন আগে, মাঝ রাতেব বাসরঘর যখন নিরালা হলো, তখন।

বলেছিল শুভেন্দু—আমি তো ভেবেছিলাম, গাঁয়েব মানুষকে দেখেই ভয় পেয়ে তুমি মুখ ঘুরিয়ে নেবে।

শুক্তি—আমিও তো ভেবেছিলাম, শহবেব মেয়েকে দেখেই কে-জানে কি-মনে ক'বে তুমি চমকে উঠবে।

শুভেন্দু—আমি চমকে উঠেছি ঠিকই, আমাব এত সুন্দব ভাগ্য দেখে।

ছোট জগৎপুবেব একটা কৃতার্থ ও প্রসন্ন প্রাণ সেই যে শুক্তিব হাত ধবল, কোথায বইল শুক্তির ভয়! না-দেখা গাঁ দেশ ছোট জগৎপুরকেও যেন সেই মুহূর্তে ভালবেসে ফেলেছিল শুক্তি।

ছোট জগৎপুরই একটা ছোট জগৎ এবং বাড়ি বলতে এই একটি মাত্র বাড়ি, যার নাম রাজবাড়ি। আর সবই কুঁড়েঘর। পথে বের হয়ে শুক্তি অবাক হয়ে যায় গাঁয়ের চেহারা দেখে। এখানে-সেখানে ডোবা, এদিকে-ওদিকে কাঁটার ঝোঁপ। এক জায়গায় ঘন সবুজ পাতায় ঠাসা হাজার হাজার বুনো লতা সাপের মতো দেহ জড়াজড়ি করে ছোট একটা ঘাট-বাঁধানো পুকুরকে একেবারে ঢেকে ফেলেছে। বুঝতে পারা যায় না, সাপগুলিই লতার মতো হয়ে গিয়েছে, না লতাগুলি সাপের মতো হয়ে গিয়েছে।

—ওটা কি? দূরে উঁচু ইঁটের ঢিবির মতো একটা জায়গা, তার সারা গায়ে জংলা গাছের সাজ। শুক্তির প্রশ্ন শুনে উত্তর দেয় শুভেন্দু—ওটা একটা রাসমঞ্চ।

রাসমঞ্চের রূপ দেখে চক্ষু স্থির হয়ে যায় শুক্তির। হঠাৎ কতগুলি শালিক কর্কশ স্বরে ডেকে ডেকে উড়তে থাকে, আর রাসমঞ্চের জংলা ঝোপের মধ্যে নড়া-চড়া করে সাদা-কালো একটা জীব।

শুক্তি—ওটা আবার কি?

শুভেন্দু—বাবর্ডাস।

শুক্তি—অ্যাঁ?

শুভেন্দু হাসে—বাঘ নয়।

হেসে হেসেই পথ চলতে থাকে শুক্তি। হঠাৎ চমকে উঠলেও এরকমের ভয়কে একটুও ভয়াল ব'লে মনে হয় না শুক্তির, বরং ভালই তো লাগে।

ছোট জগৎপুরের রূপ আর প্রাণের পরিচয় বর্ণনা করতে থাকে শুভেন্দু। যেন এক আশ্চর্য দেশের মেয়েকে এক অদ্ভুত দেশের পরিচয় শোনাচ্ছে। শুনতে শুনতে কখনো চক্ষুস্থির হয়, কখনো বা হেসে ফেলে শুক্তি।

শুভেন্দু বলে—ঐ মৌজাটার অর্ধেকটাই হলো চাকরান, আর তার বাঁয়ে যে-সব খেত দেখছো, ওর বেশির ভাগ হলো মহাত্রাণ। এদিকের সবই অবশ্য ব্রহ্মোত্তর আর মৌরসী মোকররী। সব চেয়ে ভাল হলো ঐ যে, ঐ মেটে সড়কের দু'পাশে...।

হাত তুলে যেন পৃথিবীর চারিদিকে ছড়ানো মাটি জল ও বাতাসের উপর কতগুলি অদ্ভুত ও বিচিত্র স্বত্বের আর স্বামিত্বের গর্ব বর্ণনা ক'রে শোনাতে থাকে শুভেন্দু। শুনতে মন্দ লাগে না, যদিও একবিন্দু অর্থ বোঝা যায় না, নীরবে শুধু হাসতে থাকে শুক্তি। শুভেন্দু নিজের মনের উৎসাহেই বলতে

থাকে—সবচেয়ে ভাল উসুল আর আদায় হয় ঐ দুটো বাজেয়াপ্তী আর খারিজা মহাল থেকে।

শুক্তি তার ধুলোমাখা পায়ের চেহারার দিকে তাকিয়ে বলে—ধুলোও লাল রঙের হয় নাকি?

শুভেন্দু—হয় বৈকি। বাঘা-এঁটেলের রঙই হলো লালচে, কোন-মতেই রবি ফলানো যায় না। তবে নদীর দিকে দু'হাজার বিঘের ওপর রেলে আর দো-আঁশ আছে। ধান ফলে চমৎকার। এ ছাড়া ভাল মাটি বলতে ছোট জগৎপুরে আর বিশেষ কিছু নেই। উত্তরে ওগুলি সবই হলো সাবেক পতিত, যত সব ঘাসি, কাঁকরে আর…।

হাসি থামাতে গিয়ে থেমে যায় শুক্তি। শাড়ির আঁচলটা শুভেন্দুর চোখের সামনে তুলে ধরেই শিউরে উঠতে থাকে—ইস্, কি বিশ্রী কতগুলো পোকা কাপড়টাকে কি-ভয়ানক কামড়ে ধরেছে দেখ।

শুভেন্দু বলে—পোকা নয়, চিড়চিড়ে ফল।

শুক্তি অপ্রস্তুত হয়ে হাসতে থাকে—বেশ সুন্দর ফল তো, নামটা আরও সুন্দর।

সত্যিই, এত ঝোপঝাপ গাছপালা আর লতাপাতার নামগুলিই বা কি অদ্ভুত। চলতে চলতে শুভেন্দু আরও নাম শোনাতে থাকে। এগুলি হলো হাড়জোড়া লতা, ভাঙা হাড় জুড়ে দেয়। ওটা হলো একটা মাকড়া গাছ। ঐ দেখ কাঁঠালের গাছটাকে কি ভয়ানক বাঁদরায় ছেয়ে ফেলেছে। আর ঐ যে একটা কাকড়লের জঙ্গল দেখছো, তার ওপাশেই হলো দীঘি। এগুলিকে বলে হাতিশুঁড়ো, ওগুলি শেয়াল-কাঁটা। একটা কুকসীমের ঝাড় আর দুটো কেওটেঙ্গার ঝোপের পাশ দিয়ে আঁচল বাঁচিয়ে সাবধানে হাঁটতে হাঁটতে হেসে ফেলে শুক্তি—থাক্, এত সুন্দর সুন্দর নামগুলি আর শুনিও না, মনে রাখতে পারব না।

শুভেন্দু বলে—ঐ যে জগৎলক্ষ্মীর মন্দির।

ভাঙ্গাচোরা আর বট অশত্থের শিকড়ে জড়ানো একটা জীর্ণকায় পঞ্চরত্ন মন্দির। চারদিকের বনবাদাড়ে এখনো যেন অন্ধকার লুকিয়ে রয়েছে। মশার এক একটা ঝাঁক উড়ে যায় শব্দ ক'রে। কি অদ্ভুত শব্দ! দিনের আলোকে চামচিকে ওড়ে অন্ধের মতো দিগ্বিদিক বোধ হারিয়ে। শুক্তি হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকে, এই কি জগৎলক্ষ্মী মন্দিরের চেহারা?

মন্দিরের দরজা খুলে দিল পৈতে গলায় যে লোকটা, তার দিকেও হতভম্বের মতো তাকিয়ে থাকে শুক্তি। লোকটা যেন এই কাঁটা লতার ঝোপে পালিত একটা পাখির মতোই দেখতে। রোগা এইটুকু জীর্ণশীর্ণ দেহ নিয়ে জগৎলক্ষ্মীর পূজারী দরজা খুলে দাঁড়িয়ে থাকে, বুকের পাঁজরগুলি হাঁপায়।

মন্দিরের ভিতরে কোন মূর্তি নেই। শুধু পাথরের উপর একটি ধুনুচি রয়েছে, তার মধ্যে ধুনো পুড়ছে অল্প অল্প ধোঁয়া ছড়িয়ে। পুজোর ডালা থেকে ফুল আর সিঁদুরের কৌটা তুলে ধুনুচির সামনে রাখে শুক্তি। পূজারী লোকটা ধুনুচির গায়ে সিঁদুরের কৌটাটা একবার ছুঁইয়ে আবার ডালার ভিতর রেখে দেয়। তার পরেই ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে থাকে। পকেট থেকে একটা টাকা বের করে শুক্তির হাতে তুলে দেয় শুভেন্দু। টাকাটা ধুনুচির কাছে রেখে একটা প্রণাম করে শুক্তি। পূজারী অস্ফুটস্বরে আর হাত তুলে আশীর্বাদের ভঙ্গীতে কি যেন বলতে থাকে।

জগৎলক্ষ্মীর কাছ থেকে সরে এসে বাইরে দাঁড়িয়েই হাঁফ ছাড়ে শুক্তি।

—এ কি রকমের জগৎলক্ষ্মী, বুঝলাম না কিছু।

শুভেন্দু বলে—ঐ দীঘিটার ওপারে আরও মাইল দু-এক উত্তরে যে গ্রামটা রয়েছে, তার নাম হলো বড় জগৎপুর। সে গ্রামের কিছু আর এখন নেই। পুষ্করা লেগে সব শেষ হয়ে গিয়েছে।

শুক্তির স্থিরচক্ষুর কৌতূহল লক্ষ্য ক'রে শুভেন্দু কাহিনীটাকে আরও তাড়াতাড়ি সারতে থাকে।—এ সব অনেক দিনের আগের কথা। ছোট জগৎপুরেও পুষ্করা লাগতে চলেছিল। মড়ক আর মরণ আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছিল বড় জগৎপুরের দিক থেকে এই দিকে। এই মন্দিরে কোন বিগ্রহ ছিল না, তবু এখানেই এসে ছোট জগৎপুরের সব মানুষ দিনরাত পুজো দিত আর প্রার্থনা করত, পুষ্করার কোপ থেকে বাঁচবার জন্য।

পাশেই ঝোপের ভিতর কিরকম একটা ঝনঝনে শব্দ বেজে ওঠে। শুক্তি চমকে ওঠে—কিসের শব্দ?

শুভেন্দু বলে—বোধহয় শজারু। যাক, একদিন মাঝ রাতে, সেদিন পূর্ণিমা, দেখা গেল লালপেড়ে শাড়ি প'রে এক মেয়ে হাতে একটা ধুনুচি নিয়ে ছোট জগৎপুরের চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ধুনুচি থেকে ধোঁয়া উড়ছে ধুনোর গন্ধে ভরে উঠল গ্রাম। তারপরের দিনেই দেখা গেল, এই মন্দিরের ভিতরে একটি ধুনুচি রয়েছে এবং তার মধ্যে ধুনো পুড়ছে।

শুক্তি—তার মানে কি হলো?

শুভেন্দু—তার মানে এই যে, স্বয়ং লক্ষ্মী নিজে এসে ধুনোর ধোঁয়া ছড়িয়ে ছোট জগৎপুরকে পুরুতার কোপ থেকে বাঁচিয়ে দিলেন।

শুক্তি—এ তুমি বিশ্বাস কর?

শুভেন্দু হাসে—বিশ্বাস করতে তো ভালই লাগে।

শুক্তি—সত্যি হলে তো ভালই ছিল।

শুভেন্দু—তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না?

শুক্তি—না।

শুভেন্দু—যাক্, কিন্তু মনে রেখ, তোমার একটা পরীক্ষা আরম্ভ হলো।

শুক্তি—কি?

শুভেন্দু—এইবার ছোট জগৎপুরের সমস্ত মানুষ জানতে পারবে, নতুন বউরাণী কত বড় লক্ষ্মী?

শুক্তি—তার মানে?

শুভেন্দু—ক'দিনের মধ্যেই এমন কোন ঘটনা ঘটা চাই, যাতে বোঝা যাবে যে তুমি একটি খাঁটি লক্ষ্মী।

চমকে ওঠে শুক্তি।—আমি কি ক'রে ঘটনা ঘটাবো?

শুভেন্দু—তোমার পূজোর ফলেই ঘটনা ঘটবে। যদি ছোট জগৎপুরের মানুষ আর রাজবাড়ির জীবনে কোন নতুন সৌভাগ্য দেখা দেয়, তবে বুঝতে হবে যে তুমি সত্যিই লক্ষ্মী।

শুক্তির কণ্ঠস্বরে হঠাৎ বিরক্তির ভাব ফুটে ওঠে—এ রকম কোন সর্ত আমি করেছিলাম নাকি?

শুভেন্দু হাসে—তুমি সর্ত করবে কেন? এটা হলো এই ছোট জগৎপুরের সর্ত। চিরকাল এখানে এই সর্তেই রাজবাড়ির নতুন বউরাণীরা পরীক্ষা দিয়েছে।

শুক্তি—সবাই পাশও করেছে নিশ্চয়?

শুভেন্দু—হ্যাঁ, সে ইতিহাস মা'র কাছেই শুনতে পাবে।

কোন উত্তর দেয় না শুক্তি। ছোট জগৎপুরের এই সব কাঁটাভরা ঝোপ, সাপের মতো হিংস্র লতা, পোকার মতো ফল, জন্তুর মতো গাছপালা, বিদঘুটে শব্দ আর নানা রকমের অন্ধকারের মধ্যে কোনই ভয় ছিল না। হঠাৎ কোথা থেকে এই অদ্ভুত গা ছমছম-করা কাহিনীটা এসেই যেন এই প্রথম ভয় পাইয়ে দিল শুক্তিকে।

গম্ভীর মুখে চলতে চলতে হঠাৎ থেমে দাঁড়ায় শুক্তি। এক মুহূর্ত কি যেন ভাবে। তারপরেই হেসে ওঠে—আমার একটু দরকার আছে। আর একবার মন্দিরে চল।

একটু বিস্মিত না হয়ে পারে না শুভেন্দু।—এখনই।

শুক্তি—হ্যাঁ।

চামচিকার দল আবার কিচকিচ শব্দ ক'রে উড়তে থাকে। ধুনোর গন্ধে ভরা মন্দিরের ভিতরে ঢুকে ধুনুচির কাছে মাথা উপুড় ক'রে অনেকক্ষণ পড়ে থাকে শুক্তি। শুক্তির কাণ্ড দেখে হতভম্বের মতোই দাঁড়িয়ে থাকে শুভেন্দু। যেন এক অজ পাড়াগাঁয়ের অসহায় ও দুর্বল একটা মেয়ের বিপন্ন আত্মার কাতর আবেদনের মতো পড়ে রয়েছে শুক্তি। কে জানে, কি প্রার্থনা করছে শুক্তি, দু' ঠোঁটের কাঁপুনিতে অতি ক্ষীণ স্বরে ফিসফিস করছে যে ভাষা, তার একটা কথাও শুনতে পায় না শুভেন্দু।

উঠে এসে শুভেন্দুর কাছে দাঁড়ায় শুক্তি—চল এবার।

আরও বিস্মিত হয়ে বেদনার্ত চোখে তাকিয়ে থাকে শুভেন্দু। ভেজা ভেজা মনে হচ্ছে শুক্তির চোখ।

শুভেন্দু বলে—গল্পটা ব'লে তোমাকে কষ্ট দিলাম মনে হচ্ছে।

শুক্তি হাসে—একটুও না।

একটা সাড়াই পড়ে গেল ছোট জগৎপুরে। বউরাণী লক্ষ্মী, বউরাণী পয়া!

দু' পশলা জোর বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। জগৎপুরের শক্ত এঁটেল মাটির খেত ভিজে নরম হয়ে গিয়েছে। এবার লাঙ্গল আর গোপাট আরম্ভ ক'রে দিলেই হলো, আর কোন অসুবিধা নেই।

সদর থেকে খবর নিয়ে এসেছে উকীলের মুহুরী, তিন বছর ধ'রে চলছিল যে মামলাটা, তার রায় বের হয়েছে এতদিনে। সাত হাজার টাকার ডিক্রি পেয়েছে শুভেন্দু।

শাশুড়ী ডাক দিয়ে বললেন—বউমা, আজ হলো চতুর্দশী। আজই একবার গিয়ে হর্ষমতীর জল ছুঁয়ে এস। ও শুভেন্দু, শুনেছিস?

শুভেন্দু বলে—হ্যাঁ শুনেছি, আজই যাব।

শুক্তি হাসি বন্ধ করে। হঠাৎ আবার গম্ভীর হয়—হর্ষমতীর জল মানে?

শুভেন্দু—ঐ সেই দীঘিটা। ওর নাম হলো হর্ষমতীর সায়র।

শুক্তি—ওর জল ছুঁলে কি হয়?

হাসতে থাকে শুভেন্দু। শুক্তি তেমনি গম্ভীরভাবে বলে—আর একটা গল্প আছে বোধ হয়।

শুভেন্দু—হ্যাঁ।

শুক্তি—আর একটা পরীক্ষা দিতে হবে নিশ্চয়?

শুভেন্দু—নিশ্চয়।

শুক্তি—আর পারি না। অপ্রস্তুতভাবেই আক্ষেপ ক'রে অন্যদিকে মুখ লুকিয়ে বসে থাকে শুক্তি। এইভাবেই কি অনন্তকাল এখানে শুধু পরীক্ষা দিতে হবে? ছোট জগৎপুর নামে এই বাড়িছাড়া বাড়িটা তো দেখতে বড় নিরীহ। মাসমাত্র একেবারে বউরানী ব'লে আদর ক'রে আর মাথায় তুলে রাখতে চায়। কিন্তু এত অভ্যর্থনার ভিতরে আবার এইসব পরীক্ষা করার ষড়যন্ত্র কেন?

শুভেন্দু সান্ত্বনার সুরে বলে—কি হয়েছে, কতটুকুই বা হাঁটতে হবে? বরং একবার পাড়ে এলে ভালই লাগবে তোমার?

শুক্তি—হাঁটতে ভয় পাই না। বেড়ানোও অভ্যেস আছে।

শুভেন্দু—তবে কিসের ভয়?

শুক্তি প্রফুল্লিত বলে—ভয়? ভয় কেন করব? কি পাপ করেছি যে একটা দীঘির জল ছুঁতে ভয় করব?

খুশি হয়ে শুক্তির হাত চেপে ধ'রে শুভেন্দু বলে—চলো, পথে অনেক নতুন জিনিস দেখাব তোমাকে।

দ্বিধা ক'রে বা দেরি ক'রে কোনও লাভ নেই। পরীক্ষাটার সম্মুখীন হবার জন্যই প্রস্তুত হয়ে শুক্তি বলে—চলো।

মস্ত বড় একটা ডাঙ্গার উপর দিয়ে চলতে চলতে শুক্তির মনের ভয় আস্তে আস্তে মিটে যেতে থাকে। ডাঙ্গার মাটি শক্ত, কিন্তু নরম ঘাসে ঢাকা। কাঁটার ঝোপঝাপ সরিয়ে ছোট জগৎপুরের মনটা যেন এখানে বেশ খোলামেলা হয়ে উঠেছে। মস্ত বড় একটা গাছের মৃতদেহ পাথরের মতো শক্ত ও মসৃণ হয়ে পড়ে রয়েছে ডাঙ্গার এক জায়গায়। শ্রান্ত হয়ে গাছের উপর বসে শুভেন্দু ও শুক্তি।

প্রশ্ন করে শুভেন্দু।—এটা কি বলতে পার?

—গাছ বলেই তো মনে হচ্ছে।

—গাছ কি এ রকম পাথরের মতো হয় ?

—তবে কি এটা ?

—এটা হলো বকরাক্ষসের লাঠি। সেই যে ভীমের হাতে মার খেয়ে মরে গেল বক, সেই দিন থেকে তার লাঠিটা পড়ে আছে এখানে।

হেসে ওঠে শুক্তি। শুনতে ভালই লাগে। এ রকম হাজার গল্প হাজার মনের ভিতর পুষে রাখুক না ছোট জগৎপুর। কিন্তু ..। কিন্তু হর্ষমতীর গল্পটাও কি এই রকমের ?

হর্ষমতীর সায়রের কাছে পৌঁছবার পর গল্পটা শুরু করে শুভেন্দু। দাম আর টোপা পানায় ভরা প্রকাণ্ড সায়র। ভাঙা ভাঙা এক একটা ঘাটের শ্যাওলা মাখা ইঁট ছড়িয়ে আছে এলোমেলো ভাবে। তলগাছের উপর এই ভরা দুপুরেই অলস হাড়গিলা নিঃস্পন্দ হয়ে ঘুমোয়। যেমন নির্জন জায়গাটা, তেমনি একটা নিস্তব্ধতা যেন থমকে রয়েছে।

শুভেন্দু বলে। -সে অনেক দিন আগের কথা। এই যে কলাইয়ের খেত দেখছো, এখানেই ছিল এক রাজার বাড়ি। রাজার বড় দুঃখ ছিল, কারণ রানী হর্ষমতী ছিলেন বন্ধ্যা।

শুক্তি হাসে—থাক, আর শুনতে চাই না। এ গল্প না শুনলেও চলবে।

শুভেন্দু—কিন্তু সায়রের জল ছুঁয়ে এই চতুর্দশীতে একবার মাথায় হাত না দিলে তো চলবে না।

শুক্তি—কেন ?

শুভেন্দু— এখানকার নিয়ম।

শুক্তি হাসে —অদ্ভুত নিয়ম, বেহায়া নিয়ম। তুমি ওদিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াও।

ঘাটের দিকে এগিয়ে যায় শুক্তি। শুভেন্দু বলে—গল্পটা আগে শুনে নাও। · একদিন স্বপ্নে শুনতে পেলেন হর্ষমতী..... ।

থেমে মুখ ফিরিয়ে প্রশ্ন করে শুক্তি—কি শুনতে পেলেন ?

—চোখ বুঁজে শুধু স্বামীর মুখ মনে করতে করতে এক চতুর্দশীর দুপুরে এই সায়রের জলে বার বার তিনবার ডুব দিয়ে পদ্মের শিকড় স্পর্শ করবি। তা'হলেই তোর কোল আলো করা ..।

শুক্তি মুখ কালো ক'রে তাকায়—এটাও দেখছি একটা পরীক্ষা। বার বার তিনবার স্বামীর মুখ স্মরণ করে জল ছুঁতে হবে। এই তো ?

শুভেন্দু—হ্যাঁ।

শুক্তি—যেন অন্য কোন মুখ ভুলেও মনে না আসে, এই তো?

শুভেন্দু হাসে—হ্যাঁ।

শুক্তি মুখ ভার ক'রে বলে—চলো বাড়ি যাই

শুভেন্দু বিষণ্ণভাবে বলে—সামান্য একটা গল্পের উপর এত রাগ করছ কেন তুমি?

চুপ করে ভাঙ্গা ঘাটের হিংস্র দাঁতের মতো শ্যাওলা মাখা ইঁটগুলির দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে শুক্তি।

শুভেন্দুও আনমনার মতো দূরের দিকে তাকিয়ে থাকে। চুপ ক'রে যেন শুক্তির এই আপত্তির আঘাতটাকে সহ্য করবার চেষ্টা করছে শুভেন্দু। কিসের জন্য, কেন এ রকম করছে শুক্তি? কি বলতে চায় শুক্তি?

শুক্তি ডাকে—শুনছ।

শুভেন্দু—কি?

শুক্তি—আমার কেমন ভয় ভয় করছে।

শুভেন্দু—কেন, কিসের এত ভয়?

এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে হঠাৎ শুভেন্দুর হাত ধ'রে সাগ্রহে অনুনয়ের সুরে শুক্তি বলে—কিছু মনে করো না। তুমি এস, আমার মাথা ছুঁয়ে আমার কাছে দাঁড়াও, তবে আমি তিনবার জল স্পর্শ করতে পারব।

শুভেন্দুর মুখের বিষণ্ণতা কেটে যায়।—তাই বলো, এ তো রাণী হর্ষমতীর চেয়েও এক ডিগ্রী বেশি হয়ে গেল।·· চলো।

লক্ষ্য করে শুভেন্দু, সায়রের জল তিনবার মাথায় ছোঁয়ানো হয়ে যাবার পরেও আর একবার জল তুলে নিয়ে চোখ দু'টোকেও ধুয়ে ফেলে শুক্তি।

ফেরবার পথে শুভেন্দু আর একবার জিজ্ঞাসা করে—এ সব গেঁয়ো নিয়ম-টিয়ম পালন করতে তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে, শুক্তি?

শুক্তি বলে—না, তুমি যতক্ষণ সঙ্গে আছ, কোন কষ্টই হবে না।

ছোট জগৎপুরকে ভাল লাগে, ভাল লাগে ছোট জগৎপুরের এই মানুষটিকে, কিন্তু ভয় করে ছোট-জগৎপুরের এই কাহিনীগুলিকে। কি ভয়ানক এক একটা কাহিনী, যেন বুক চিরে পরীক্ষা ক'রে দেখতে চায়, ভিতরে কিছু লুকানো আছে কি না।

কিন্তু শুক্তির ক্ষুব্ধ মনের যত অভিযোগ আর আশঙ্কা শান্ত ক'রে দিয়ে, আর শুক্তির জীবনে একটা নতুন ঘটনার সূচনা সরবে ঘোষণা ক'রে দিয়ে শাশুড়ির কণ্ঠস্বরের হর্ষ একদিন ধ্বনিত হয়, কারণ কৃপা করেছে হর্ষমতীর সায়র। —বউমা, এবার একদিন নাগেশ্বর তলায় গিয়ে ভয়নাশন ক'রে এস।.. ওরে শুভেন্দু, শুনেছিস্।

ছোট জগৎপুরের গো-চর মাঠের পশ্চিমে মস্ত বড় একটা বৃদ্ধ অশথ, তার গোড়ার দিকে একটা ফোকর। ফোকরের ভিতরে আছেন এক অতিবৃদ্ধ নাগ। সে নাগকে কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ চোখে দেখে নি, তবুও তিনি আছেন, দ্বিতীয় এক অনন্ত নাগের মতো চিরকাল এখানে আছেন। ছোট জগৎপুরের একশো বছর আগের বউরাণীও প্রথম সন্তানের সম্ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে এই নাগেশ্বর তলায় এসে ভয়নাশন ক'রে গিয়েছেন। এ অবস্থায় মনে কোন ভয় রাখতে নেই। ভয় থাকলে সন্তান ভীরু হয়।

শুক্তি একটু উৎসাহিত হ'য়েই প্রশ্ন করে—ভয়নাশনটা আবার কি?

শুভেন্দু—ভয়নাশন মানে। যে ভয়কে সবচেয়ে বেশি ভয় হয়, সেই ভয়ের কথা জানিয়ে দিতে হয় নাগেশ্বরকে। তা'হলে জীবনে আর সে ভয় থাকবে না।

শুক্তি বলে—চলো।

চলতে দেরি হয় নি, পৌঁছতেও দেরি হয় নি। নাগেশ্বর তলায় এসে বুড়ো অশথের গোড়ায় মাটির ভাঁড়ে দুধ রেখে দিয়ে প্রণাম করে শুক্তি।

অশথতলার ধূলো মাথায় কপালে, শুক্তি যেন কৃতার্থভাবে উঠে দাঁড়ায়। জিজ্ঞাসা করে—নাগেশ্বর দয়া করলেন কিনা কি ক'রে বুঝব?

শুভেন্দু—সূর্য ডুববার আগেই ফিরে এসে যদি দেখতে পাও যে, ভাঁড়ের সব দুধ খেয়ে চলে গিয়েছেন নাগেশ্বর, তবেই বুঝবে যে ...

শুক্তি—সূর্য তো ডুবতে চলল।

শুভেন্দু—তা'হলে চলো, একটু ঘুরে ফিরে তারপর এসে দেখবে।

ঘুরে ফিরে বিকেলের বেলাটা পার করে দিয়ে প্রথম সন্ধ্যার ছায়ান্ধকারে বড়ো অশথের কাছে ফিরে আসে শুভেন্দু আর শুক্তি। শুভেন্দু বলে—ঐ দেখ!

আনন্দে শুভেন্দুর হাত ধ'রে হাসতে থাকে শুক্তি। প্রার্থনা গ্রহণ করেছেন নাগেশ্বর। ভাঁড়ে এক ফোঁটা দুধ নেই, কখন এসে নিঃশেষে সব দুধ পান ক'রে অশথের গহ্বরে আবার অদৃশ্য হয়ে গিয়েছেন।

ফেরবার পথে শুভেন্দু জিজ্ঞাসা করে—কোন্ ভয়ের কথা নাগেশ্বরকে জানালে ?

শুক্তি হাসে—তা বলব কেন ?

শুভেন্দু—আমিও একদিন নাগেশ্বরের কাছে এসে ভয়নাশন ক'রে নিয়েছি।

শুক্তি হেসে লুটিয়ে পড়তে চায়—তোমার আবার ভয়নাশন কিসের ? তোমারও কি…।

শুভেন্দু—হ্যাঁ, পুরুষেরাও এসে এখানে ভয়নাশন করে। ছোট জগৎপুরের নিয়ম আছে, বিয়ে করতে যাবার আগে নাগেশ্বরের কাছে মনের ভয়ের কথা ব'লে ভয় দূর করে নিতে হয়।

শুক্তি—তুমি কোন ভয়ের কথা বলেছিলে ?

শুভেন্দু—তা বলব কেন ?

শুক্তি—বলো না, আমি শুনলে দোষ কি ?

শুভেন্দু—[illegible] মানুষের মনের একটা [illegible] ভাবনা হয়, সে বললে শুনে তোমার বা লাভ কি ?

সন্ধ্যার আলোকে শুক্তি দেখতে পায়, শুভেন্দুর চোখ দুটো কেমন [illegible] একটা দৃষ্টি নিয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

শুক্তি বলে—নাগেশ্বর তোমার প্রার্থনা গ্রহণ করেছিলেন তো ?

শুভেন্দু—ভাবের দুধ তো সব চেটেপুটে খেয়ে চলে গিয়েছিলেন।

শুক্তি—তবে আর ভাবনা কিসের ?

শুভেন্দু—তবু ভাবনা হয়। সন্দেহ হয় নাগেশ্বর আমাকে ঠকালেন না তো ?

শুভেন্দুর চোখে সেই অদ্ভুত ভঙ্গী, ভাবনাটুকু [illegible]। শুক্তি বলে—তোমার সন্দেহের কোন অর্থ হয় না। নাগেশ্বর কাউকে ঠকান না।

শুক্তির সান্ত্বনার ভাষা ও ভঙ্গী দেখে হেসে ফেলে শুভেন্দু—তুমি যখন বলছ, তখন বিশ্বাস করছি নাগেশ্বর আমাকে ঠকাননি।

পথ চলার ছন্দে যেন দু'জনেই আবার খুশি হয়। [illegible] একটু দূরে চাষীদের আঙিনায় ঘরে-ফেরা গরুর ডাক [illegible] শোনা যায়। একটা মাটির দীপ জ্বলছে একেবারে নিরিবিলি নির্জন মতো একটা জায়গা, জংলা লতাপাতায় ঢাকা।

শুক্তি প্রশ্ন করে—এখানে আবার প্রদীপ জ্বলে কেন ?

শুভেন্দু—এই মাসটা প্রতি সন্ধ্যাতেই এখানে প্রদীপ জ্বলবে।

শুক্তি—কেন?

শুভেন্দু—এটা হলো রুপো ঠাকরুনের ভিটা।

শুক্তি—এটাও গল্প বোধ হয়?

শুভেন্দু—হ্যাঁ। রুপো ঠাকরুন ছিলেন একজন সতীসাধ্বী……।

পায়ে যেন হঠাৎ কি একটা ফুটেছে। বেদনার্তের মতো মুখ ক'রে অন্য দিকে তাকিয়ে শুক্তি বলে—চলো, রাত হয়ে আসছে।

চলতে থাকে শুভেন্দু, কিন্তু রুপো ঠাকরুনের গল্পটা না বলে থাকতে পারে না।—রুপো ঠাকরুন ছিলেন এক গরীব বামুনের বউ। দেখতে পরমা সুন্দরী। এত গরীব যে দু'কড়ি খরচ ক'রে সধবার সাধ একটু আলতা কেনবারও উপায় ছিল না রুপো ঠাকরুনের। এক দিন কোথা থেকে অচেনা-অজানা একটি মেয়ে এসে বলল, দুঃখ করো না রুপো ঠাকরুন, তুমি জল দিয়েই আলতা পরো। যদি সতী হয়ে থাক, তবে তোমার পায়ে লেগে জলই আলতা হয়ে যাবে।

শুক্তি—তাই হলো নিশ্চয়।

শুভেন্দু—হ্যাঁ, যতদিন বেঁচে ছিলেন রুপো ঠাকরুন, ততদিন জলের আলতাই পরতেন। জলের দাগ আলতার চেয়েও বেশি রাঙা হয়ে ফুটে উঠত রুপো ঠাকরুনের পায়ে।

শুক্তি বলে—বাঃ, চমৎকার গল্প।

শাশুড়ি ডাক দিলেন—ও বৌমা, প্রজাবাড়ির মেয়েরা এসেছে তোমার কাছে। শুনে নাও, কি বলছে ওরা?

আশ্বিন মাস, ছোট জগৎপুর এই মাসে একটা ব্রত করে, তার নাম সতীসোহাগ। এ বছর নতুন বউরাণীর পায়ে আলতা পরিয়ে সতীসোহাগ করবে প্রজাবাড়ির মেয়েরা, সেই কথা জানাতে এসেছে টগর কালী খাঁদি পটল সীতা ফুলকুঁড়ি ধবধবী বুড়ি আর চন্দনা। ছেঁড়া ময়লা কাপড়-পরা অস্থিসার কতগুলি রোগা-রোগা মেয়ে। আজ ওরা সিধে নিয়ে যাবে, কাল এসে আলতা পরিয়ে সতীসোহাগ ক'রে যাবে।

প্রজাবাড়ির মেয়েদের প্রস্তাবটা চুপ করে দাঁড়িয়ে শুনল শুক্তি। আড়ালে দাঁড়িয়ে মুখ টিপে হাসল শুভেন্দু। আধ সের ক'রে চিঁড়ে সিধে নিয়ে চলে গেল প্রজাবাড়ির মেয়ের দল।

সন্ধ্যা হতেই শুভেন্দুর সঙ্গে একটা ঝগড়ার মতোই ব্যাপার ক'রে ফেলল শুক্তি।—তোমাদের এই রাজ্যিছাড়া গ্রামটা কি শুধু কতকগুলি গল্প দিয়ে তৈরী?

শুভেন্দু বলে—তাই তো দেখছি।

শুক্তি—পৃথিবীর কোথাও এমন সৃষ্টিছাড়া ব্রত আছে বলে তো শুনি নি।

শুভেন্দু—তা'ও সত্যি।

শুক্তি—সতীসোহাগ ব্রতটার অর্থ কি?

শুভেন্দু—ঐ রুপো ঠাকরুনের ভিটার মাটি আলতার সঙ্গে গুলে পায়ে পরিয়ে দেবে।

শুক্তি—তাতে কি হয়?

শুভেন্দু—অনেক কিছু ভাল হয়। আবার উল্টোটাও নয়। সে যদি গল্প শুনতে চাও তো বলি।

জানালার কাছে এসে দাঁড়িয়ে অনেক দূরের একটা অন্ধকারের দিকে তাকায় শুভেন্দু—ঐ বড় জগৎপুরের ডাঙ্গাটা যেখানে আরম্ভ হয়েছে, তারই পুবে আছে চোখটেরির খাল। এক চোখটেরি একবার গাঁয়ের একশো মেয়েকে মেঠাই মণ্ডা খাইয়ে খুব ঘটা ক'রে সতীসোহাগ করিয়েছিল। চোখটেরির পায়ে টুকটুকে লাল আলতা পরানো মাত্রই আলতা জল হয়ে গেল। লোকে বললে, এ কি ব্যাপার? একটু পরেই খবর এল, চোখটেরির স্বামী সাপের কামড়ে মরে গিয়েছে। ধরা পড়ে গেল চোখটেরির জীবনের লুকানো দোষ। আর সেই লজ্জা সহ্য করতে না পেরে শেষে ঐ খালের জলে ডুবে মরে গেল চোখটেরি।

শুক্তি—গল্পটা মোটেই ভাল নয়। চোখটেরির পাপে চোখটেরি মরল, ভালই হলো। কিন্তু চোখটেরির স্বামী বেচারা মরবে কেন?

শুভেন্দু হাসে—মরে তো গেল। কি আর করা যাবে?

কিছুক্ষণ পরে রাতটাও যেন কেমন-কেমন হয়ে গেল। কিছুতেই ঘুম আসে না শুক্তির। শুভেন্দুকেও ঘুমোতে দেয় না শুক্তি। ছোট জগৎপুরের আজকের রাত্রিটাকে বড় ভয় করছে শুক্তির। এই রাতটা তো আর কিছুক্ষণ পরে ফুরিয়েই যাবে, তার পরেই সতীসোহাগের আলতা নিয়ে দেখা দেবে কি-ভয়ানক একটা সকালবেলা। শুক্তির সমস্ত আত্মাটাই যেন কিসের একটা ভয়ে ধুক ধুক করছে।

শুভেন্দু বলে—আর কত গল্প শুনবে? এবার ঘুমিয়ে পড়।

শুক্তি—কি ক'রে ঘুম হবে? একটা গল্পেরও কি মাথামুণ্ডু কিছু আছে। যত সব ভয়-দেখানো বিদঘুটে গল্প।

বাস্তবিক, ছোট জগৎপুরের প্রত্যেকটা ছায়া আর শব্দেরও যেন ইতিহাস আছে। যত সব অনুতাপের প্রায়শ্চিত্তের শাস্তির আর প্রতিশোধের ইতিহাস।

হুম হুম শব্দ ক'রে একটা পেঁচা ডাকছিল এতক্ষণ। কিন্তু ওটা ঠিক পেঁচার ডাক নয়। শুভেন্দু বলে—অনেকদিন আগে এক ঘুমন্ত গেরস্থকে হত্যা করেছিল এক ডাকাত, তার নাম বেন্দা। সেই গেরস্থের বউয়ের অভিশাপে চিরকালের মতো পেঁচা হয়ে গিয়েছে বেন্দা ডাকাত। ঘুম নেই বেন্দার চোখে। আশ্বিনের ঠিক এই দিনটিতেই একবার ছোট জগৎপুরের অন্ধকারে উড়ে উড়ে চোখের জ্বালায় ডাকতে থাকে বেন্দা—ঘুমো ঘুমো। চাষী ছেলেরা জেগে উঠে একটা আমগাছের গায়ে জল ছিটিয়ে দেয়, তার পরেই আর পেঁচার ডাক শোনা যায় না।

এখানেই বসে দেখা যায়, শ্মশানের মাঠের দিকে একটা আলেয়া এগিয়ে চলেছে। কিন্তু ওটা তো ঠিক আলেয়া নয়। শুভেন্দু বলে ওটা হলো চিন্তেমণির জ্বালা। বোকা স্বামীর উপর রাগ ক'রে চিন্তেমণি একদিন বাপের বাড়ি চলে গিয়েছিল। যেদিন ফিরল, সেদিন স্বামীর চিতা জ্বলছে শ্মশানে। সেই যে চিন্তেমণি ঘর ছেড়ে চলে গেল, আর তাকে কোথাও দেখা গেল না। শুধু মাঝে মাঝে অনেক রাতে দেখা যায়, আলেয়া হয়ে শ্মশানের মাঠে স্বামীকে খুঁজে বেড়াচ্ছে চিন্তেমণি।

অন্ধকার ছাপিয়ে কান্না মেশানো দীর্ঘশ্বাসের মতো একটা ঝড়ের শব্দ অনেকদূর থেকে ভেসে এসে আবার মিলিয়ে যায়, কিন্তু ঝড় নয় ওটা। শুভেন্দু বলে—ওটা হলো ভোলা বেদের দীর্ঘশ্বাস। যখ হয়ে মাটির নিচে গুপ্তধন আঁকড়ে পড়ে আছে ভোলা। এক দেবমন্দির থেকে বিগ্রহের গায়ের সোনা চুরি ক'রে ভোলা বেদে কুয়োর নিচে নেমেছিল লুকিয়ে রাখার জন্য, হঠাৎ কুয়ো ধসে সেই যে মাটি চাপা পড়ল তো পড়লই।

শুক্তি বলে—রক্ষে করো। আর গল্প শুনতে চাই না।

শুক্তির মুখের দিকে তাকিয়ে বিচলিত হয় শুভেন্দু—এ কি, তুমি এতক্ষণ ধ'রে মুখ আড়াল ক'রে শুধু কাঁদছ?

শুক্তি—বড় ভয় করছে আজ।

শুক্তির মাথায় আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে শুভেন্দু সমবেদনার সুরে বলে—ছিঃ, এত ভয় করতে হয় ?

শান্ত হয় শুক্তি।

—কই গো বউরানী ? বউরানী কই ?

আঙিনার উপর এক পাল মেয়ের উল্লাস সকালবেলাটাকে চমকে দিয়ে বেজে উঠল। রুপো ঠাকরুনের ভিটার মাটি নিয়ে সতীসোহাগ করতে এসেছে চন্দনা খাঁদি সীতা কালী পটলী ধবধবী ফুলকুঁড়ি টগর আর বুড়ি।

ও ঘর থেকে সন্ত্রস্তের মতো ছুটে এসে এঘরে শুভেন্দুর কাছে দাঁড়ায় শুক্তি। —ওদের চলে যেতে বলো লক্ষীটি, পায়ে পড়ি তোমার।

শুভেন্দু—ছিঃ, সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে এরকম করছ কেন ? মা শুনলে বড় রাগ করবেন।

অসহায়ের মতো তাকিয়ে থাকে শুক্তি। চোখের দৃষ্টি একটা আতঙ্কে অস্থির হয়ে কাঁপছে। যেন কোন কথাই শুনতে পাচ্ছে না শুক্তি।

চুপ ক'রে অনেকক্ষণ শুক্তির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে শুভেন্দু। তারপর শুক্তির একটা হাত ধ'রে আস্তে আস্তে শুক্তিকে কাছে টেনে নিয়ে একেবারে চোখের উপর চোখ তুলে গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করে—কেন এত ভয় ?

শুক্তির সব চঞ্চলতা যেন স্তব্ধ হয়ে যায়। ধীর স্থির ও শান্ত। গলার স্বর একটুও বিচলিত না ক'রে শুক্তি আস্তে আস্তে বলে—তুমি তো সবই বুঝতে পার।

—ঠিক বুঝতে পারি না। কিন্তু…।

– কিন্তু নয়, সত্যি।

—করে ?

—চার বছর আগে।

শুক্তির হাত ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়ায় শুভেন্দু। ঘরের ভিতর পায়চারি ক'রে বেড়াতে থাকে।

হঠাৎ একেবারে থামে শুভেন্দু, শুক্তির মুখের দিকে একটা কঠিন ও উদাস দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে ব'লে ওঠে—নাগেশ্বরের কাছে আমি এই ভয়ের কথাই বলেছিলাম শুক্তি।

এক একটা মুহূর্ত যেন ভয়ংকর নিস্তব্ধতার মধ্যে মরে চলেছে। শুক্তি দাঁড়িয়ে থাকে, তেমনি ধীর স্থির ও শান্ত। এই রাজ্যিছাড়া ছোট জগৎপুরের সব কাহিনীর ভ্রূকুটি-ভরা চোখগুলিকে আজ বুক চিরে দেখিয়ে দিতে পেরেছে শুক্তি। আর অস্থির হয়ে উঠবার, মুখ লুকোবার, আর চোখ ফিরিয়ে নেবার তো দরকার নেই।

শুভেন্দু বলে—যাও, ওরা ডাকছে, দাঁড়িয়ে আছে অনেকক্ষণ।

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে শুক্তি। শুভেন্দু আবার অনুরোধ করে—মাত্র একটা অভিনয় তো। যাও, সেরে দিয়েই চলে এসো, দেরি ক'রে লাভ কি?

ভাঙা ভাঙা নিঃশ্বাসের শব্দের মতো স্বরে শুক্তি বলে—পারব না।

শুভেন্দু—কেন?

শুক্তি—রূপো ঠাকরুনের ভিটার মাটি আমি সহ্য করতে পারব না।

শুভেন্দু—হৃষমতার জল সহ্য করতে পারলে, জগৎলক্ষ্মীর সিঁদুর সহ্য করতে পারলে, এটা আর সহ্য করতে পারবে না কেন?

শুক্তি না আর পারব না।

দু'হাতে চোখ ঢাকা দিয়ে ঘরের মেজের উপরেই বসে পড়ে শুক্তি।

শুভেন্দু এগিয়ে এসে কাছে দাঁড়ায়। জিজ্ঞাসা করে—কেন পারবে না?

চোখের উপর থেকে হাত সরিয়ে শুভেন্দুর মুখের দিকে একবার তাকিয়েই চোখ বন্ধ ক'রে ফেলে শুক্তি।—তোমার অমঙ্গল হবে।

চমকে ওঠে শুভেন্দু, ঠিক যেমন হঠাৎ আলোর ঝলক লাগলে চমকে ওঠে মানুষের চোখ।

শুভেন্দু—এই তোমার ভয়?

শুক্তি—ঐ একটি ভয়।

ঘরের মধ্যে পায়চারি ক'রে বেড়ায় শুভেন্দু। শুক্তির চোখ-বোঁজা মুখের দিকে বার বার তাকিয়ে দেখতে থাকে। ছোট জগৎপুরের অমঙ্গলের জন্য যার এত ভয়, আর একমাত্র ভয়, সে বেচারারই চোখের ঘুম কেড়ে নিয়ে শাস্তি দিচ্ছে ছোট জগৎপুরের কতগুলি নির্মম গল্প।

আর একবার তাকায় শুভেন্দু। শুক্তির কাছে এসে দাঁড়ায়। দেখতে অদ্ভুত লাগছে শুক্তির মুখটা। যেন শান্ত হয়ে আর মন ভরে ছোট জগৎপুরের জন্য মঙ্গলের স্বপ্ন দেখছে দুটি ঘুমন্ত চক্ষু। না, কথাটা ঠিকই। নাগেশ্বর কখনো কাউকে ঠকাতে পারেন না।

হঠাৎ শুভেন্দুর সারা মুখে যেন একটা কৃতার্থ কামনার হাসি ঝক ক'রে ফুটে ওঠে। পা টিপে টিপে জানালার কাছে এগিয়ে যেয়ে আঙিনার উপর প্রজাবাড়ির মেয়েগুলির দিকে তাকিয়ে চোখের ইশারায় কি-যেন একটা কৌতুকের নির্দেশ জানায়। পা টিপে টিপে আর আস্তে আস্তে ফিরে এসে শুক্তির নীরব নিঃস্পন্দ ও চোখে-বোঁজা শান্ত মূর্তিটার পিছনে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে।

হুড়মুড় ক'রে ছড়া গাইতে গাইতে ঘরের ভিতর এসে ঢুকে পড়ে মেয়ের পাল। টগর চন্দনা খাঁদি পটলী ধবধবী বুড়ি সীতা ফুলকুঁড়ি আর কালী।

—রক্ষে কর। তুমি কোথায়? ভয়ার্ত স্বরে চেঁচিয়ে ওঠে শুক্তি।

শুক্তির মাথার উপর হাত রেখে শুভেন্দু হাসতে হাসতে বলে—এই তো। পালিয়ে যাই নি।

ততক্ষণে দশ-বারটা হাত একসঙ্গে হুটোপুটি ক'রে রুপো ঠাকরুনের ভিটার মাটি আলতার সঙ্গে মিশিয়ে শুক্তির দু'পায়ে মাখাতে আরম্ভ ক'রে দিয়েছে।

চোখে আঁচল দিয়ে আর শরীরটাকে যেন প্রাণপণে কঠিন ক'রে নিয়ে নিঃশব্দে বসে থাকে শুক্তি। সতীসোহাগের ছড়া আরও জোর গলায় বেজে উঠতে থাকে—রুপো ঠাকুরুনের পা গো কি আশ্চর্যি মা গো। জল হলো আলতে। পা হল লালতে। কড়ি তুলসী কচি দুব্বো ধন্যি। পতিসোহাগী সোনাপুতী ধন্যি।

অন্য ঘর থেকে শাশুড়ির ডাক শোনা যায়—থাম্‌লি এবার, ওরে ও মেয়ের দল, বউমাকে আর বিরক্ত করিস নি, সিধে নিয়ে ঘরে যা এখন।

মুটুর মা, হরির মা, দাসুর মা আর পুঁটির মা। একই গাঁ থেকে ওরা এসেছে। একই বস্তির এক ঘরেতে একই সঙ্গে থাকে সবাই। তা ছাড়া আছে আর একজন। তার নাম হ'ল মিছার মা।

ঢাকুরিয়া ষ্টেশন ছাড়িয়ে আর একটু এগিয়ে ডায়মণ্ড হারবারের ট্রেন যেখানে একেবারে জোরে শিস ছেড়ে আর বেগ বাড়িয়ে দিয়ে চলতে শুরু করে, সেখানে রেল লাইনের বাঁ দিকে তাকালে দেখা যায় এই বস্তি। বর্ষার সময় বস্তির ঘরগুলি যেন জলের উপর ভাসে, আর গ'লে গ'লে পড়ে দেয়ালের মাটি।

একটি ঘরের মাটির মেজে মাত্র, লম্বায় দশ হাতের কিছু কম আর চওড়ায় দু'হাতের কিছু বেশি। ভাড়া দিতে হয় প্রতিমাসে পঁচিশ টাকা। অর্থাৎ মাথা পিছু পাঁচ টাকা। মাটির মেজেটাকেই সমান সমান পাঁচটি ভাগে ভাগ ক'রে নিয়েছে সবাই। লম্বায় তিন হাতে আর পাশে দু'হাত জায়গার এক একটি ভাগ। রাত্রি হ'লে সারাদিনের গতর-খাটা জীবনের ক্লান্তিকে তারই মধ্যে টান করিয়ে শুইয়ে নিতে পারা যায়। কেরোসিনের যে কুপিটা জ্বলে, সেটাও ভাগের জিনিস। মাথা পিছু এক পয়সা করে চাঁদা ধরতে হয়েছে, কারণ মোট পাঁচ পয়সা হলো কুপির দাম। ত্রিশটি রাত্রির উগ্রগন্ধ ধোঁয়া আর ময়লা আলোর জন্য মোট খরচ পড়ে পাঁচ আনা। সুতরাং, হিসেবে কোন গোলমাল হয় না। প্রতিমাসে মাথা পিছু এক আনা জমা করলেই কেরোসিনের খরচ কুলিয়ে যায়।

মুটুর মা, হরির মা, দাসুর মা, পুঁটির মা আর মিছার মা। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঠিকা ঝি-এর কাজ ক'রে জীবন কেটে যায় যাদের, তাদেরই পাঁচজন। পাঁচটা ছেঁড়া মাদুর, তার উপর এক এক টুকরো চট, আর এক একটা কাঁথা। একটি ক'রে পেঁটরাও আছে প্রত্যেকের। ঐ মাদুর চট আর কাঁথা, আর পেঁটরার মধ্যে যা আছে, তাই নিয়েই হলো পাঁচজনের যথাসর্বস্ব। চোরের ভয় আছে, তাই কাজের বাড়িতে এসেও উদ্বেগ থাকে মনে। আর কাজের ফাঁকেই, কিম্বা কাজ ফাঁকি দিয়েই এক একবার চলে আসে। দরজা খুলে ঘরে ঢোকে, পেঁটরা খুলে দেখে, তারপর নিশ্চিন্ত হয়। তারপর আবার দরজায় কুলুপ দিয়ে কাজে চলে যায়।

বর্ষার ভয় আছে, চোরের ভয় আছে, গ্রীষ্মের সময় আর এক রকম ভয় আছে। গতবছর এই যথাসর্বস্বও পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। বৈশাখের দুপুরে ট্রেনের ইঞ্জিন থেকে ধোঁয়ার সঙ্গে আগুনের ফুল্‌কি কয়েকটা ছুটে এসে পড়েছিল শুক্‌নো বিচালি-ছড়ানো চালের উপর। সন্ধ্যা বেলা কাজ থেকে ফিরে এসে দেখেছিল সবাই, পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে ঘর। কিন্তু কি আশ্চর্য, সেই ছাই-এর স্তূপ ঘেঁটে পাঁচটি পেঁটরার কোন চিহ্নও খুঁজে পাওয়া যায় নি। পোড়া কপালের ছাইটুকুও চুরি ক'রে নিয়ে গিয়েছে চোর। কপাল চাপড়ে একই সঙ্গে কেঁদেছিল সবাই ; মুটুর মা, দাসুর মা, হরির মা, পুঁটির মা, আর মিছার মা।

আবার নতুন চালা তুলে দিলেন বস্তির মালিক। কিন্তু ভাড়াও বাড়িয়ে দিলেন। এখন দিতে হয় মাথা পিছু পাঁচ টাকা, আর তখন দিতে হতো মাথা পিছু তিন টাকা, মাসে পনব টাকা।

আর একটা ভয়, সেই ভয় হ'ল সব চেয়ে বড় ভয়। জ্বরের ভয়। যদি মাথাটা কেমন কেমন ক'রে ওঠে, হাত-পাগুলি তেতে ওঠে আর কাঁপতে থাকে, নিশ্বাসের বাতাসটা জ্বলতে থাকে, তবেই হয়েছে! একদিন দু'দিনের টানা উপোসে যদি জ্বব ছাড়ে তো ভাল, তা না হ'লে হয় পাগল ক'রে না হয় ভিখিরী ক'বে ছাড়বে ঐ জ্বর। কাজে কামাই দিতে হবে আর মাইনে কাটা যাবে। তাই জ্বব গায়েই কাজে ছুটতে হয়।

আবাব, সব বাবেই কি জ্বর-গায়ের জ্বালা নিয়ে কাজে যেতে পারা যায়? পারা যায় না। ঘরেব অন্ধকাবে মাদুরের উপর শুয়ে হঠাৎ মরণভয় চেপে বসে বুকের উপব। ঢাকুরিয়াব কবরেজেব কাছে গিয়ে চার আনার পাচন কিনে আনতে ইচ্ছা করে। কিন্তু তবু পেঁটরার ভিতব হাত দিতে ইচ্ছা করে না। চারটি আনা পয়সা মিছামিছি খুইয়ে দিয়ে লাভ নেই। বুঝতে পারে, মিথ্যে এই মরণভয়, এত সহজে মবণ হয় না। আর মরণ যখন সত্যিই আসবে, তখন কি আর চাব আনার পাচনে তাকে ঠেকানো যাবে।—না গো মুটুর মা, তুমি কাজে যাও, পাচন কিনতে হবে না। হাঁপ ছেড়ে আবাব পাশ ফিরে শুয়ে থাকে হরিব মা।

মাঝে মাঝে, বছবে অন্তত তিন চার বাব প্রত্যেকেরই জীবনে এইরকম পরীক্ষা দেখা দেয়। কোনবার মুটুর মা, আবার কোনবার হরির মা, দাসুর মা, আর পুঁটির মা আর মিছার মা, এইরকমই মরণভয় সহ্য করে, কিন্তু পাচন কিনে চার আনা পয়সা নষ্ট করতে পারে না।

হুটু হরি দাস্থ আর পুঁটি—নেহাৎ কতকগুলি নাম নয়, মাত্র কতগুলি কল্পনা নয়। ওরা সত্যিই আছে। ওরা বেঁচেই আছে। যে যার নিজের নিজের প্রাণ বাঁচাবার খোরাক যোগাড় করার জন্যই পৃথিবীতে কোথাও না কোথাও ব্যস্ত হয়ে রয়েছে। এই রকমই এক একটা বস্তির মধ্যে ঠাঁই নিয়ে আছে সবাই এবং এই বস্তিতেই মাঝে মাঝে তাদের দেখতেও পাওয়া যায়। আসে দাস্থ, আসে হরি আর হুটু। আলতা পায়ে দিয়ে আর হাতে কাঁচের চুড়ি বাজিয়ে পুঁটিও আসে তার বরের সঙ্গে।

সন্ধ্যা বেলা লেকের চারদিকে ঘুরে মসলা-মুড়ি ফেরি করে দাস্থ। হুটু যাদবপুরের এক মোটর বাসে খালাসীর কাজ করে, আর হরি হলো বড়-বাজারের এক দোকানের চাকর। পুঁটি আর ঝি-এর কাজ করে না। তার বর বিড়ির দোকান দিয়েছে, আর দোকান চলছেও ভাল। মায়েতে ছেলেতে সুখ দুঃখের কথা হয়, আবার ঝগড়াও বাধে। সব মা'র মন এক রকম নয়, সব ছেলের প্রকৃতিও একরকম নয়। হরি আসে শুধু মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করতে। হুটু এসে কখনো একটা নতুন গামছা আর কখনো বা দু'চার আনা পয়সা দিয়ে যায় মাকে। দাস্থ এসে শুধু ঝঞ্ঝাট বাধায়, উল্টো দুটো টাকা চেয়ে বসে। দাস্থর মা চিৎকার ক'রে গালি দেয়—টাকা কোত্থেকে পাব রে, আর পেলেই বা তোকে কেন দেব রে গাঁজাখেকো মুখপোড়া। পুঁটি এক একদিন এসে একগাল হেসে বলে—আজ কাজে কামাই দে না মা।

—কেন লো?

—আজ মুগ খিচুড়ি বেঁধেছি, চল দুটি খেয়ে আসবি।

সবারই ছেলে বা মেয়ে আসে, আর এসে ঝগড়া করে, নয় হাসি, কিন্তু মিছার মা'র মিছা কেন আসে না?

আসবার কথা নয়, কারণ ঐ নামটাই যে মিছা। মিছার মা কারও মা নয়। একটা নাম ওর নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু সে নামটা এই বস্তির জীবনে এসে অনেকদিন আগেই অচল হয়ে গিয়েছে। হুটুর মা, হরির মা, দাস্থর আর পুঁটির মা'ও আজ মনে করতে পারে না যে, ওর নাম হলো মুক্তো, ওদেরই গাঁয়ের সেই ভানু দাসের বউ মুক্তো। মুক্তো হলো নিঃসন্তান। কিন্তু সবাই যখন অমুকের মা আর তমুকের মা, তখন মুক্তোই বা কারও মা হবে না কেন? যেন চার জনের নামের চাপে পড়েই মুক্তোর

নামও হঠাৎ বদলে গেল একদিন। আজ কারও মনেও পড়ে না, মুক্তোকে মিছার মা ব'লে কে ডাক দিয়েছিল প্রথম। ঠাট্টা ক'রে নয়, সত্যিই যেন একটা দরকারে পড়ে, যেন বস্তির এই চারজন সন্তানবতীর নামের আর গতরখাটা ঝি-জীবনের সঙ্গে মুক্তোকে মানিয়ে নেবার জন্যই ঐ নাম দেওয়া হয়েছে। সন্তান নেই, হয়ও নি কোন দিন। তাই মুক্তো হলো মিছার মা।

—কি হলো তোর, আজ কাজে যাবি নি মিছার মা?

নুটুর মা'র ডাক শুনে বিরক্ত হয়, আর উত্তর দিতে গিয়ে যেন বিড়বিড় করে মিছার মার মেজাজ—কিছু হয় নি, ইচ্ছে হয়েছে কাজে যাব না, তুই চেঁচাস কেন?

রোজ নয়, মাঝে মাঝে সমব্যথিনীর এই রকম মিষ্টি কথারও তেতো জবাব দেয় মিছার মা। জবাবের ভাষা শুনে আর অকারণ রাগের রকম দেখে কখনো রাগ ক'রে আবার কখনো হেসে চলে যায় নুটুর মা।

কারণটা কিন্তু কেউ অনুমান করবার কিংবা বুঝবার চেষ্টা করে না। মিছার মা হয়ে পড়ে আছে মুক্তো, সহজ হয়ে গিয়েছে এই নামটা, কিন্তু তবু যেন মাঝে মাঝে এই নাম সহ্য করতে পারে না মুক্তো।

সেদিন ঠিক হলো, রথের মেলা দেখতে যাওয়া হবে।—তুই যাবি নাকি মিছার মা? দাসুর মা'র কথার উত্তরে হেসে হেসেই জবাব দেয় মুক্তো—যাব বৈকি।

চুল বাঁধল, ধোওয়া শাড়ি পরল মুক্তো। আর, যাবার সময় হ'তেই ডাক দিল পুঁটির মা—চল মিছার মা।

হঠাৎ যেন ফোঁস ক'রে উঠল মুক্তোর নিঃশ্বাসের শব্দ। মুখ ভার ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ, তার পরেই ঝামটা দিয়ে বলে—তোরাই যা, আমি যাব না।

—তবে থাক্, মেজাজ নিয়ে ধুয়ে খা।

তিন জন ছেলের মা আর একজন মেয়ের মা রাগ ক'রে পাল্টা ঝামটা দিয়ে চলে যান। ঘরে দাওয়ার উপর নিঃশব্দে একা বসে বিনুনি খুলতে থাকে মুক্তো, মিছার মা মুক্তো।

এই রকম প্রায়ই হয়, হয়ে আসছে আজ ক'বছর ধরে। নাম বদলে দিয়ে মুক্তোকে বেশ মানানসই ক'রে এই ঘরের চার জনের জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে

নেওয়া হয়েছে, কিন্তু তবু যেন ঠিক মিলে যেতে পারে নি মুক্তো। ঐ অকারণ বিরক্তি, মুখভার, ফোঁস ক'রে ওঠা আর ঝামটা দেওয়া, একটা কি যেন এলোমেলো হয়ে রয়েছে মনের মধ্যেই। মনের দিক দিয়ে চার জনের মধ্যে বেশ একটা বেমানান হয়েই রয়েছে মুক্তো।

শুধু মনের দিক দিয়ে কেন, বস্তির সকলে তো স্বচক্ষে দেখছেই পায়, বয়সে ও চোখ-মুখের চেহারায় ঐ চার জন নারীর মধ্যে বেশ ভিন্ন হয়ে আর বেমানান হয়ে রয়েছে এই নারী, যার নাম মিছার মা। চারজন প্রবীণা ও বর্ষীয়সীর মধ্যে মাত্র একজন, যার বয়স বেশ কাঁচা। পরিপাটি ক'রে বিনুনি বাঁধে, যত্ন ক'রে পায়ে আলতা পরে, মিছার মা'র এই সব শখ ভাল চক্ষে দেখে না বস্তির মানুষ, যদিও মিছার মা দেখতে ভাল আর বিনুনিতে ও আলতাতে ওকে মানায়ও ভাল।

বস্তির আর সকলে যে চক্ষেই দেখুক, এই ঘরের চারজন প্রবীণা ও বর্ষীয়সীর কাছ থেকে বেশ একটু লাই আদর আর ক্ষমাই পেয়ে থাকে মিছার মা। সন্ধ্যা বেলা কাজের বাড়ি থেকে মিছার মা'র ফিরতে যদি একটু দেরি হয়ে যায়, তবে একটু ভয় পেয়ে আর উদ্বেগ নিয়ে দাওয়ার উপর এসে বসে থাকে চার জন, আর ফিরে আসার পর ধমক-ধামকও দেয়।—রাত করিস কেন, বয়স ভুলে যাস কেন লো বে-আক্কেল ছুঁড়ি ?

অভিভাবিকাদের ভাবনার রকম দেখে হেসে ফেলে মুক্তো।—মানুষের ভুল কি শুধু রেতের বেলাতেই হয় হরির মা, দিনের বেলাতেও তো হতে পারে।

হেসে ফেলে হরির মা—দোহাই তোর ঠাকুরের, রেতে হোক আর দিনে হোক, ভুলটুল করিস না মিছার মা।

—চুপ কর। রুক্ষস্বরে হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে মুক্তো। গম্ভীর হয়ে আর মুখ ভার ক'রে হরির মা'র দিকে তাকিয়ে থাকে। চোখের ভাব দেখেই বোঝা যায়, ঠিক সেই, আবার ঠিক সেই রকম অকারণে হঠাৎ রাগ করেছে মুক্তো। কিন্তু আর কিছুই বলে না। আর বলবেই বা কেমন ক'রে ? নিজেও কি ঠিক বুঝতে পারে, এ ছাই অদ্ভুত রাগ কেন দপ ক'রে জ্বলে উঠে মেজাজ খারাপ ক'রে দেয় !

হুটুর মা বলে—ঐ দেখ, কি রকম করে তাকাচ্ছে দেখ !

দাসুর মা বলে—তোর মাথার মধ্যে কি সাপ লুকিয়ে আছে নাকি লো ? এরকম হঠাৎ ফোঁস করে উঠিস কেন ?

মুক্তোও আর কোন উত্তর না দিয়ে শান্তভাবেই ঘরের ভিতর ঢোকে।

এই ভাবেই জীবন চলে, রেল লাইনের পাশের এই বস্তিতে, চারজন বর্ষীয়সী সত্যিকারের মা,আর কাঁচা বয়সের এক মিছার-মা'র ঘরের জীবনে এর চেয়ে বেশি কোন ঝঞ্ঝাট দেখা দেয় না।

ঝঞ্ঝাট দেখা দিল একদিন।

কোথা থেকে মোটাসোটা আর কুচকুচে কালো চেহারার এক বছর বয়সের একটা বাচ্চা ছেলে নিয়ে এল মুক্তো।

চিৎকার করে হরির মা—এটাকে কোত্থেকে নিয়ে এলি মিছার মা?

মুক্তো হেসে হেসে বলে—তেতলা বাড়ির দারোয়ান দিল।

হরির মা—কার ছেলে?

মুক্তো—দারোয়ানেরই মেয়ে মানুষের ছেলে।

হুটুর মা—তা মুখপুড়ী মেয়েমানুষটা কই?

মুক্তো—মরেছে।

দাসুর মা—কিন্তু তার জন্য তুইও মরবি না কি?

মুক্তো—মরব কেন? এটাকে পুষব।

পুঁটির মা রাগ ক'রে একটু শান্তভাবেই বুঝিয়ে বলে—মনুষের ছেলে পোষা কি চারটিখানি ঝঞ্ঝাট মিছার মা? নিজের পেটের ধান্ধায় দু'বেলা ঘরের বাইরে খাটতে হয় যাকে, ছেলে পুষবার সময় কই তার?

মুক্তো- ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে যাব।

হুটুর মা ধমক দেয়- একা একা বন্ধ ঘরের ভেতর ছেলে পড়ে থাকবে, আর তুই বাইরে বাইরে ধেই ধেই ক'রে নাচবি, কেমন?

হরির মা—ছেলে যে কেঁদে সারা হবে।

দাসুর মা—মনার মা'র সব্বনাশের কথা শুনিস নি?

পুঁটির মা—বাচ্চাটার পায়ে দড়ি লাগিয়ে সেই দড়ি দাওয়ার খুঁটোর সঙ্গে বেঁধে রেখে রোজ কাজে চলে যেত মনার মা। একদিন ফিরে এসে দেখে, বাচ্চাটাকে ক্ষেপা কুকুরে কামড়ে মেরে রেখে চলে গিয়েছে।

মোটাসোটা কুচকুচে কালো বাচ্চাটাকে কোলের উপরেই জোরে চেপে ধ'রে আঁৎকে ওঠে মুক্তো। তার পরেই কেঁদে ফেলে—এ কি সবনেশে কথা বলছিস পুঁটির মা।

পুঁটির মা সান্ত্বনার সুরে বলে—বেড়ালের ছানা পুষলেও মায়া পড়ে যায়,

মিছার মা, তুই তো ইচ্ছা ক'রে মায়া করবার জন্যেই এটাকে পুষবি। বাঁচবে কি মরবে কোন ঠিক নেই, যেচে ঝঞ্ঝাট ঘাড়ে নিস না মিছার মা।

হরির মা বলে— ফিরিয়ে দিয়ে আয়।

দাসুর মা বলে আমি বাপু এক কথা বলে দিচ্ছি, আমি ঘরের মধ্যে এসব নোংরামির বালাই সহ্য ক'রব না।

ফোঁস ক'রে ওঠে মুক্তো—তোর দাসু কি একেবারে সেয়ানা হয়ে জন্মেছিল না কি লো?

দাসুর মা—কিন্তু সে তো তোর ঘর নোংরা করতে যায় নি আঁটকুড়ি।

পুঁটির মা মাঝে পড়ে ঝগড়া থামিয়ে দেয়। দাসুর মা'ও একটু শান্ত হয়। তোমরাই বল, আমি চার বেলা নাওয়া ধোওয়া করি, আমার একটু শুদ্ধু বাতিক আছে, এখন এই ঘরের ভেতর একটা অজাত-কুজাত ছেলের নোংরামি যদি…।

ন্টুর মা—না না, সেসব চলবে না। ছেলে ফিরিয়ে দিয়ে আয় মিছার মা।

ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়েছে মুক্তোর কোলের উপর। অনেকক্ষণ ফুঁপিয়ে কাঁদল মুক্তো। তারপর ঘুমন্ত ছেলেটাকে বুকের উপর তুলে নিয়ে ঘরের দাওয়ার উপর থেকে নেমে ধীরে ধীরে চলে গেল।

পুটির মা এগিয়ে যেয়ে মুক্তোর কানের কাছে ফিস্ ফিস্ ক'রে বলে—ভুল করিস না মিছার মা। পরের ছেলেকে পরের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে চলে আয়। নিজের ছেলে হ'লে না হয়…।

চমকে ওঠে মুক্তো। পুঁটির মা'র মুখে দিকে তাকিয়ে ভাঙা গলায় মুক্তো বলে—কি বললি পুটির মা?

—কিছু না, তুই এই ঝঞ্ঝাট ফেরত দিয়ে আয় এখন।

নিজের ছেলে হ'লে না হয়… কি জানি কি বলতে গিয়ে থেমে গেল পুটির মা। দাওয়ার উপর চুপ ক'রে ব'সে আবোল তাবোল চিন্তা করে মুক্তো। ক'দিন থেকে কাজে বের হয় নি মুক্তো, আজও যাবে না।

ভানুদাসের বউ মুক্তো, কিন্তু কোথায় সেই ভানু দাস? আজ দশ বছরের মধ্যেও তার কোন সাড়া নেই। সেই যে ধানের ক্ষেতে দাঙ্গা ক'রল আর পুলিশ আসবার আগেই পালিয়ে গেল, তারপর থেকে সেই মানুষটার ছায়াও আর দেখা দিল না। লোকটা ভেসে গেল, কিন্তু মুক্তোকেও ভাসিয়ে নিয়ে গেল। নইলে গাঁয়ের চাষীর বউকে কি আজ শহরের এই বস্তিতে এসে ঢুকতে হয়, আর পেটের ভাতের জন্য পরের বাড়ির থালা-বাসন ধুয়ে বেড়াতে হয়।

আবাগা বেঁচে থাকলেও পুলিশের ভয়ে আর ফিবে আসবে না, মরে থাকলে তো ফিরবেই না। ঐ লোকটাই মুক্তোকে চিবকালের মত মিছাব মা ক'বে বেখে সবে পড়েছে চিবকালেব মত। কিন্তু ইচ্ছা ক'বলেই তো এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে পারে মুক্তো। উপায়ও তো আছে! আজ একবছর হ'ল একটা অনুবোধ করিয়া হয়ে ছায়াব মতো মুক্তোব পিছনে ঘুবছে। পয়সা আছে লোকটাব। বাজাবেব কাছেই পথের উপব সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আলুব দোকান সাজিযে বসে থাকে লোকটা। ওব নাম নন্দ।

নন্দব কোন কথাব কোন উত্তব কোন দিন দেয় নি মুক্তো। ছাযাব মতো পিছনে পিছনে এসেছে নন্দ। বেল লাইনেব কাছ পর্যন্ত এসে থমকে দাড়িয়েছে। বলেছে—কিন্তু আমি যদি তোকে স্ত্রী মনে করি, তবে তুই আমাকে স্বামী মনে কবতে পাববি না কেন মুক্তো?

চুপ ক'বে শুনেছে, আব শুনেই বেল লাইন পাব হয়ে বস্তিতে ঢুকেছে মুক্তো। নন্দেব ছায়া কোন জবাব না পেযে সন্ধ্যাব অন্ধকাবে শুকনো মুখ নিযে ফিবে চলে গিযেছে।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, বস্তিব ঘবে ঘবে কুপি জলছে। ট্রেনেব ইঞ্জিনেব লাল ধোঁযা অন্ধকাবে নাচতে নাচতে চলে যাচ্ছে। কিন্তু ভাবতে গিযে আনমনাব মতোই বস্তিব কাদামাখা সরু পথেব দিকে তাকিয়ে থাকে মুক্তো, আব কি আশ্চর্য, যেন মুক্তোব মনেব সব ধোঁযা ভেদ ক'বে সেই কিস্তুব মূর্তিটাই একেবাবে ঘবেব কাছে এসে মুক্তোব চোখেব কাছে দাঁড়ায়।

নন্দ বলে আমি কি বাঘ না ভালুক, এবকম কবিস কেন মুক্তো?

উত্তব দেয না মুক্তো। এত দিন সত্যই বাঘ আব ভালুকেব মতই মনে হয়েছিল লোকটাকে কিন্তু আজ কেন জানি মনে হল, মানুষটা মানুষেবই মত।

নন্দ বলে—তুই ঘবে ঘবে এঁটো বাসন ধুয়ে বেড়াবি, এ যে আমি আব সহ্য ক'বতে পাবছি না মুক্তো।

মুক্তোব একেবাবে চোখেব কাছে এসে নন্দ বলে—এত ভাববাব কি আছে মুক্তো? আমি খাটব আব টাকা আনব, তুই শুধু সেজে বসে থাকবি ঘবে।

চকিতে নন্দব মুখেব দিকে তাকিয়ে, তাবপব সন্ত্রস্তেব মত চাবদিকে তাকায় মুক্তো। নন্দব কথাব মধ্যে মস্ত বড এক লোভেব আশ্বাস বাজছে, আর চাবদিকে তেমনি কতগুলি কঠিন ধিক্কাবও থমথম করছে। হ্যাঁ, একটি ছেলে কোলে নিয়ে ঘবের ভিতব সেজে বসে থাকতে চায় মুক্তো। কিন্তু

সে কি ক'রে সম্ভব? তা হ'লে [illegible] মতো এই ঘরের বার হয়ে যেতে হয়। গাঁয়ের নাম ডুবিয়ে দিয়ে, এই বস্তির ও এই ঘরের নাম ডুবিয়ে দিয়ে চলে যেতে হবে·· তার পর · ।

নন্দ বলে—এত ভয় করবার কি আছে মুক্তো? এই তল্লাটেই থাকব না আমরা। জাতের লোক, চেনা লোক, গাঁয়ের লোক, কেউ খুঁজে পাবে না আমাদের। স্বামী স্ত্রী হয়ে সুখে ঘর ক'রব আর ···।

মুক্তো হাঁসফাঁস ক'রে নিশ্বাস ছেড়ে বলে—তুমি এখন যাও '

নন্দ—তা হ'লে কথা রইল, একদিন এসে···।

মুক্তো—যাও যাও, এখন শিগগির চলে যাও।

চলে গেল নন্দ—সঙ্গে সঙ্গে হরির মা এসে ঘরের দাওয়া'র উপর ওঠে। প্রশ্ন করে- আজও কি কাজে যাস নি মিছার মা?

মুক্ত বলে—না যাই নি, আর কোনদিনও কাজে যাব না।

হরির মা বিস্মিত হয়—এ কেমন কথা? কাজ করবি না তো খাবি কি?

মুক্তো—কপালে যা আছে, তাই খাব।

হরির মা ভ্রূকুটি করে—তোর কথাবার্তা তো ভাল মনে হচ্ছে না মিছার মা।

নুটুর মা, পুঁটির মা আর দাসুর মা আসে। তারপর আরও প্রবল এবং আরও মুখর হ'য়ে ওঠে চারটি পেতের খেটে বেঁচে থাকা বর্ষীয়সীর মনের সন্দেহ। কাজে যাবে না আর খাটবে না, তবে খাওয়াবে কে এই মেয়েকে? ও কি এই দাওয়ার উপর বসে বেণী দুলিয়ে আর আলতা রাঙানো পা ছড়িয়ে দিয়ে ভাত কাপড় গয়না রোজগার ক'রতে চায়? সে হবে না, কখনো না। তার চেয়ে এখনই দূর হয়ে যাও। যাও জাত পাতের মু'খ কালি দিয়ে, যে কোন নরকে চলে যাও। এখানে থেকে ওসব চলবে না।

হরির মা আক্ষেপ কর'তে গিয়ে শেষ পর্যন্ত কেঁদেই ফেলে—ওরে, তুই যে সম্পর্কে আমার জা হোস রে মিছার মা। তোর সোয়ামি ভানু যে হরির বাবার আপন মেসোর ভাইয়ের ছেলে।

পুঁটির মা ভয়ে কেঁপে ওঠে—ভানু যদি কখন ফিরে আসে, তবে তোকে যে ঝুঁটি ধরে তুলে নিয়ে হাড়কাঠে ফেলে বলি দেবে লো।

অভিযোগের উত্তাপ আর ধিক্কারের বর্ষণ একটু শান্ত হবার পর মুক্তো হঠাৎ বেহায়ার মত হেসে ওঠে।

পুঁটির মা বলে—আবার কি হলো?

মুক্তো বলে—আমি যদি বিয়ে করি তবে কি দোষের হবে পুঁটির মা?

পুঁটির মা চোখ বড় করে তাকায়। —বিয়ে? তোর তো বিয়ে হয়েই আছে। আবার বিয়ে কেমন ক'রে হবে?

মুক্তো—বিধবার তো বিয়ে হয়।

পুঁটির মা—তুই বিধবা নাকি?

মুক্তো—হ্যাঁ, মানুষটা এতদিন মরেই গিয়েছে নিশ্চয়।

হরির মা চেঁচিয়ে ওঠে—তবে এতদিন কপালে সিঁদুর রাখলি কেন মুখপুড়ী?

মুক্তো একটুও রাগ করে না। বরং খিলখিল ক'রে হেসে ওঠে—আমি যেমন মিছার মা, তেমনি আমার ঐ মিছা সিঁদুর।

পুঁটির মা বুঝিয়ে বলে—ধর, বিয়েই না হয় ক'রলি। তারপর, ভানু যদি ফিরে আসে? কি হবে উপায়?

মুক্তো—তখন না হয় গলায় দড়ি দেব।

হরির মা বলে—এখুনি দে।

কিন্তু এত ধমকি আর এত উপদেশের কোন ফল হলো না। সত্যই আর কাজে গেল না মুক্তো। পেঁটরা খুলে পয়সা বের করে উনুন হাঁড়ি কাঠ আর চাল ডাল কিনে আনে মুক্তো। দাওয়ার একটি কোণ চট টাঙিয়ে আড়াল করে নেয়। সেইখানে বসে রান্না করে মুক্তো। কখনো দুপুরে কখনো বিকেলে, আর কখনো সন্ধ্যায়, মাত্র একটি বার এক ঘণ্টার মধ্যেই তড়বড় করে রান্না সেরে নেয়, আর খেয়ে নিয়ে ঘরের ভিতর পড়ে থাকে। মাদুরের উপর অলস একটা দেহ ছটফট করতে থাকে। যখন কেউ থাকে না ঘরে, তখন শিয়রের পুঁটলির উপর মুখ গুঁজে দিয়ে অবাধে কেঁদে নেয় মুক্তো। চমকে ওঠে এক একবার, মনে হয় নন্দর ছায়া এসে উঠেছে দাওয়ার উপর।

মুটুর মা দেখে আশ্চর্য হয়, হরির মা দেখে হাঁফ ছাড়ে আর আশ্বস্ত হয়, আর পুঁটির মা ও দাসুর মা দেখে কষ্ট পায়, এ আবার কোন্ রোগে ধরল মিছার মাকে। সত্যিই বেণী দুলিয়ে আর আলতায় পা রাঙিয়ে দাওয়ার উপর বসে না মুক্তো। বিয়ে-টিয়ে করবে বলে যে সব ফষ্টি নষ্টি ক'রল, তাই বা সত্য হ'ল কোথায়? বরং, কি যেন এক মরণ রোগে ধরেছে, যার জন্য অষ্টপ্রহর মাদুরের উপর গড়াচ্ছে আর ছটফট ক'রছে। এক মাসের মধ্যেই কি ভয়ানক রুগিয়ে গেল ছুঁড়ি!

মুটুর মা মুক্তোর গায়ে হাত দিয়ে ঠেলা দেয়—তোর কি হয়েছে বল দেখি ?

বলতে বলতে মুটুর মা মনের আর একটা ভয়ানক সন্দেহ দূর করার জন্য দু' চোখ নিয়ে মুক্তোর একেবারে গায়ের উপর ঝুঁকে পড়ে দেখতে থাকে।

দামুর মা বলে—যদি হয়েই থাকে, তবে ক'দিন লুকিয়ে রাখবে? ধরা তো পড়তেই হবে।

খিল খিল ক'রে হেসে ওঠে মুক্তো। শুনতে ভালই লাগে বুড়িদের ভীরু মনের আশঙ্কার কথা, আর গম্ভীর মুখের আলোচনা।

মুটুর মা—খাঁস করিস বাছা, ভুলেও নিজের এমন সর্বনাশটা করিস না।

—না গো না। বলতে গিয়েই হঠাৎ ফুঁপিয়ে ওঠে মুক্তো।

কিন্তু মনে হয় মুক্তোর, এই সর্বনাশটা নেই বলেই খালি হয়ে রয়েছে বুকটা। মুটুর মাও যেন শান্ত করার জন্যই একটু আদর করার ভঙ্গীতে মুক্তোর মাথায় হাত দিয়ে ডাকে—মিছিমিছি কেন ইচ্ছে ক'রে নিজের মনটাকে জ্বালিয়ে কষ্ট পাচ্ছিস মিছার মা। কপাল মেনে চলতে হবে তো।

উত্তর দেয় না মুক্তো। ফোঁপানিও থামে না। আর চার বর্ষীয়সীও কোন কথা না বলে চুপ ক'রে বসে থাকে। এতদিনে যেন বুঝতে পেরেছে সবাই, মিছার মা'র এতদিনের খেপা মেজাজের সব রহস্য। কিন্তু উপায় কি? মিছার মা হয়ে তবু বেচে থাকা যায়, কিন্তু জাত মান ডুবিয়ে দেওয়া যে মরণের বড় মরণ।

কেরোসিনের কুপি জ্বলে। ধোঁয়া মাখা আলো মিট মিট ক'রে দরজার কাছে। বুড়িরা যে যার মাদুরের উপর গড়িয়ে পড়ে, সারাদিনের ক্লান্ত এক একটা বাসন মাজা ঝাঁট দেওয়া আর কাপড়-কাচা জীর্ণ শীর্ণ জীবন। ঘুমিয়ে পড়ে সবাই, শুধু মুক্তোর চোখে ঘুম আসে না। যেমন ভাল লাগে না মিছার মা নাম, তেমনি ভাল লাগে না বুড়িদের সন্দেহভরা চোখের সামনে এইরকম মিথ্যে পোয়াতির মতো মিছামিছি কাতরাতে। মিটমিট ক'রে একটা স্বপ্ন জ্বলে মুক্তোর দু' চোখে। চমকে ওঠে মুক্তো, কেরোসিনের কুপির আলো যেন দাওয়ার উপর একটা ছায়া দেখতে পেয়ে হঠাৎ ছটফট ক'রে উঠেছে।

মাদুর ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় মুক্তো। দেখতে পায়, হ্যাঁ ঠিকই হয়েছে।

নন্দ এসে দাঁড়িয়ে আছে। ফুঁ দিয়ে কুপি নিভিয়ে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ায় মুক্তো। ফিস ফিস ক'রে বলে—যাব তোমার সঙ্গে, কাল রাতে এস, অনেক রাতে।

চলে যায় নন্দ।

ভোর হয়। সবার আগে মাদুর ছেড়ে উঠে বসে নুটুর মা, আর দেখতে পায়, আরও আগে উঠে বসে রয়েছে মিছার মা, ঘুম-কাতুরে আলসে মিছার মা। কি আশ্চর্য!

প্রশ্ন করে নুটুর মা—আজ কি কাজে বের হবি?

মুক্তো বলে হ্যাঁ।

নুটুর মা—মনে রাখিস, আজ ঘরের ভাড়া দিতে হবে।

হ্যাঁ মনে আছে মুক্তোর, এই ঘরের ভাড়া জীবনে শেষবারের মতো চুকিয়ে দিতে হবে আজ।

কাছাকাছি দুটো বাড়িতে মুক্তোর প্রায় এক মাসের মাইনে বাকি পড়ে আছে। আর অনেকদিনের আগের দুটো বাড়ির কাছেও পাওনা আছে। সে প্রায় আজ দু' বছর আগের কথা। একটা বাড়ির গিন্নি মা'র কথার ঝাঁজে অতিষ্ঠ হয়ে আর রাগ ক'রে চলে এসেছিল মুক্তো। আর একটা বাড়ির গিন্নি পর পর তিন মাস মাইনে না দিয়ে শুধু মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে রাখছ দেখে কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছিল মুক্তো। যার যার ক'রেও আজ দু' বছরের পাওনা টাকা আদায় করতে যেতে পারে নি মুক্তো।

কিন্তু আজ আদায় ক'রে নিতে হবে। আজ যে এই তল্লাট ছেড়েই রাতের অন্ধকারে ভেসে চলে যেতে হবে চিরকালের মতো। ঘর ভাড়া মিটিয়ে দিতে হবে, আর কিছু কাপড় চোপড় কিনে নিতে হবে। পেঁটরাতে আর একটি আনাও বোধ হয় নেই। টাকার দরকার আছে।

দরকার নাই বা থাক, পাওনা ছেড়ে দেব কেন? গেলাসের গায়ে ছাই-এর একটা দাগ লেগে থাকলেও যারা চেঁচিয়ে উঠেছে, তিন বার ক'রে সেই গেলাস না ধুইয়ে যারা ছাড়ে নি, তাদের কাছ থেকে পাওনা টাকা চেঁচিয়ে আদায় ক'রে নেওয়াই তো উচিত। আর ভয় কিসের? মায়াই বা কেন আসবে এই তল্লাটের জন্য, যেখানে না খাটিয়ে নিয়ে কেউ এক ঘটি তেষ্টার জল দেয় না?

ঘর ছেড়ে বস্তির সরু রাস্তা, তারপর রেল লাইন, রেল লাইনের পাশে শিউলি গাছ, তারপর ছোট মাঠটা পার হয়ে একটা পাকা সড়ক, সড়কের দু'পাশে নতুন নতুন দোতলা তেতলা আর চারতলার ভিড়ের মধ্যে এসে দাঁড়ায় মুক্তো। এক এক ক'রে তার কাজের বাড়িতে ঢোকে, আর পাওনা আদায় ক'রে নিয়ে চলে আসে।

একটা বাড়ি শেষ দিনের এক বেলার মাইনে কেটে নিল আর একটা বাড়ি মাইনের হিসাবটাই কেমন যেন এলোমেলো ক'রে দিল। করুক, কোন ক্ষতি নেই। বাড়ির গিন্নি কথা শুনিয়েছে, তেমনি গিন্নিকেও কথা শুনিয়ে দিয়েছে মুক্তো। আর এই তল্লাটের কোন চোখ রাঙানি আর চেঁচানিকে ভয় করবার গরজ নেই মুক্তোর।

বাকি রইল পুরনো বাড়ি দুটো। এখান থেকে একটু দূরে, ট্রাম লাইনের কাছাকাছি সেই দুটো বাড়িতে সেই মানুষগুলি এখনো আছে কি না কে জানে। একটা বাড়ির সম্বন্ধে কোন দুশ্চিন্তা নেই, কারণ সেটা হ'লো বড়লোকের বাড়ি, আর নিজেদেরই বাড়ি, ভাড়া বাড়ি নয়। ওরা নিশ্চয় আছে, ওদের কাছ থেকে আদায়ও করা যাবে নিশ্চয়। দু' বছর আগের পাওনা, বাড়ির কর্তা আর গিন্নি হিসাব ভুলে গেলেও ভুলতে দেবে কেন মুক্তো? চেঁচিয়ে বাড়ি আর পাড়া মাৎ ক'রে বুঝিয়ে দিতে হবে, ভালয় ভালয় পাওনা মিটিয়ে না দিলে আরও অনেক ছোটকথা শুনতে হবে, যতই না বড়লোক হও।

শেষ পর্যন্ত তাই হলো, বড় বাড়ির কর্তা ও গিন্নি কিছুতেই মনে ক'রতে পারলেন না যে, ঝি মিছার মায়ের মাইনে বাকি পড়ে আছে। কিন্তু মিছার মা গলা খুলতেই মনে পড়ে গেল কর্তার, একুশ দিনের মাইনে বোধ হয় দেওয়া হয় নি। মিছার মা বলে—একুশ দিন নয়, আটাশ দিন, আপনার মেয়ে-জামাই যেদিন এল আর গিন্নি মা আমাকে যাচ্ছেতাই বললেন, সেদিনের তারিখটা মনে ক'রে দেখুন।

বাড়ির গিন্নি চেঁচিয়ে ওঠেন—ছোটলোক হয়ে এত বড় কথা···।

মুক্তো—ছোটলোকের পাওনা পয়সা ফাঁকি দিতে চান, কেমনতর বড়লোক আপনি; ছোটলোকের চেয়েও ··

বাড়ির গিন্নি হুংকার দেন—সাবধান।

কর্তা বলেন—থাক্, আটাশ দিনের মাইনেই হিসেব ক'রে দিয়ে দিচ্ছি।

ঠিক ঠিক হিসাব ক'রে টাকা দিলেন কর্তা, মুক্তোও চলে গেল, কিন্তু পাঁচ মিনিট পরেই ফিরে এসে আবার বাড়ির গেটে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে মুক্তো, কারণ গেটের দরজা একেবারে তালা লাগিয়ে বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছে।—ঠগ ঠগ, তিনতলাওয়ালা ঠগ। অচল নোট ধরিয়ে দিয়েছে।

পাঁচ টাকার একটা নোট হাতে নিয়ে পথচারী ভদ্রলোকদের ডেকে ডেকে দেখায় মুক্তো।—দেখুন তো বাবু, এই নোট কি বাজারে চলবে?

পথচারী ভদ্রলোক বলেন—না, এটা জাল নোট। কেউবা জিজ্ঞাসা করে—কোথায় পেলে এ জাল নোট?

হাত তুলে তিনতলা বাড়িকে দেখিয়ে দিয়ে চিৎকার করে মুক্তো—ঐ যে তিনতলাওয়ালা জালিয়াত দিয়েছে।

কিন্তু তিনতলা বাড়ির ফটকের লোহার গরাদ একটুও বিচলিত হলো না মুক্তোর চিৎকারে। মুক্তোই শেষ পর্যন্ত হাঁপিয়ে, ক্লান্ত হয়ে আর অভিশাপ দিয়ে চলে গেল।

বাকি আর একটা বাড়ি। সেটা হ'ল ভাড়া বাড়ি। আশঙ্কা হয়, হয় তো সে বাড়িতে গিয়ে কতগুলি নতুন লোকের মুখ দেখতে পাবে মুক্তো। ঝি এর তিন মাসের মাইনে বাকি রেখেছে যারা, তারা কি আর চার মাসের বাড়ি ভাড়া বাকি রাখে নি, আর তারপর কি বাড়িওয়ালা না উঠিয়ে ছেড়ে দিয়েছে তাদের?

পথ চলতে থাকে মুক্তো, কিন্তু মনে হয়, সে বাড়ির লোকগুলি দেনার চাপে আর পাওনাদারের তাগিদে এতদিনে পালিয়েই গিয়েছে নিশ্চয়। কম তো নয়, তিন মাসের মাইনে ত্রিশটি টাকা পাওনা ছিল সেখানে।

মনে পড়ে সে বাড়ির লোকগুলির চেহারা। কর্তার বয়স অল্প, কিন্তু তবু টাক পড়েছে মাথায়। একটা মেয়ে আছে, আট নয় বছর বয়স হবে। আর আছেন গিন্নি। বড় ভালো মানুষ, আর বড় বেশি মিষ্টি কথার মানুষ ঐ গিন্নি। লোকগুলি মন্দ ছিল না, কিন্তু শুধু মিষ্টি কথার জোরে মাসের পর মাস মাইনে ফাঁকি দেওয়াও তো ভদ্রলোকের কাজ নয়। মনে পড়ে, সে বাড়ির গিন্নিকে বৌদি বলে ডাকত মুক্তো। বয়স বেশি নয় গিন্নির।

সঙ্গে সঙ্গে তিন বছরের পুরনো স্মৃতির ছবি যেন চঞ্চল ক'রে দিয়ে আর একটা কথা মনে পড়ে যায় মুক্তোর, বৌদির তখন সাত আট মাস চলছে। মুক্তো কাজ ছেড়ে চলে আসার সময় বৌদি বলেছিলেন, আর অন্তত একটা মাস থেকে যাও মিছার মা।

থাক এসব পুরনো কথা, আর একটু এগিয়ে গিয়ে সেই বাড়িটারই কাছে গিয়ে থামে মুক্তো। এই বাড়িরই নিচের তলার ভাড়াটে হলো সেই টাকপড়া দাদাবাবু আর সেই বৌদি। দেখতে পায় মুক্তো, দরজার সামনে সেই কচি সুপুরি গাছটা আছে, আর বেশ একটু বড়সড়ও হয়েছে। তিন বছর তো কম সময় নয়।

বাড়িতে ঢুকে খুশিই হলো মুক্তো। কলতলায় বসে এঁটো বাসন মাজছিলেন বৌদি। মুক্তোকে দেখতে পেয়েই আশ্চর্য হলেন আর হেসে হেসে বললেন বৌদি—এ কি মিছার মা, এত দিন কোথায় ছিলে তুমি?

মুক্তো বলে—বেচেই ছিলুম গো বৌদি।

বৌদি—আমি কিন্তু মরতে চলেছিলুম।

মুক্তো—কেন?

বৌদির বাসন মাজা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। বলেন—আগে একটু জিরিয়ে নাও আর চা খাও, তারপর বলছি।

শুনে খুশি হয় না মুক্তো, বরং একটু গম্ভীর হয়েই বসে থাকে। এই ভয়ই করছিল মুক্তো, এবাড়ির এই সব মায়াকথার আর মিষ্টি ভাষার ফাঁদে পড়লে পাওনা টাকাগুলিই মারা পড়বে। টাকা আদায় করতে এসে এই চালাক বৌদির ভাল ভাল কথার সঙ্গে মন মাখামাখি না করাই ভাল। আজ মনে মনে শক্ত সঙ্কল্প এঁটে এসেছে মুক্তো, যদি টাকা না দিতে পারেন বৌদি, তবে টাকার বদলে বৌদির হাতের একটা আংটি চেয়ে নেবে মুক্তো। ফরসা কাপড় পরবে, দু'কানে সোনাদানা চড়িয়ে বসে থাকবে, অথচ ঝি-এর মাইনে দেবার বেলায় টাকা হয় না, এটাও একটা চালাকি নয় তো কি?

চা খেল মুক্তো। বৌদি বলেন—তুমি তো আমাকে সেই অবস্থায় ফেলে দিয়ে চলে গেলে মিছার মা। তারপর সে কি দুর্দশা! নিত্যি মূর্চ্ছা যাই আর তারপরেও শরীরের গাঁটে গাঁটে অসহ্য ব্যথা। যা'হোক্, হাসপাতালে তো গেলুম, ফাঁড়াও ভালয় ভালয় কেটে গেল, কিন্তু বিপদে পড়লুম বাচ্চাকে নিয়ে।

চেঁচিয়ে ওঠে মুক্তো—বাচ্চা কই বৌদি?

বৌদি হাসেন—বাচ্চা এখন আর একেবারে বাচ্চা নয়! টুলুর বয়স তো এখন প্রায় দু' বছর হয়েছে মিছার মা।

উঠে দাঁড়ায় মুক্তো—কই, টুলু কই?

এইবার বিষণ্ণ ভাবে তাকিয়ে থাকেন বৌদি।—আজ মাস দুই হলো খুব অসুখে ভুগছে টুলু। জ্বরটা কিছুতেই ছাড়তে চায় না।

বৌদির কোন নির্দেশের অপেক্ষায় না থেকে ব্যস্তভাবে ঘরের দিকে চলে যায় মুক্তো। এই ঘরের সবই চেনা। এই ঘরের প্রত্যেকটি কোণের ধুলো ঝাঁট দিয়ে সরিয়েছে যে, তার কাছে কিছুই তো নতুন নয়।

কিন্তু ঘরের ভিতর ঢুকতেই ঘরের চেহারাটা কেমন নতুন নতুন লাগে মুক্তোর চোখে। অনেক কিছু ছিল এই ঘরের মধ্যে, তার অনেক কিছুই এখন আর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। দেয়াল ঘড়িটা নেই, বড় আয়না আর আলমারিটা নেই। বড় পালঙ্কটাও নেই। দেয়াল আলমারিতে আর্শির আড়ালে ঝক্ ঝক্ করত পাঁচটা থাকে সাজানো কাঁসা আর তামার বাসন। কতকগুলি ছোট ছোট রুপোর থালা বাটি পানদানি আর পুতুল ছিল। সে-সব কিছুই নেই। আলনার দুটি পাট দাদাবাবুর ধুতিগুলিতেই ভরে থাকত। আজ সেখানে মাত্র একটি আধময়লা গেঞ্জি আর একটি ধুতি ঝুলছে। বৌদির চেহারাটাও চোখে পড়ে। কানে দুল নেই, আংটিও নেই। আর সেই মেয়েটা, সেই রমা, ঢেঙ্গা হয়েছে ঠিক, কিন্তু কি রোগা।

তক্তাপোশের উপর বিছানায় শুয়ে রয়েছে ছোট্ট একটা শিশু। তারই মাথার কাছে পাখা হাতে বসে আছে বৌদির বড় মেয়ে রমা। এগিয়ে যায় মুক্তো।

দুই চোখ অপলক ক'রে ঘুমন্ত টুলুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে মুক্তো। তারপর সরে যায়। ঘরের ভিতর থেকে চলে এসে বারান্দার উপর বসে পড়ে। একটা হাঁপ ছেড়ে মুক্তো বলে—তোমাদের এ কি রকম দশা হলো বৌদি, কিছুই যে বুঝতে পারছি না।

বৌদি বলেন—চাকরি না থাকলে যা হয়। তোমার দাদাবাবুটির কপালে যে কোন্ গ্রহের কোপ পড়েছে, জানি না। তিন বছর হতে চলল, শত চেষ্টা ক'রেও কোন চাকরি পাচ্ছেন না, অথচ কি কাজই না জানেন। এখন শুধু এখানে ওখানে ছেলে পড়িয়ে যা আনছেন, তাতে...।

হঠাৎ চুপ ক'রে গেলেন বৌদি। মুক্তো বলে—ছেলের ওষুধ বিষুধ ঠিক চলছে তো, না তাও...।

বৌদি বলেন—কেমন ক'রে চলবে? এই তো দেখ, আজ তিন দিন হলো এক বন্ধু ডাক্তার এসে ওষুধের নাম লিখে দিয়ে গিয়েছেন, কিন্তু আজও ওষুধ আনতে পারা গেল না। পনেরটা টাকার জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তোমার দাদাবাবু।

আবার চুপ করেন বৌদি। তারপরেই যেন একটা দুঃসহ আক্ষেপ চাপতে না পেরে হঠাৎ ছটফট ক'রে ওঠেন—ছেলেটা এল, কিন্তু কি দুর্ভাগ্যই যে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এল মিছার মা!

—ছি ছি ছি! বৌদির মুখের দিকে কঠোরভাবে তাকিয়ে পাল্টা ধিক্কার দেয় মুক্তো।—তোমার মিষ্টি মুখ যে একেবারে তেতো হয়ে গিয়েছে বৌদি। এমন কথা কি বলতে হয়? তোমাদের পোড়াকপাল দিয়ে ছেলেটার প্রাণটাকে পোড়াচ্ছ তোমরাই, উল্টো ছেলের ভাগ্যির নামেই কুকথা, ছিঃ।

এদিকে ওদিকে ঘুরে ফিরে কাজ ক'রতে থাকেন বৌদি। ক্লান্ত ও অবসন্নের মত চুপ ক'রে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বারান্দার উপর বসে থাকে মুক্তো, অনেকক্ষণ।

যেন এই অবসাদ থেকে উঠে দাঁড়াবার জন্যে একটা চেষ্টা করতে চায় মুক্তো। বলে—আমাকে আর এক বাটি চা দিতে পার বৌদি?

—নিশ্চয়।

যতক্ষণ চা তৈরী করেন বৌদি, ততক্ষণ চোখ বন্ধ ক'রে যেন একটা স্বপ্ন খুঁজতে থাকে মুক্তো। বৌদির ডাকে যখন চমক ভাঙ্গে তখন চোখ মেলে তাকায় আর চা খায়।

তারপরেই উঠে দাঁড়ায় মুক্তো। আর, বৌদির মুখের দিকে শক্তভাবেই তাকিয়ে বলে—ওষুধের নাম লেখা কাগজটা আমাকে দাও বৌদি।

ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে থাকেন বৌদি। মুক্তো যেন ভয় দেখিয়ে চিৎকারের মত কর্কশ স্বরে বলে—দাও বলছি।

ওষুধের নাম লেখা কাগজটা নিয়ে এসে মুক্তোর হাতে তুলে দেন বৌদি। মুক্তো তার শাড়ির আঁচলের এক কোণের একটা গিঁট খুলে নোট আর টাকা গুলি একবার গুণে নেয়। তার পরেই চলে যায়।

তারপর, দুপুর হবার আগেই এই নিচের তলার টাক পড়া দাদাবাবু ফিরে এসেছেন, আর দুপুর হতেই আবার বের হয়ে গিয়েছে। রমা খেয়ে-দেয়ে কিছুক্ষণ বই পড়েছে, তারপর ঘুমিয়ে পড়েছে। আর, এক শাদা কাপড় কেচে, তারপর বারান্দার উপরেই ক্লান্ত শরীর এলিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন বৌদি।

বাড়ির মধ্যে শুধু জেগে থাকে একজন। ঘরের ভিতরে তক্তাপোশের পাশে পাখা হাতে নিয়ে ঘুমন্ত টুলুর মুখের দিকে তাকিয়ে বসে থাকে মুক্তো।

যেমন যেমন বলে দিয়েছেন বৌদি, সব মনে আছে মুক্তোর। টুলু জাগলেই ওষুধ খাইয়ে দেয়, আর মাথায় পাখার বাতাস দিয়ে আবার ঘুম পাড়িয়ে দেয়। টুলুর ছোট্ট বুকের উপর থেকে চাদর সরিয়ে, আর ছোট জামাটার বোতাম খুলে মালিশের ওষুধ লেপে দেয় টুলুর বুকের উপর। টুলু আরামে ঘুমোতে থাকে। তুলতুলে ও ছোট একটা বুক নিঃশ্বাসের বাতাসে কাঁপে, যেন একটা স্পর্শের মায়ায় থেকে থেকে ঝুঁকে পড়ে মুক্তোর বুক। টুলুর কপালে হাত বুলিয়ে, টুলুর কপালে চুমো খেয়ে আবার নিজেকে যেন কিছুক্ষণের মত শান্ত ক'রে রাখে মুক্তো।

সব মনে আছে মুক্তোর, বৌদি যেমন যেমন বলে দিয়েছেন। এক একবার টুলু হঠাৎ চোখ মেলে তাকায়। মুক্তো ডাকে—কি চাই বাবু?

টুলু বলে—মিষ্টি জল।

এক হাতে ওষুধের গেলাসে মিছরির জল ঢেলে নিয়ে টুলুর মুখের কাছে তুলে ধরে মুক্তো। আর এক হাতে টুলুর ছোট দেহটাকে বুকের মধ্যে জাপটে ধরে মুক্তো। মিষ্টি জল খেয়ে শুয়ে পড়ে টুলু, তারপরেই ঘুমিয়ে পড়ে। আবার হাতে পাখা তুলে নেয় মুক্তো।

ঝন ঝন্। একটা শব্দ যেন হঠাৎ চমকে উঠল, বোধ হয় বৌদির হাত থেকে পড়ে গিয়েছে একটা থালা। সেই সঙ্গে চমক ভাঙ্গে মুক্তোর, আর ঝন ঝন্ ক'রে বেজে ওঠে তার বুকের ভিতরটা। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। এইবার যেতে হবে।

যেন এতক্ষণ ধরে একটা মূর্চ্ছার মধ্যেই পড়েছিল মুক্তো। এইবার জ্ঞান হয়েছে। আস্তে আস্তে দরজার কাছে এগিয়ে এসে আস্তে আস্তে ডাক দেয় মুক্তো—বৌদি গো।

বৌদি এসে বলেন—কি?

মুক্তো ছটফট করে—এবার আমায় যেতে দাও বৌদি।

বৌদি বিষণ্ণভাবে বলেন—আমি তোমাকে যেতে দেবার কে মিছার মা। তুমি যে উপকার করলে, সে কাজ...

মুক্তো—চুপ কর বৌদি। আমি যাই।

বৌদি—কাল আসবে তো একবার?

মুক্তোর চোখ দুটো কাঁপতে থাকে ভীরু অপরাধীর মত।—কাল? হ্যাঁ, দেখি কিন্তু কাল কি আসতে পারব বৌদি?

বৌদি—কাজের এক ফাঁকে চলে এস একবার।

বৌদির কথার উত্তর দেবার আগেই আর একটা শব্দ শুনে চমকে ওঠে মুক্তো।

—যাবে না। বচিগলার এক অদ্ভুত আদেশের শব্দ শুনে মুখ ফিরিয়ে টুলুর দিকে তাকায় মুক্তো। দেখতে পায়, চোখ মেলে মুক্তোরই মুখের দিকে তাকিয়ে আছে টুলু। ব্যাপার দেখে হেসে ফেলেন বৌদি।

আবার দরজার কাছে থেকে ফিরে এসে টুলুর বিছানার কাছে দাঁড়ায় মুক্তো।—কি বলছো বাবু?

হাত বাড়িয়ে মুক্তোর শাড়ির আঁচল খপ্ ক'রে ধরে ফেলে টুলু।

আবার সেই স্বরে কাতর আর দুর্বল একটা শিশুকণ্ঠের স্বর বেজে ওঠে। —যাবে না।

বৌদি ফিসফিস করে বলেন—আপত্তি করো না মিছার মা। চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাক একটু, এখুনি ঘুমিয়ে পড়বে, তারপর যেও।

ঠিক বলেছিলেন বৌদি। এক মিনিটের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল টুলু। আস্তে আস্তে, অতি সাবধানে আর ভয়ে ভয়ে ঘুমন্ত টুলুর মুঠো থেকে আঁচল ছাড়িয়ে নিল মুক্তো।

কিন্তু বৌদির দিকে তাকাতেই ছলছল ক'রে ওঠে মুক্তোর চোখ।—জেগে উঠে আমাকে আবার খুঁজবে না তো বৌদি?

বৌদি বলেন—খুঁজতে পারে, আশ্চর্য কি।

আর একমুহূর্তও দেরি করে না মুক্তো। দরজা পার হয়ে হনহন ক'রে চলে যায়। যেন ঘুটঘুটে অন্ধকারে ভরা একটি গভীর রাতে এক সিঁধেল চোরের মতোই এই ঘরের ভিতর ঢুকেছিল মুক্তো, কিন্তু হঠাৎ ভোর হয়ে গিয়েছে, তাই ভয় পেয়ে ছুটে পালিয়ে যেতে হলো।

রাত্রির অন্ধকারে ঘুমিয়ে আছে রেল লাইনের পাশের বস্তি। একটি ঘরের ভিতর তখন একজন জেগে বসে আছে, আর কুপিতে কেরোসিনের আলো জ্বলছে। একটি ছায়া এসে ওঠে সেই ঘরের দাওয়ার উপর।

ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে আসে মুক্তো। নন্দ বলে—চল মুক্তো।

মুক্তো বলে—না।

নন্দ আশ্চর্য হয়—না?

মুক্তো—আমি যাব না।

নন্দ—তবে মিছে কথা বলে আমাকে এভাবে ঠকালি কেন মুক্তো?

মুক্তো—হ্যাঁ, সত্যিই মিছে কথা বলেছি আর ঠকিয়েছি। কিন্তু তুমি মাপ ক'রে দাও।

নন্দ সন্দিগ্ধভাবে বলে—ব্যাপার কি, একটু খুলেই বল না মুক্তো?

মুক্তো—ছেলে ফেলে রেখে চলে গেলে পাপ হবে।

নন্দ—তোর ছেলে আছে নাকি?

মুক্তো—আছে।

নন্দ বলে—বেশ তো, ঘর ছেড়ে চলে আসতে নাই বা পারলি, কিন্তু ঘরে থেকেই তো মাঝে মাঝে…।

মুক্তোর গলার স্বর যেন দপ্ ক'রে জলে ওঠে—আর কিন্তু টিস্ত নয়, সোজা চলে যাও, নইলে এখুনি হাঁক ডাক ক'রে পাড়া জাগিয়ে তুলব বলে দিচ্ছি।

দাওয়ার উপর থেকে বাইরের অন্ধকারের মধ্যে সেই মুহূর্তে যেন টুপ ক'রে ঝরে পড়ে আর সরে পড়ে নন্দের ছায়া।

কোন সোরগোল জাগল না, কিন্তু তবু অকস্মাৎ দাওয়ার উপর একটা রহস্য-পূর্ণ ছায়ার উৎপাতেই যেন বিচলিত হয়ে ঘরের ভিতরের মানুষগুলির ঘুম ভেঙ্গে গেল। জেগে উঠল নুটুর মা, দাসুর মা, হরির মা আর পুঁটির মা।

নুটুর মা—কি লো মিছার মা, তুই এখনো জেগে রয়েছিস কেন?

দাসুর মা—এখনো কুপি জ্বলছে কেন?

কোন জবাব না দিয়ে হাসতে থাকে মুক্তো।

হরির মা বিরক্ত হয়ে বলে—বেশি রঙ ঢলাস্ নি মিছার মা।

কিন্তু মুক্তো সত্যিই হেসে হেসে চোখে মুখে রঙ ঢলিয়ে বেহায়ার মত বলে—আমি মিছার মা নই গো হরির মা।

নুটুর মা—তবে তুই কি? ছেলের মা?

মুক্তো মাদুরের উপর গড়িয়ে পড়ে আর হাসে—তা তোকে বলতে যাব কেন? তুই বুঝবিই বা কি?

নুটুর মা চিৎকার করে—কি বললি?

মুক্তো বলে—তুই এখন ঘুমো, আর আমাকেও একটু ঘুমোতে দে।

খোলার চাল, মাটির ভিত আর মেটে দেয়াল, তার মধ্যে ছোট একটা জানালা, আর তারই উপর লুটিয়ে পড়ে রয়েছে নিকটের একটা নিমগাছের ছায়া। দেখামাত্র ভবনাথের মনের এতক্ষণের একটা স্বপ্নই যেন তেতো হয়ে গেল।

মানুষের কল্পনার প্রাসাদ অনেক সময় ধূলিসাৎ হয়ে যায়; আর ভবনাথের কল্পনার প্রাসাদটা ধূলিসাৎ না হলেও একটা কুঁড়েঘর হয়ে গেল। সত্যই, ভবনাথের কল্পনার মধ্যেই এতক্ষণ ধরে এই সকালবেলার আলোকে ঝক্‌ঝক্ করছিল প্রায় প্রাসাদের মতই বড়সড় চেহারার একটা বাড়ি। কিন্তু নিমগাছের ছায়ায় ঢাকা ঐ ক্ষুদ্র আর দরিদ্র চেহারার মেটেমলা বাড়িটার দিকে চোখ পড়তেই যেন সে কল্পনার মাথায় বাড়ি পড়ল। ধুলোর মতই ঝুরঝুর ক'রে ঝরে পড়ল ভবনাথের আশা আর ভরসা।

এই কি শশী এভিনিউ-এর একশো ছত্রিশের উনপঞ্চাশের সি? কিন্তু আর প্রশ্ন করার ও সন্দেহ করারও কোন অর্থ হয় না। জানালাটার নিচে মেটে দেয়ালের গায়ে কয়লার আঁচড়ে একেবারে স্পষ্ট ক'রেই লেখা রয়েছে, একশো ছত্রিশের উনপঞ্চাশের সি।

পথের উপরেই কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়িয়ে থাকে ভবনাথ, আর ভাবতে থাকে, ফিরে যাওয়াই ভাল। এ হেন হাভাতে ঘরের কপাটের কড়া নেড়ে কোন লাভ নেই।

শুধু একটা হয়রানিই লাভ হলো, আর পকেটের মধ্যে শেষ সম্বল এক টাকা সাত আনা থেকে দশটা আনা একেবারে বাজে খরচে ব্যর্থ হয়ে গেল। বাড়িটা খুঁজে বের করতে অনেক সময় লেগেছে, অনেক ঘোরাঘুরি করতে হয়েছে, আর ট্রাম-বাস ও রিক্সার ভাড়া যোগাতে গিয়ে খরচ হয়ে গিয়েছে পুরো দশটা আনা।

এখন মনে হয়, ঠিকই বলেছিল কালীশ। কালীঘাটের চায়ের দোকানের কালীশ।—এ কেসটা সুবিধের ব'লে মনে হচ্ছে না ভব, রিস্কি নিয়ে লাভ নেই।

ভবনাথেরই রিস্কি-জীবনের এক অন্তরঙ্গ সুহৃদ কালীঘাটের চায়ের দোকানের বয় কালীশ কোন উৎসাহ দেয় নি, কিন্তু তবু যেন অদ্ভুত এক উৎসাহের নেশায় অস্থির হয়ে ছুটে চলে এসেছে ভবনাথ, কালীঘাট থেকে এতদূরে বেহালার কাছে

এই বিশ্রী এক জায়গায় কুশ্রী এক পথের উপর। শশী এভিনিউ-এর যা কিছু চটক তা হলো শুধু ঐ নামটার মধ্যেই। এবড়ো খেবড়ো একটা কাঁচা রাস্তা, এখানে গর্ত ওখানে কাদা, গরু-মহিষের খাটাল দু'পাশে, আর মাঝে মাঝে দু'একটা নারকেল আর তাল, আর ধুলোয় বিবর্ণদেহ বাঁশঝাড়। এই হলো শশী এভিনিউ।

আজই ভোরে কালীঘাটের চায়ের দোকানে বসে খবরের কাগজটার দিকে তাকিয়ে একটা বিজ্ঞাপন পড়তে পড়তে ভবনাথের চোখে হঠাৎ দপ্ ক'রে জ্বলে উঠেছিল একটা কল্পনা। চটপট খবরের কাগজের সেই বিজ্ঞাপন থেকে ঠিকানাটা একটা কাগজে লিখে নিয়েছিল ভবনাথ। সেই কাগজটা এখনো চার ভাঁজ হয়ে ভবনাথের হাতের মুঠোর মধ্যে রয়েছে।

একটা নিরুদ্দেশের বিজ্ঞাপন। আজ তিন মাস হলো নিরুদ্দিষ্ট হয়েছেন শ্রীযুক্ত সুশোভন রায়, বয়স পঞ্চান্ন-ছাপান্ন, গায়ের রঙ বেশ ফরসা, মাথার চুল সাদা, বাম কানের কাছে একটি আঁচিল, গরদের ধুতি চাদর পরা অভ্যাস। যদি কোন সহৃদয় ব্যক্তি সন্ধান দেন, তবে সেই উপকারের জন্য তার কাছে আজীবন কৃতজ্ঞ থাকবে ছায়া রায়, একশো ছত্রিশের উনপঞ্চাশের সি, শশী এভিনিউ, বেহালা।

বলেছিল কালীশ, এই কেসটার মধ্যে এত মাথা ঘামাবার কি দেখলে ভব? দশটা টাকাও পুরস্কার ঘোষণা করলে না হয় দেখা যেত যে ভাঁড়ারে কিছু আছে। বিশ্বি নিস্ না ভব। না রে না; এ একেবারে ফাঁকা ভদ্দোরতা।

ভবনাথ বলে—উঁহু, বেশ কিছু আছে, আর দিতেও পারে বেশ কিছু, তাই পুরস্কার টুরস্কারের কথা চেপে গিয়েছে।

খবরের কাগজের দিকে আর একবার তাকায় ভবনাথ। বিজ্ঞাপনের লেখাগুলি পড়তে থাকে। শশী এভিনিউ, সুশোভন রায়, ফরসা গায়ের রঙ, গরদের ধুতি চাদর, ছায়া রায়—প্রত্যেকটি কথার মধ্যে যে বড়লোক বড়লোক একটা অবস্থা জ্বলজ্বল করছে।

জ্বল্ জ্বল করে ভবনাথের কল্পনা।—আমি তোকেই চ্যালেঞ্জ করছি কালীশ, মোটা মতন আদায় ক'রে আর ট্যাক ভারি ক'রে যদি ফিরে আসি, তবে তুই কি ফাইন দিবি বল?

কালীশ বলে—কিছু না। তুমি বাবা বরং আগের কেসটার আমার পাওনা শেয়ার শোধ ক'রে দিও।

ভবনাথ—কোন্ কেস?

কালীশ—সেই চার থান সিল্ক।

ভবনাথ—সেগুলি তো আমি হাতড়েছিলুম।

কালীশ—আরে হ্যাঁ, তোর বাহাদুরি অস্বীকার করছি না। কিন্তু আমি যে খদ্দের যোগাড় ক'রে দিলুম তার জন্যে লাভের অন্তত চার আনা শেয়ারও কি আমাকে দিবি না?

হেসে ফেলে ভবনাথ—সবই ফুরিয়ে দিয়েছি মাইরি। কিন্তু আজ দেব তোকে, নিশ্চয় দেব। আর শোন, এখন চটপট ডবল ডিম ভেজে দে দেখি, খেয়ে-দেয়ে একটু তাজা হয়ে বেরিয়ে পড়ি।

কিন্তু ঐ সেই একশো ছত্রিশের উনপঞ্চাসের সি, নিমের ছায়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা বিদ্রূপ। ডবল ডিমে ভাজা সেই আশা ও উৎসাহ এতক্ষণ ধরে ঘুরতে ঘুরতে আর শশী এভিনিউ-এর নোংরা চেহারা দেখতে দেখতেই ফুরিয়ে গিয়েছে। তার উপর ঐ বাড়ি; খোলার চাল আর মেটে দেয়াল। এত চেষ্টার পর, শশী এভিনিউ নামে এই অপদার্থ একটা কাঁচা রাস্তার পাশে এই বস্তির মধ্যে বাড়িটার কাছে এসেও যেন ঠিকানা হারিয়ে গেল, পথভ্রান্তের মত দাঁড়িয়ে শূন্য দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে থাকে ভবনাথ।

তার পরেই ছটফট করে চোখ দুটো। কি যেন চিন্তা করে ভবনাথ। দেখাই যাক্ না, শুধু কুঁড়ে ঘর দেখেই হতাশ হয়ে চলে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। যদিও কুঁড়ে ঘর, কিন্তু ঘরের লোকগুলির নামগুলি ভদ্দোর। হয় তো সত্যিই ভদ্দোরলোক। আর ভদ্দোরলোক যদি গরীব হয় তবে তো ভালই হয়। ভীতু-ভীতু, সহজেই বিশ্বাস করে, একটুতেই কৃতজ্ঞ হয়ে ওঠে, ধার ক'রেও পূজোর খরচ যোগাড় করে, ভাত খেতে না পেলেও পান খায়, দুয়ার থেকে ভিখিরী তাড়াতে পারে না, গরীব ভদ্দোরলোকগুলি সংসারের কেমন-যেন অদ্ভুত জীব।

আর, ভবনাথই বা কি কম ভদ্দোর লোক! গায়ে সিল্কের কামিজ, হাতের দুটি আঙ্গুলে আংটি, মাথায় ঢেউ খেলান চুলগুলি একটু রুক্ষ-সুক্ষ, বছর পঁচিশ বয়সের ভবনাথ দুপুরের কলকাতার পথে ব্যস্তভাবে যখন হেঁটে যেতে থাকে, তখন মনে হবে যেন কলেজের ক্লাস কাট্ ক'রে অত্যন্ত শিক্ষিত এক যুবক ম্যাটিনি শো-এর তৃষ্ণায় ব্যাকুল হয়ে কোন সিনেমা হাউসের দিকে চলেছে। ভবনাথের বাপ মা ও ভাই-বোন এই বাংলা দেশের যে গ্রামে থাকে সেই গ্রামটাও

ভদ্রলোকের গ্রাম। সেই গ্রাম জানে, এক ভদ্রলোকের ছেলে ভবনাথ, ৎ গ্রামেরই পাল বাবুদের দোকানে চুরি ক'রে পালিয়ে গিয়েছে, ফেরার হয়ে গিয়েছে, ওয়ারেণ্ট ঘুরছে তাকে সন্ধান ক'রে। ভবনাথের এই ইতিহাস শুধু জানে তার অন্তরঙ্গ সুহৃদ কালীঘাটের চায়ের দোকানের বয় কালীশ, আর সেই কালীশও যে আর এক গ্রামের আর এক ভদ্রলোকের ছেলে।

সুতরাং, এখনি গিয়ে যদি ঐ দীনহীন একশো ছত্রিশের উনপঞ্চাশের সি এর দরজা কাঁপিয়ে দিয়ে কড়া নাড়ে ভবনাথ, আর সেই শব্দে ঘরের ভিতর থেকে ছায়া মায়া বা আর কেউ বের হয়ে আসে, তবে ভবনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে তারাও কেউ সন্দেহ করতে পারবে না যে, ভবনাথ এখন আর সত্যি সত্যি ভদ্রলোক নয়। কেউ একবিন্দু সন্দেহও করতে পারবে না যে, ভবনাথ একটা ছদ্মবেশ, ভবনাথ একটা নিষ্ঠুর ভাঁওতা, ভবনাথ একটি অতিচতুর বাগ্‌জাল, সে এসেছে মানুষকে হঠাৎ মূর্খ করে দিয়ে আর কিছু হাতড়িয়ে নিয়ে সরে পড়ার জন্য।

ভদ্রবেশী চোর তো অনেকই আছে, কিন্তু ভবনাথ হুবহু সে রকম নয়। ভবনাথের চুরিরও একটা ভদ্রবেশ থাকে, অতি পরিপাটি ভদ্রবেশ। পথচারীর পকেটে হাত দিয়ে আর ঘুমন্ত মানুষের ঘরে ঢুকে যারা বিস্কি নেয় আর রোজগার করে, তাদের সম্পর্কে ঘৃণাই আছে ভবনাথের মনে। ওসব নিতান্তই ছোট-লোকের রীতি। সুহৃদ কালীশের কাছেই তার এই ঘৃণার কথা মাঝে মাঝে ঠোঁট বেঁকিয়ে ব্যক্ত করে ভবনাথ—তুই তো জানিস্ কালীশ, কিছু লেখাপড়াও শিখেছি, কাজেই একটু বুদ্ধিশুদ্ধির কাজ ছাড়া অন্য কোন কাজে আমি বিস্কি নিতে পারি না।

হ্যাঁ, শেষ পর্যন্ত বিস্কি নেয় ভবনাথ। ধীরে ধীরে এগিয়ে যায়।—এটা কি সুশোভন বাবুর বাড়ি? জোরে দরজার কড়া নেড়ে হাঁক দেয় ভবনাথ।

ঘরের ভিতর যেন কতগুলি পায়ের শব্দে দুবদুব্ ক'রে বেজে উঠেছে, শুনতে পায় ভবনাথ। হয় ভয় পেয়েছে, নয় আশার সাড়া পেয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে ঘরের ভিতরের কতগুলি মন। উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ভবনাথ।

কতগুলি নয়, মাত্র দুটি। একশো ছত্রিশের উনপঞ্চাশের সি-এর নড়বড়ে কপাটের কাঠ কেঁপে উঠল। খুলে গেল কপাট। আর ভবনাথের মুখের দিকে আগ্রহে ও কৌতূহলে অস্থির দুই জোড়া চক্ষু তাকিয়ে রইল। এক প্রৌঢ়া ও এক তরুণী। বোধ হয় মা ও মেয়ে, দেখে তাই তো মনে হয়।

ভবনাথ বলে—সুশোভন বাবু কি আপনাদের কেউ...

তরুণী বলে—হ্যাঁ, আমার বাবা হন তিনি।

ভবনাথ—সুশোভন বাবুর সন্ধান চেয়ে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন যে ছায়া রায় নামে ।

তরুণী—আমিই ছায়া রায়, আর এই আমার মা।

ভবনাথ—বুঝলাম। এখন তাহ'লে সুশোভন বাবুকে আনবার ব্যবস্থা করুন।

অত্যন্ত ব্যস্ত ও চঞ্চল হয়ে ওঠেন প্রৌঢ়া মহিলা।—বসো বাবা, বসো। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক। বেঁচে থাকো, বড় হও, সুখী হও বাবা।

ভবনাথ—মাপ করবেন, বসবার সময় নেই, আমাকে এখনি অফিসে যেতে হবে। শুধু ঠিকানা জানিয়ে দিতে এসেছি, সেই ঠিকানায় আপনারা গিয়ে সুশোভন বাবুকে নিয়ে আসুন, কিংবা কোন লোক পাঠিয়ে আনিয়ে নিন।

ছায়া রায় ব্যস্তভাবে ঘরের ভিতর চলে যায় আর একটা বেতের মোড়া নিয়ে এসে দরজার কাছে রাখে। অনুরোধ করে ছায়া রায়—বসুন।

আপত্তি করে ভবনাথ—বসবার সময় নেই। ঠিকানাটা বলছি, লিখে নিন। কেয়ার অফ ডাক্তার তিনকড়ি মুখার্জ্জি, বল্লভদাস কাটরা, এলাহাবাদ।

ঠিকানা শুনে শূন্য দৃষ্টি তুলে ভবনাথের দিকে তাকিয়ে থাকে ছায়া রায় আর ছায়া রায়ের মা।

ভবনাথ বলে—আমার কাকা তিনকড়ি মুখার্জ্জি। এক পার্কের গাছের তলায় জ্বর গায়ে নিয়ে বসেছিলেন সুশোভন বাবু। আমার কাকা তাঁকে দেখতে পেয়ে গাড়িতে তুলে নিয়ে নিজের বাড়িতে এনে রেখেছেন। এখন আপনাদের কর্ত্তব্য।

কথা বলে না ছায়া রায় আর ছায়া রায়ের মা।

ভবনাথ বলে—হাওড়া থেকে এলাহাবাদ পর্যন্ত রেলে ইণ্টার ক্লাসের একটি টিকিট আর এলাহাবাদ থেকে হাওড়া পর্যন্ত ইণ্টার ক্লাসের দুটি টিকিটের দাম, তার ওপর পথের হাতখরচ বাবদ আর কিছু, এই নিয়ে বড় জোর টাকা সত্তর লাগবে, তার বেশি নয়। আজই কাউকে যদি পাঠিয়ে দেন তো ভাল, কারণ সুশোভন বাবুর শরীরের অবস্থা ভাল নয়, তর ওপর মনের যা অবস্থা, কখন্ যে আবার কোথায় চলে যাবেন কোন ঠিক নেই।

কেঁদেই ফেললেন ছায়া রায়ের মা।

এইবার শূন্য দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে থাকে ভবনাথ। তার মনের শেষ ভরসাও যেন কাঁদকাঁদ হয়ে এইবার ভেঙ্গে পড়তে চলেছে। টাকার কথা শুনেই কেঁদে ফেলেছে, এ যে একেবারে হাভাতে ভদ্রলোকের বাড়ি। দেখতে পায় ভবনাথ, ছায়া রায়ের হাতে দু'গাছি প্লাসটিকের বালা আর ছায়া রায়ের মায়ের হাতে দু'গাছি শাঁখা। এই মানুষগুলি জীবনে সত্তরটা টাকা দেখেছে কি না সন্দেহ।

ভবনাথ বলে— কান্নাকাটি ক'রে আমাকে অপ্রস্তুত করবেন না।

কান্না থামায় ছায়া রায়ের মা।—তুমি বুঝতে পারছ না বাবা।

ভবনাথ—কি বুঝতে পারছি না?

ছায়া রায়ের মা—সত্তর টাকা যোগাড় করা কি আমাদের মত অবস্থার মানুষের পক্ষে……।

ভবনাথ—কি কাজ করতেন সুশোভন বাবু?

—দোকানে খাতা লিখতেন।

—কত মাইনে পেতেন?

—দৈনিক দু'টাকা।

—তবে গরদের ধুতি চাদর পরার শখ কেন?

—ওটা ওর ধর্মকর্মের শখ। সব সময়েই মনে মনে নাম জপ করেন। তাই সব সময়েই গরদ পরে থাকেন।

—ধর্মের বাতিক?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু ঘর ছেড়ে চলে গেলেন কেন?

—এটাও তাঁর আর এক বাতিক। যখন চাকরি থাকে না তখন ধর্মের বাতিক বাড়ে, কিন্তু ঘরেই থাকেন। আর যখন আমার ওপর রাগ করেন, তখন একেবারে ঘর ছেড়েই চলে যান।

—তাহ'লে এরকম ব্যাপার আগেও অনেক বার হয়েছে?

—হ্যাঁ, কিন্তু চলে গেলেও দু'চার দিনের মধ্যেই ফিরে এসেছেন। কিন্তু এবার তিন মাসেরও বেশি হয়ে গেল, তবু ফিরলেন না দেখে বিজ্ঞাপন দিয়েছি।

বলতে বলতে আবার ফুঁপিয়ে উঠলেন ছায়া রায়ের মা—কাগজে বিজ্ঞাপনের জন্য আটটা টাকা যোগাড় করতে গিয়ে সামান্য কাঁসা-পেতল যা ছিল সবই বেচতে হয়েছে বাবা। এখন আরও সত্তর টাকা যোগাড় করতে হলে… ।

আঁচল দিয়ে চোখ মুছে এইবার ছায়া রায়ের মা তাঁর মেয়ের মুখের দিকে তাকান।

ছায়া রায় বলে—দেখুন, সত্তরটা টাকা যোগাড় করার উপায় আছে, কিন্তু···।

দপ্ করে আবার আশার বিদ্যুৎ চমকে ওঠে ভবনাথের চক্ষে।—বলুন, কি অসুবিধে আছে?

ছায়া রায়—কিন্তু মানুষ নেই।

ভবনাথ—তার মানে?

ছায়া রায় বলে—এমন কেউ আপন-জন নেই, যাকে আমাদের দুঃখের কথা বললে দুঃখিত হবে, আর নিজের কাজ বন্ধ ক'রে এলাহাবাদের মত দূরের জায়গায় যাবে বাবাকে নিয়ে আসবার জন্য।

চুপ করে ছায়া রায়। তারপর ভবনাথেরই মুখের দিকে আরও বেদনার্ত ভাবে তাকিয়ে ছায়া রায় বলে—তা ছাড়া, এমন বিশ্বাসী জনও কেউ নেই, যার হাতে বিশ্বাস ক'বে সত্তবটা টাকা ছেড়ে দিতে পাবি। বিজ্ঞাপন দেওয়াব জন্য খববেব কাগজেব অফিসে গিয়েছিলেন যে চক্কোত্তি ঠাকুব, বাবাবই বন্ধু, এত ভাল মানুষ চক্কোত্তি ঠাকুব, তিনিও ঐ সামান্য কাজের জন্য তাঁর খরচ বাবদ দু'টাকা নিয়েছেন। কিন্তু তাতেও খুশি নন, আজ এসে আরও একটা টাকা চেয়ে গিয়েছেন।

হেসে ফেলে ভবনাথ—বেশ ভাল ভদ্রলোকের পাল্লায় পড়েছেন দেখছি!

ছায়া বায় হাসে—কাজেই, এই উপকাবটুকু করাব ভার আপনাকেই নিতে হয়।

ভবনাথ -কি আশ্চর্য, আমাকেই এলাহাবাদ যেতে বলছেন সুশোভনবাবুকে আনবাব জন্য?

ছায়া বায়—হ্যাঁ।

ভবনাথ চোখ বড় ক'বে বিস্ময় প্রকাশ কবে—অর্থাৎ আমিই আমার অফিস কামাই ক'বে, সব কাজ ফেলে-বেখে এখন এলাহাবাদ ছুটব?

ছায়া রায়—অনেক উপকার আপনিই তো করলেন। আপনিই যখন বাবার খবর এনেছেন, তখন তাঁকে নিয়ে আসার ভার আপনিই নিয়ে শেষ উপকার করুন।

সফল হয়েছে কল্পনা, সার্থক হয়েছে রিস্কি নেওয়া, দশ আনা খবচ আর সারা সকালের হায়রানি। বুকের উল্লাস কোনমতে চেপে চাপা চিৎকারের মতই স্বরে ভবনাথ বলে—দিন টাকা। তাহ'লে এখনি রওনা হয়ে যাই।

ছায়া রায় বলে—কিন্তু একটু দেরি হবে।

ভবনাথ—কতক্ষণ?

ছায়া রায় বলে—বেশিক্ষণ নয়।

মায়ের মুখের দিকে আবার যেন কি-রকম এক ভঙ্গীতে তাকায় ছায়া রায়। ছায়া রায়ের মা বলেন—একটু বসো, দু'টো ভাত মুখে না দিয়ে যেও না বাবা।

এইবার সত্যই চিৎকার ক'রে ওঠে ভবনাথ—না না, কখ্খনো না। আমার সময় নষ্ট করবেন না।

ছায়া রায় হাসে—বেশি সময় নষ্ট হবে না। আমার টাকা যোগাড় ক'রে আনতে যতক্ষণ সময় লাগবে, ততক্ষণে ডাল ভাত রান্নাও হয়ে যাবে।

নিমগাছের ছায়া দোলে। আর, ছায়া রায়ের হাতে প্লাসটিকের চুড়িতে যেন ছায়া রায়ের মুখের হাসির ছায়া দোলে। বিশ্বাসে একেবারে মুর্খ হয়ে গিয়েছে আর গলে গিয়েছে কয়লার আঁচড়ে লেখা এই একশো ছত্রিশের উনপঞ্চাশের সি। মাত্র আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। বাস্, তারপর ..... তারপর কালীঘাটের চায়ের দোকানের কালীশের শেয়ার চুকিয়ে দিয়ে, মুর্গির দোপেঁয়াজী ভরপেট খেয়ে সিনেমাতে গিয়ে একটা বাঙ্গলা ছবি দেখে ...দুর ছাই, কি হবে সিনেমার ছবি দেখে। কালীশই তো কতবার বলেছে, তুই যে রকম প্লে করছিস ভব, সিনেমার কোন বেটা তারকারও সাধ্যি নেই যে ঠিক সে রকমটি করতে পারে।

ঘরের ভিতরে চলে গিয়েছে ছায়া রায় আর ছায়া রায়ের মা। বেতের মোড়ার উপর বসে নিমগাছটার দিকে তাকিয়ে থাকে আর বিস্মিত হয় ভবনাথ। গাছ ভরে ফুল ফুটেছে, গাছের তলায় ফুল ছড়িয়ে রয়েছে। তেতো কষা বিস্বাদ যার পাতা আর ফল, সেই নিমগাছের সাদা সাদা ফুল। কিন্তু এ-হেন তেতো ফুলের থোবার উপর মৌমাছির থোকা বসে রয়েছে। মাটির উপর গড়াচ্ছে যে ফুল, সেই ফুলের গায়ে গড়াচ্ছে মৌমাছি। তেতো নিমেরও মিষ্টি মধু হয় নাকি? আর সেই মিষ্টি কি এতই বেশি মিষ্টি?

হঠাৎ চমকে ওঠে ভবনাথ। একটা রঙীন শাড়ির আঁচল যেন হঠাৎ ভবনাথের গা ছুঁয়ে চলে গেল। ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে, দরজা পার হয়ে আর ভবনাথেরই পাশ কাটিয়ে কোথায় যেন চলে যাচ্ছে ছায়া রায়।

ভবনাথ—এ কি, কোথায় যাচ্ছেন আপনি ?

ছায়া রায় হাসে, কিন্তু তার প্লাসটিকের চুড়ির হাসির ছায়া দেখা যায় না। হাত দু'টি যেন আঁচলের আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে। ছায়া রায় বলে—আসছি এখনি।

চলে যাচ্ছিল ছায়া রায়। কিন্তু বিচলিতভাবে আর সন্দিগ্ধ স্বরে প্রায় চিৎকারই ক'রে ওঠে ভবনাথ—তাহ'লে আমিও চললাম।

থমকে দাঁড়ায় ছায়া রায়। অসহায়ের মত তাকিয়ে আর আহত স্বরে বলে—বুঝতে পারছি, খুবই বিরক্ত হচ্ছেন আপনি। কিন্তু ।

ভবনাথ—কিন্তু আবার কি ? আপনাদের কাণ্ডকারখানা আমার মোটেই ভাল লাগছে না। আপনি কোথায় যাচ্ছেন বলুন ?

ছায়া রায়—টাকার যোগাড় করতে।

ভবনাথ—কোথায় ?

ছায়া রায়—স্যাকরার দোকানে।

ভবনাথ—তার মানে, গয়না বেচতে ?

ছায়া—হ্যা।

ভবনাথ—দেখি, কি গয়না, কেমন গয়না ?

আঁচলের আড়াল থেকে হাত বের ক'রে ছায়া রায়। দেখা যায়, হাতের মুঠোয় কাগজের ছোট একটা মোড়ক।

ভবনাথ—কি আছে এর মধ্যে ?

ছায়া—এক গাছি সোনার বালি।

ভবনাথ—কার বালি ?

ছায়া—আমার।

ভবনাথ—আর এক গাছি কই ?

ছায়া—নেই, অনেক দিন আগেই বেচে দিতে হয়েছে।

মাটির উপর ধুলোমাখা নিমফুল আকড়ে পড়ে রয়েছে মৌমাছি। আনমনার মত দুই চক্ষুর দৃষ্টি উদাস ক'রে ধুলোমাখা নিমফুলের দিকে তাকিয়ে থাকে ভবনাথ, যেন এই সংসারেরই বাইরের একটা অদ্ভুত বস্তুর দিকে তাকিয়ে রয়েছে তার এলোমেলো মন, কিন্তু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে না।

হঠাৎ বলে ফেলে ভবনাথ—থামুন, কোথাও যেতে হবে না আপনাকে।

ছায়া—কিন্তু ।

বস্তি থেকে অনেক দূরে, যেন শশী এভিনিউ-এর শেষ প্রান্তের দিকেই তাকিয়ে, হতাশ ক্লান্ত ও হাঁপ-ধরা ভাঙা ভাঙা স্বরে ভবনাথ বলে—সত্তরটা টাকা খরচ করবার সামর্থ্য আমার নেই, তা'তো সত্যি নয়, এটা আপনি সহজেই বুঝতে পারছেন ছায়া রায়। আমি নিজের টাকাতেই এলাহাবাদে যেতে পারি, আর আপনার বাবার ট্রেন ভাড়ার টাকা দিতেও পারি। কথা হলো, সেটা করা উচিত নয়, আর আপনাদের সম্ভ্রমের পক্ষেও সেটা ভাল নয়, ভাল দেখায় না।

ছায়া—আপনি ঠিকই বলেছেন, ইয়ে···আপনার নাম তো জানি না।

লজ্জিত ছায়া রায়ের মুখের দিকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে ভবনাথ বলে—ভবনাথ মুখার্জি।

পর মুহূর্তেই অন্যমনস্কের মত আবার অন্যদিকে তাকিয়ে ভবনাথ বিড়-বিড় ক'রে বলে—কি আশ্চর্য, নাম পর্যন্ত জানেন না, কিন্তু খুব তো বিশ্বাস করেন।

কিছুক্ষণ যেন স্তব্ধ হয়েই থাকে নিমগাছের ছায়া। প্রশ্ন নেই, উত্তরও নেই। বেতের মোড়া ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ায় ভবনাথ।

বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করে ছায়া রায়—তাহ'লে কি করব বলুন?

ভবনাথ—আপনাকে কিছু করতে হবে না। আমি এখন আমার টাকা খরচ ক'রেই এলাহাবাদে যাই। ফিরিয়ে আনি সুশোভনবাবুকে, তারপর একদিন সুবিধে মত শোধ ক'রে দেবেন টাকাটা।

ছায়া রায়ের শুকনো চোখে একবার যেন একটু বাষ্পের আভাস ফুটে ওঠে। —এতটা আশা করি না, এতটা উপকার দাবি করা উচিত নয়, তাই হ্যাঁ বলতে পারছি না ভবনাথবাবু।

ছটফট্ ক'রে ওঠে ভবনাথের নিঃশ্বাস, ছায়া দেখে ভয়পাওয়া শিশুর মতই ভবনাথের চোখের চাহনিতে আতঙ্ক কাঁপে। ব্যস্ত হয়ে ওঠে ভবনাথ। —তবে আমি রওনা হলাম ছায়া রায়, আর এক মুহূর্তও সময় নষ্ট করতে পারব না।

ছায়া রায়—মা যে আপনার জন্য রান্না শুরু করে দিয়েছেন, না খেয়ে যাবেন না।

ভবনাথ—না, তা হয় না। অসম্ভব।

নীরবে, শুধু একটু বিস্মিত হয়েই তাকিয়ে থাকে ছায়া রায়। মনে

হয়, যেন জাত যাওয়ার ভয়ে অচেনা লোকের বাড়িতে খাওয়ার নাম শুনেই পালিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন ভবনাথবাবু, এলাহাবাদের ডাক্তার তিনকড়ি মুখার্জির ভাইপো, যার হাতের দুই আঙ্গুলে দুটি সোনার আংটি।

ছায়া রায় বলে—আমরাও ব্রাহ্মণ।

কিন্তু যেন প্রলাপ বকতে বকতেই এগিয়ে চললো ভবনাথ—বেশ তো…শুনে সুখী হলাম…ব্রাহ্মণ তো কতই আছে পৃথিবীতে…।

ছায়া রায় ডাকে—ভবনাথবাবু।

ভবনাথ মুখ না ফিরিয়েই উত্তর দেয়—তোমার মা'কে আমার প্রণাম জানিয়ে দিও ছায়া রায়, আমি বিদায় নিলাম।

আবার ডাকে ছায়া রায়—ভবনাথবাবু, কবে আন্দাজ ফিরছেন বলে যান।

থমকে দাঁড়ায় ভবনাথ। কি ভয়ানক মূর্খ এই একশো ছব্বিশের উন পঞ্চাশের সি। কিন্তু এত বেশি মূর্খ বলেই বোধ হয় মমতা জাগে বর্বর তস্করতায় কঠিন ভবনাথের শুকনো হৃৎপিণ্ডের এক কোণে।

ফিরে আসে ভবনাথ, আবার সেই নিমের ছায়ার নিচে শান্ত হয়ে দাঁড়ায়। চিন্তিত ভঙ্গীতে ভুরু কুঁচকিয়ে বলে ভবনাথ—আমার মনে হয়, আমি ভুল করেছি, আর তোমরাও ভুল করছ ছায়া রায়।

বলতে বলতে আর একটা যন্ত্রণা চাপতে চাপতে যেন বিবর্ণ হয়ে যায় ভবনাথের মুখের চেহারা।

ছায়া রায়—কিসের ভুল?

ভবনাথ—এলাহাবাদে যে সুশোভন রায়কে দেখে এলাম, তিনি সত্যিই এ বাড়ির সুশোভনবাবু কি না, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ হচ্ছে।

ছায়া রায়—বাঁ কানের কাছে আঁচিল নেই?

ভবনাথ—না।

ছায়া—সব সময় নাম জপ করেন না?

ভবনাথ—তা তো মনে হয় না।

ছায়া—খুব ফরসা আর লম্বা চেহারার মানুষ?

ভবনাথ—না, মোটেই ফরসা নন আর লম্বাও নন।

ঝর ঝর্ ক'রে ছায়া রায়ের দু'চোখ থেকে জল ঝরে পড়ে।—তবে আপনি মিছিমিছি কেন এলেন?

ভবনাথ—হ্যা, ভুল হয়ে গিয়েছে, এতটা ভেবে দেখি নি।

চুপ ক'রে থাকে ছায়া রায়। ভবনাথ বলে—এখন তবে তুমিই বলো ছায়া রায়, আমি কি করতে পারি।

ছায়া—আমার বাবাকে খুঁজে বের করুন।

ভবনাথ—কোথায় যেতে পারেন, কোথায় থাকার সম্ভাবনা, এ রকম কিছু একটু না জানা থাকলে কেমন ক'রে কোথায় খুঁজব?

ছায়া রায়—বাবা গঙ্গায় স্নান করতে ভালবাসেন, কালীঘাটের মন্দিরে আরতি দেখতে ভালবাসেন।

ভবনাথ—গঙ্গার ঘাটে আর কালীঘাটের মন্দিরে গিয়ে তোমরাই খোঁজ কর না কেন?

ছায়া রায়—করেছি, কিন্তু সাক্ষাৎ পাই নি। আর, রোজই তো যাওয়া যায় না, সাধ্যিও নেই। তা'ছাড়া, এসব খোঁজাখুঁজি আর নানা জায়গায় দৌড়া-দৌড়ির কাজ কি মেয়েদের পক্ষে সম্ভব?

ভবনাথ—চেষ্টা করব আমি?

ছায়া রায়—করুন।

ভবনাথ—বেশ, এবার চলি ছায়া রায়।

ছায়া রায়—আসুন।

খুবই শান্ত স্বরে, একটুও বিস্মিত ও দুঃখিত না হয়ে ভবনাথকে বিদায় বাণী শুনিয়ে দিচ্ছে একশো উনপঞ্চাশের সি। একেবারে ধীর স্থির আর শান্ত হয়ে রয়েছে ছায়া রায়ের ছায়া। কোন উৎসাহ আর বাজে না ছায়া রায়ের কণ্ঠস্বরে, কোন আশা আর চমকে ওঠে না ছায়া রায়ের চোখে।

চলে যাবার জন্যই প্রস্তুত হয় ভবনাথ। কিন্তু ভবনাথের বুকের ভিতরেই কাঁটার আঘাতের মতো তীক্ষ্ণ একটা খোঁচা লাগে যেন। একেবারে ব্যর্থ হয়ে আর হেরে গিয়ে পালিয়ে যেতে হচ্ছে ভবনাথকে, কিন্তু একেবারে কিছুই না নিয়ে গিয়ে এত ভয়ানক ভাবে শূন্য হয়ে চলে যেতে চায় না মন। দাবী জানবে না হয় আর একটা মিথ্যার দাগ পড়ুক, ঐ মাটির দোয়ানে আঁকা কয়লার আঁচড়ের মত একটা দাগ।

ছায়া রায়ের চোখ জলে ধোওয়া কাঁচের মতো চক্‌চক্ করে। আর ভবনাথ তাকিয়ে থাকে, আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে থাকা মানুষের মত অতিদূরের মোহে মুগ্ধ দুটি চক্ষু তুলে, ছায়া রায়ের মুখের দিকে। হঠাৎ প্রশ্ন করে ভবনাথ—তোমার বাবাকে যদি খুঁজে নিয়ে আসতে পারি ছায়া রায়?

ছায়া রায়—আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

ভবনাথ—তার মানে?

উত্তর দেয় না ছায়া রায়। ভবনাথ যেন তার এই অন্ধকারে ঢাকা স্নিগ্ধ জীবনেরই পাথরে চাপা পড়া এক দুর্লভ লোভের ব্যাকুলতা সহ্য করতে না পেরে চেঁচিয়ে ওঠে—বল ছায়া রায়।

ছায়া রায় বলে—আপনি যা মনে করেন তাই।

ভবনাথ—ঠিক তো?

ছায়া—হ্যাঁ।

ভবনাথ—কোন আপত্তি নেই তোমার মনে?

ছায়া—একটুও না।

ভবনাথ—তোমার মা যদি আপত্তি করেন?

ছায়া—কোন আপত্তি করবেন মা? আপনিও তো ব্রাহ্মণ।

আর কোন প্রশ্ন নেই। যেন ছায়া রায়ের এই শেষ কথার মধুরতা মুহূর্তের মধ্যে বুকের ভিতরে লুকিয়ে ফেলেছে ভবনাথ, পাকা চোর যেমন সোনার হার গিলে ফেলে।

আর মুখ ফিরিয়ে একবার তাকায়ও না ভবনাথ। হনহন ক'রে, যেন এই পৃথিবীর কোন কাঁটার ঝোপে লুকিয়ে পড়ার জন্য ব্যস্তভাবে চলে যায় ভবনাথ।

কালীঘাটের মন্দিরের আরতি যখন শেষ হলো, আর মন্দিরের বড় দরজা দিয়ে শেষ দর্শকও যখন বের হয়ে চলে গেল, তখন আর একবার চমকে উঠলো ভবনাথ। ছায়া রায়ের নিরুদ্দিষ্ট বাবাকে সত্যিই যে খুঁজতে এসেছে ভবনাথ। কি আশ্চর্য, এ আবার কোন্ মূর্খতার খেলা, অকারণে একটা ছায়ার অনুরোধের জন্য এত সময় নষ্ট করা? শুনলে কালীশ যে হো হো ক'রে হেসে উঠবে।

কিন্তু কালীশ নিশ্চয়ই জানে না যে, নিমেরও মধু হয়, নিমের বিষতেতো বুকের ভেতরেও... যাক্ গে। এসব কথা কালীশকে ব'লে কোন লাভ হবে না, বেটা বিশ্বাসই করবে না।

কিন্তু বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে ভবনাথের। গিলে ফেলা সোনার হারের মতো একটা আশা যেন থেকে থেকে আর কচ্‌কচ্‌ ক'রে কষ্ট দিচ্ছে গলার ভিতরটাকে। মনে হয়, এইভাবেই রোজ সন্ধ্যায় যদি এখানে আসা

যায়, তবে নিশ্চয়ই একদিন আরতির আলোকে হঠাৎ দেখে ফেলবে ভবনাথ, ছায়া রায়ের বাবা সুশোভনবাবু, গায়ে গরদের চাদর জড়ানো লম্বা ফরসা সুশোভনবাবু দাঁড়িয়ে আছেন।

যাই হোক্, আজ এখানে কোন কাজ নেই। আবার কাল সন্ধ্যা। এখন বরং কালীশের কাছে গিয়ে, আর এক কাপ গরম চা দিয়ে গলাটা ভিজিয়ে নেওয়াই ভাল। কালীশটাও নিশ্চয় এতক্ষণে নানা দুশ্চিন্তা করতে শুরু ক'রে দিয়েছে। চলতে থাকে ভবনাথ।

চায়ের দোকানে ভবনাথ ঢুকতেই কালীশ বলে—যাক্, খুব বেঁচে গেলি ভব। আর একটু দেরি করলেই নির্ঘাৎ হাতে হাতে ধরা পড়ে যেতিস।

ভবনাথ—ধরা পড়বো কেন রে বেটা?

চায়ের দোকানের টেবিলের উপর থেকে খবরের কাগজটা তুলে নিয়ে এসে কালীশ বলে—এই দেখ!

শূন্য দৃষ্টি তুলে খবরের কাগজেরই বুকের এক জায়গায় একটা শূন্যতার দিকে তাকিয়ে থাকে ভবনাথ। ছায়া রায়ের আবেদন, সেই ছোট 'সন্ধান চাই' বিজ্ঞাপনটা ছুরি দিয়ে পরিষ্কার করে কে যেন কেটে নিয়ে চলে গিয়েছে।

ভবনাথ—এ কি ব্যাপার কালীশ?

কালীশ—হেড মাস্টার আশুবাবু ঐ বিজ্ঞাপন কেটে নিয়ে গিয়েছেন। তাঁরই বাড়ীতে আছে হারানো লোকটা। এতক্ষণে বোধ হয় লোকটাকে একেবারে তার বাড়ীতে নিয়ে গিয়েই ফেলেছেন।

চুপ ক'রে বসে থাকে ভবনাথ।

কালীশ প্রশ্ন করে—চা খাবি?

—না।

—কেমন দেখলি, বেশ বড়লোকের বাড়ি?

—মোটেই না।

—কিছু হাতড়াতে পারলি?

—কিচ্ছু না।

—তাহলে স্রেফ ...।

—স্রেফ ঠকে এসেছি মাইরি।

সুনিকেতা

কলকাতার পল্লী। লেক দূরে নয়। কংক্রিটের 'নীলকমল'। বিরাট চারতলা। কাঁচা দুধের মত রঙ। শেষ চৈত্রের সন্ধ্যা। গুলমোহরের মাথায় জ্বলন্ত সোনা। ছোট ছোট ঝড় উড়ে যায়।

বেড়িয়ে ফেরে সেই মহিলা আর সেই ভদ্রলোক। মহিলার বয়স পঁচিশ হতে পারে, পঁয়ত্রিশও হতে পারে। কিন্তু ভদ্রলোকের বয়স কোনমতেই পঁয়ত্রিশের বেশি হতে পারে না। মহিলা দেখতে সুন্দর, কিন্তু ভদ্রলোক মহিলার তুলনায় অনেক বেশি সুন্দর। আজ প্রায় [illegible] বছর ধরে প্রতি সন্ধ্যায় ঠিক এই ভঙ্গীতেই দু'জনে নিবিড়ভাবে দু'জনের হাতে হাত জড়িয়ে আর ধীরে ধীরে হেঁটে নীলকমলের ফটকের সামনে এসে থেমেছে।

ফটকের কাছে এত কড়া একটা আলো জ্বলে, কিন্তু সেই আলোকের অস্তিত্বই যেন ওরা স্বীকার করে না। মহিলার পিঠের উপর একটা হাত আদরের ভঙ্গীতে তুলে দিয়ে ভদ্রলোক চাপা গলায় কি যেন বলে। প্রত্যুত্তরে শুধু মৃদু একটি ভ্রূকুটি করে মহিলা। তারপরেই মহিলার কানের কাছে মুখ এগিয়ে দিয়ে ফিস্ ফিস্ স্বরে আরও কি-সব বলতে থাকে ভদ্রলোক। মনে হয়, ভদ্রলোকের দুই ঠোঁট যেন মহিলার কানের দুল ছুঁয়ে কথা বলছে।

ঝক্ ক'রে হেসে ওঠে মহিলার চোখ। মাথা দিয়ে আস্তে একটা ধাক্কা দেয় ভদ্রলোকের কাঁধে। হো হো ক'রে হেসে ওঠে ভদ্রলোক। মহিলা বেশ জোরে গলা ছেড়েই বলে—হোপলেস! তার পরেই মুখের উপর রুমাল চেপে মহিলা তার নিজেরই মুখর হাসির উচ্ছ্বাসটাকে একটু লাজুক করে তোলে।

তারপরেই বাহুবদ্ধ দুটি পুলকিত মূর্তি তরতর ক'রে নীলকমলের সিঁড়ি ধরে উপরে উঠতে থাকে। এবং তারপরেই তিন তলার একটি ছোট ফ্ল্যাটের একটি ঘরে দপ্ ক'রে আলো জ্বলে ওঠে। গোলাপী রঙের আলো।

এ ফ্ল্যাট আর ও ফ্ল্যাটের জানালায়, পাশের বাড়ির ছাতের রেলিং-এর কাছে, এমন কি রাস্তার ওপারে দুটো বড় বড় দোতলা বাড়ির বারান্দায় সারি সারি সতর্ক ক্যামেরার মত যেসব জোড়া জোড়া চোখ এতক্ষণ ধরে ফটকের আলোকে আলোকিত দৃশ্যটাকে লক্ষ্য করছিল, সেসব চোখের

কৌতূহলও এইবার উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে আর গলা টান ক'রে তিনতলার ফ্ল্যাটের গোলাপী রঙের আলোকে আলোকিত দৃশ্যটাকে দেখবার চেষ্টায় ছটফট করতে থাকে। কিন্তু বিশেষ কিছু দেখা যায় না, বোঝা যায় না, অনুমান করা যায় না। শুধু দপ্ ক'রে আর একবার আলোর রঙ বদলায়। ফিকে বেগুনী রঙ।

কিছু বরং দেখা যায় আর বোঝা যায় রাস্তার এ ফুটপাথে না দাঁড়িয়ে ও ফুটপাথে দাঁড়ালে। দুটো গুলমোর মাথা উঁচু ক'রে নীলকমলের তিনতলার ঐ রঙীন ঘরের জানালা দুটো প্রায় ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বাতাসের উপদ্রবে গুলমোরের মাথা এদিক ওদিক একটু কাৎ হ'লেই দেখা যায়, দেয়ালে দুটো রঙীন ফটো পাশাপাশি ঝুলছে, সাদা সরু ফ্রেমে বাঁধানো, বোধ হয় হাতীর দাঁতের ফ্রেম। মেহগনির একটা শীর্ণ ও ঋজু স্ট্যাণ্ডের উপর একটা কাশ্মীরী সুরাহি, পিতলের উপর সোনার কাজ করা। তার মধ্যে রজনীগন্ধার লম্বা লম্বা ডাঁটা, ডাঁটার মাথায় ঘুমন্ত কুঁড়ি। কুঁড়িগুলি ফুটলেই ফটো দুটিকে ছুঁয়ে ফেলবে বোধ হয়।

ঘরের মাঝখানে একটা খাট, খাটের উপর ঝক্‌ঝকে রঙীন সাটিনের ঢাকা। তার উপর পৃথিবীর কোন মানুষ কোনদিন বসবে বলে বিশ্বাস হয় না, এমনই নিখুঁত যত্নে সাজিয়ে-গুছিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে খাটের বিছানার কোমলতা। বড় আয়নার বুকে আলো-ঝলসানো গুলমোরের সোনালী প্রতিচ্ছায়া কখনো কাঁপে কখনো দোলে। আরও আসবাব আছে এইটুকু ঘরের মধ্যেই। কিন্তু সবই যেন ছবির মত আঁকা। নড়চড় নেই, ওলট-পালট নেই। প্রায় এক বছর ধরে ঠিক এইভাবেই সাজানো। কোন আগন্তুক এ ঘরের দরজার কড়া নাড়ে না, ঘরে প্রবেশও করে না। আজ পর্যন্ত তৃতীয় কোন ব্যক্তিকে এ ঘরের মধ্যে কখনো দেখা যায় নি। মনে হয় ঐ দু'জনেরই প্রাণের রঙে পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে এই ঘর, আর একটুও জায়গা নেই। তৃতীয় কোন প্রাণ প্রবেশ করলেই এই ঘরের সব রূপের ছন্দ এলোমেলো হয়ে যাবে।

যখন ঘরের পাখা খুব জোরে ঘোরে, তখন এ জানালার দিকে তাকালে দেখা যায়, রঙীন শাড়ির আঁচলের একটুখানি অংশ ফুরফুর করে উড়ছে। আর ও জানালার দিকে তাকালে দেখা যায়, সিল্কের কামিজের আধখানা আস্তিন এবং ঘড়িবাঁধা একটি কব্জি। যেন এক অর্ধনারীশ্বরের মূর্তির ডান

আর আর বাম দেহভাগের আভাস মাত্র দেখা যায়। বুঝতে অসুবিধা হয় না, দুই জানালার মাঝখানের ঐ দেয়ালটুকুর ওপাশে নিশ্চয়ই ভেলভেটে মোড়া ছোট একটি কৌচ আছে এবং সেই কোচের উপর অন্তিঘনিষ্ঠ হয়ে বসে আছে সেই ওরা দু'জন, যারা প্রতি সন্ধ্যায় একখণ্ড অতিনাটকীয় প্রগলভতার মত বাইরে থেকে বেড়িয়ে ফেরে এবং জড়াজড়ি আর ঢলাঢলি করতে করতে নীলকমলের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে যায়।

প্রায় এক বছর হলো এই ফ্ল্যাটে রয়েছে ঐ মহিলা আর ঐ ভদ্রলোক, কিন্তু নীলকমলের কোন ফ্ল্যাটের কোন মানুষই ওদের পরিচয় জানে না। ভবনের দারোয়ান ছাড়া ওদের নামও বোধ হয় কেউ জানে না। এক বছর ধরে এই পাড়ার সবারই চোখে এত প্রত্যক্ষ হয়েও পাড়ার কাছে ওরা দু'জনে আজ পর্যন্ত অপরিচিতই রয়ে গিয়েছে। সতিই দুটি রঙীন ফটোই বাস করে তিনতলার এই ফ্ল্যাটের এই ঘরটিতে। এক বছরের মধ্যে এই ভবনের আর এই পাড়ার কোন মানুষের সঙ্গে ওরা দু'জনের একজনও কখনও একবার ভুলেও আলাপ করে নি।

পাড়ার সকলেই অবশ্য এইটুকু জানে যে, মহিলা কোথাও চাকরি করেন। প্রতিদিন সকাল দশটার সামান্য কিছু আগেই একটা স্টেশন ওয়াগন এসে থামে নীলকমলের ফটকে। কোন বড় সদাগরী অফিসেরই গাড়ি বলে মনে হয়, কারণ ড্রাইভারের উর্দি বেশ জমকালো ধরনের। তিনবার হর্ন বাজতেই মহিলা নেমে আসেন। গাড়ির ভিতর আরও কয়েকজন অফিসযাত্রিণী মহিলাকে সুসজ্জিত বেশে বসে থাকতে দেখা যায়। কিন্তু এ মহিলা যে-রকম জাঁকালো সাজে সেজে অফিসে যান, কোন বাজার বাড়ীর বিয়ের উৎসবে যেতে হলেও সেরকম জাঁকালো সাজে সাজবার দরকার হয় না।

অফিসের গাড়ি আসামাত্র এ ফ্ল্যাট আর ও ফ্ল্যাটের জানালায় কৌতূহলী কতগুলি নারীচক্ষুর সমাবেশ দেখা যায় এবং গাড়ি স্টার্ট নেওয়া মাত্র চারদিকের বাতাসে ফিসফিস স্বরে একটা মন্তব্য ধ্বনিত হ'তে থাকে।— শাড়ির গাছ আছে বোধ হয়।

মন্তব্যটা অহেতুক নয়। অনেকেই লক্ষ্য করেছে এবং আশ্চর্য হয়েছে, আজ পর্যন্ত এ মহিলাকে এক শাড়ি পর পর দু'দিন পরতে কখনো দেখা গেল না।

ঐ ভদ্রলোক সম্বন্ধেও একটা তথ্য এখন আর কারও অজানা নেই। ভদ্রলোক কিছুই করে না। সারা দুপুরে ঘরেই থাকে।

তিনতলার ফ্ল্যাটের ঐ একটি মাত্র ঘর। ভিতরের দিকে সরু এক ফালি বারান্দা। কিন্তু কি তকতকে ঝকঝকে ও রঙীন একটি নীড়। একেবারে নিখুঁত পরিপাটি। ধোঁয়ার চিহ্ন এ ফ্ল্যাটে কখনো দেখা যায় না, কারণ রান্নাবান্নার কোন নোংরা ঝঞ্ঝাট এখানে নেই। দু'বেলাই হোটেল থেকে খাবার আসে। চাকরবাকরও নেই। ভদ্রলোক সারা দুপুর ধরে ঘুমোবার পর, বিকেল হতে হতেই জেগে ওঠে এবং ঝাড়পোছ করে রঙীন নীড়ের নিখুঁত পারিপাট্য সজীব ক'রে রাখে। মহিলা অফিস থেকে ফেরবার আগেই ভদ্রলোক একবার নীচে নেমে আসে। সিল্কের টানা কোট পায়জামা আর বাঘছালের চটি, এই সাজেই কত সুন্দর দেখায় ভদ্রলোককে। হেঁটে হেঁটে মাত্র রাস্তার ঐ মোড় পর্যন্ত এগিয়ে যায় এবং ফিরে আসে রজনীগন্ধার একগুচ্ছ ডাঁটাসুদ্ধ কুঁড়ি নিয়ে। এ ছাড়া আর কোন কাজ করতে ভদ্রলোককে কেউ কখনো দেখে নি।

তার পর, এবং মহিলা অফিস থেকে ফিরে আসার পর, বেড়াতে যাবার পর্ব। ভদ্রলোক শার্ট ট্রাউজার আর টাই পরে এবং মহিলা বিচিত্রা হয়ে ওঠে তার খোঁপার বৈচিত্র্যে। অফিস যাবার সময় যেমন শাড়িতে, বেড়াতে যাবার সময় তেমনি খোঁপাতে, দুটো দিন কখনো মহিলাকে একটি রকম হতে দেখা গেল না। কাল দেখা গিয়েছিল, সরু স্প্রিং-এর মত কি-একটা বস্তু দিয়ে খোঁপাটা জড়ানো। স্প্রিং এর মুখগুলি হলো ফণাতোলা সাপের মুখ, শিউরে শিউরে দোলে! আজ দেখা গেল, মস্ত বড় একটা রূপোর প্রজাপতি খোঁপা কামড়ে পড়ে আছে। যেন পরাগ খুঁজছে প্রজাপতি, তারই আনন্দে পাখা দুটো কাঁপছে।

কে ওরা? এই পাড়ার মধ্যে এটা একটা মস্ত বড় প্রশ্ন। কিন্তু এই প্রায় এক বছরের মধ্যে এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল না। রহস্য, রহস্য হয়েই রয়েছে। মহিলার সিঁথিতে সিঁদুরের দাগও দেখা যায় না। এটাও বা কোন রহস্য? এ কি শুধু একটা স্টাইল?

কে জানে, প্রথম কে কথাটা বলেছিল, কিন্তু এখন এ পাড়ার সর্বত্রই কথাটা ভাল করেই রটে গিয়েছে যে, নালকমলের তিনতলার ফ্ল্যাটের ঐ ঘরে থাকে এক কিন্নর আর এক কিন্নরী।

দপ্ ক'রে আর একবার আলোর রঙ বদলায়। তিনতলার ফ্ল্যাটের ঘর সবুজ হয়ে যায়। পাশের বাড়ির ছাদে রেলিং-এর কাছে অনেকগুলি

ঘোমটা বেণী ও খোঁপা ব্যস্তভাবে আলোচনা করে—যারা স্বামী-স্ত্রী নয়, তাদেরই বলে কিন্নর আর কিন্নরী।

রাত আর একটু কালো হয়। আর একটু সাদা হয়ে ফোটে আকাশের তারা। একটা উতলা বাতাস। লেকের জলে আলো কাঁপে। গুলমোর চঞ্চল। তার চেয়ে আরও বেশি চঞ্চল আশেপাশের বাড়ির ছাদে নানা বয়সের চোখের তারা। তিনতলার ফ্ল্যাটের ঐ রঙীন ঘরের কোচ থেকে উঠে ঝকমকে সাটিনে ঢাকা খাটের উপর এসে বসেছে সেই দুটি মূর্তি, যাদের নাম আজও কেউ জানে না।

নাম হলো, বীথিকা রায় আর পরিমল রায়। আজ এক বছর হলো ওদের বিয়ে হয়েছে এবং বিয়ে হবার পর থেকেই নীলকমলের তিনতলার ফ্ল্যাটের এই ঘরটিতেই রঙীন নীড় রচনা ক'রে দু'জনে আছে। কেউ ওদের দিকে তাকিয়ে দেখছে কি না, একটু তাকিয়ে দেখবার গরজও যেন ওদের নেই। দু'জনের চোখ দু'জনের মুখ দেখে মুগ্ধ হবার জন্য সারাক্ষণ ব্যস্ত হয়ে রয়েছে, অন্যদিকে তাকাবার সময় কই, দরকারই বা কি?

দু'জনেরই জীবনের কল্পনা সত্য হয়েছে। যেন ধুলোবালির পৃথিবীতে দুটো অজ্ঞাণতিকী কল্পনা তৃষ্ণার্ত চক্ষু নিয়ে মনের মত সাথী খুঁজে বেড়াচ্ছিল। নিতান্ত আকস্মিকভাবেই সেই দুটি কল্পনার একদিন মুখোমুখি দেখা হলো। এবং কল্পনা সত্য হবে আর সাথী হয়ে উঠতে আর বেশি সময় নিল না। তার প্রমাণ, তিনতলার ফ্ল্যাটের এই রঙীন ঘরটি, বীথিকা রায় আর পরিমল রায়ের জীবনের নীড়।

স্বামী দেখতে সুন্দর হবে, এই ছিল বীথিকার মনের সব চেয়ে বড় দাবি। সেই যখন কলেজের পড়া শেষ হয়নি, তখন থেকেই। বিয়ের প্রস্তাব এসেছে অনেকবার, কিন্তু প্রত্যেকবারই সে প্রস্তাব ব্যর্থ হয়েছে, বীথিকা তার জীবনের একমাত্র স্বপ্নের মতো সেই একান্ত দাবিকে একটুও ছোট করতে রাজি হয়নি।—পাত্রের চেহারা ভাল নয়, ও চেহারা চলবে না, স্পষ্ট ক'রে প্রতিবাদ জানিয়ে দিতে একটুও দ্বিধা করে নি বীথিকা। তিন বছর আগে শেষবারের মত একটা বিয়ের প্রস্তাব এনেছিলেন বড়দা; এবং চাকরিটা তখন সবেমাত্র শুরু করেছে বীথিকা। সেই প্রস্তাবও অনায়াসে একটি কঠিন ভ্রূভঙ্গির আঘাতে আর মুখ ঘুরিয়ে তুচ্ছ ক'রেছিল বীথিকা। সেই শেষ, বড়দা আর কখনো বীথিকার বিয়ের কথা উচ্চারণও করেন নি।

বড়বৌদি একটু বিরক্ত হয়েই বলেছিলেন—জয়ন্তের চেহারাও তোমার ভাল লাগছে না? জয়ন্ত দেখতে খারাপ? আশ্চর্যই করলে তুমি!

বীথিকা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়—ওরকম চেহারা হাট-বাজারে অনেক দেখা যায়।

বড়বৌদি—শুধু চেহারাই কি সব? গুণ চরিত্র রোজগারও তো দেখতে হয়।

বীথিকা—ওসব কিছু দেখতে চাই না।

একথা শোনার পর বড়বৌদি বীথিকার মুখের দিকে তাকিয়ে একেবারে চুপ ক'রেই গিয়েছিলেন। কে জানে, এই মেয়ের চোখের মধ্যে কোন্ পিপাসা লুকিয়ে রয়েছে! পৃথিবীর হাটে-বাজারে সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না, এমনই এক দুর্লভ রূপের পুরুষকে জীবনের সঙ্গী করতে না পারলে এই মেয়ের ঐ দুই বাঁকা ভুরুর কঠিন ভঙ্গি কখনো শান্ত হবে না। কিন্তু এত বড় স্বপ্ন পূর্ণ হবে কি? এমন রূপসী তুমি নও যে রূপেশ্বরেরা তোমার জন্য তপস্যা ক'রে বসে আছে। তোমার চেয়ে অনেক বেশি রূপসী পৃথিবীতে আছে, কলকাতার এই পাড়াতেই আছে, ঢের ঢের আছে।

বড়বৌদির নীরব অভিযোগটা যেন বড়বৌদির তাকাবার ভঙ্গি দেখেই বুঝতে পারে বীথিকা এবং তার জীবনের সব চেয়ে বড় দাবির উপর পরের মনের এই উপদ্রবের একটা হেস্তনেস্ত করে দেয় সেই মুহূর্তেই।— আমার স্বামী হবার মতো মানুষ খুঁজে নেব আমি। পাই ভাল, না পাই তা'ও ভাল। তোমরা আর খোঁজাখুঁজি করো না।

পরিমল রায়ের বাসনাও ঠিক এমনটিই দেখিল।

শুধু বড়লোকের একমাত্র ছেলে বলতে যে গুণ বোঝায়, সেই গুণ তিন বছর আগে পরিমল রায়েরও ছিল। বাপের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সেই গুণের গৌরবও শেষ হয়েছে। তাই স্কুলের মাত্র কয়েকটা ক্লাশ পর্যন্ত বিদ্যাটা এগিয়েছিল পরিমলের, তারপরেই রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। সে সব অনেক বছর আগের কথা। দু' বছর আগে পরিমল রায়ের বাপের দেওয়া বাড়িটা যেদিন দেনার দায়ে নিলামে বিকিয়ে গেল, সেদিন পরিমলকে দেখতে গিয়ে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল বন্ধুর দল। সেদিনও চাকরে তেল মাখিয়ে স্নান করিয়ে দিচ্ছিল পরিমলকে। কাজ ক'রে হাত-পা'কে কষ্ট দিতে শেখে নি পরিমল। ও অভ্যাসটা পরিমলের বংশমর্যাদাতেই বাধে।

কিন্তু বন্ধুদের মেসে বন্ধুদেরই করুণার গলগ্রহ হয়ে একটি বছর পার ক'রে দিতে পরিমল রায়ের বংশমর্যাদায় অবশ্য কিছুই বাধে নি।

বন্ধুরা অনুযোগ করত—এক বছর ধরে চেষ্টা ক'রে একটা কাজ যোগাড় করতে পারলে না, এ কেমন কথা হে?

পরিমল বলে—চেষ্টা করতেই জানি না ভাই। তা ছাড়া, যা-তা একটা কাজ নিয়ে ফেললেই তো হয় না। প্রেষ্টিজ ব'লেও তো একটা বস্তু আছে!

বন্ধুরা বিস্মিত হয়, সহ্যও করে এবং একদিন বিদ্রূপ ক'রেই বলে—তুই কোনমতে একবার হলিউডে চলে যা।

—কি হবে গিয়ে?

—লুফে নেবে তোকে, ঐ রকম একটা চেহারা হলিউড দেখতে পেলে কি আর রাক্ষ আছে?

বন্ধুদের ঠাট্টা বুঝতে পারে পরিমল, কিন্তু এটাও বিশ্বাস করে যে, নেহাৎ মিথ্যা বলে নি বন্ধুরা। চেহারা আছে পরিমলের, এবং সে চেহারা তাকিয়ে দেখবার মত। রূপই তো একটা গুণ, আর পরিমলের মুখের দিকে তাকালে মনে হবে শ্রেষ্ঠ গুণ। পরিমলের রূপের খুঁত অনেক খুঁজে বের করতে হয়। বন্ধুরা জানে, এবং পরিমলও এখনো ভুলে যায় নি, পাড়ার ক্লাবের ছেলেরা পরিমলকে অ্যাপোলো'দা বলে ডাকে। চাঁপার কলির মত নয়, চাঁপার কলির চেয়েও সুন্দর-গড়ন আঙ্গুল যদি দেখতে হয়, তবে দেখতে হবে পরিমলের আঙ্গুলকে। আঙ্গুলের রূপের গুণে আংটিটাও কত সুন্দর দেখায়। পরিমল জানে, সে কত সুন্দর। এবং আশ্চর্য হয়, তার এই চেহারার উপযুক্ত মূল্য ও মর্য্যাদা দেবার মত একটা প্রাণ নেই এই পৃথিবীতে? এমন সম্পদ থাকতেও কি একটা কাজের চাকর হয়ে জীবন কাটাতে হবে? এই শ্যামল বিধুভূষণ আর দেবব্রতের মতো?

পরিমল বলে—পাঁচ হাজার টাকা দাও, এখনি হলিউডে চলে যাচ্ছি।

বন্ধুরা বলে—হলিউড কি শুধু আমেরিকাতেই থাকে? এই কলকাতার পথে পথেই আছে। দোষ ই তোমার, তুমি মেসের এই ঘর ছেড়ে পথে একটু বের হও দেখি।

পরিমল—তাতে কি লাভ হবে?

বন্ধুরা বলে—খুব হবে, একদিন না একদিন কোন হলিউডের চোখে পড়ে যাবে, এবং তারপরেই নির্ঘাৎ•।

পরিমল—তোমাদের রসিকতা ঠিক বুঝতে পারছি না।

বন্ধুরা তাদের রসিকতার রহস্য এইবার বেশ ভাল করে বুঝিয়ে দেয়। —তারপর আর কি ? হলিউডই খাওয়াবে পরাবে, রাজার চেয়ে বেশি মজার হালে থাকবে।

গম্ভীর হয় পরিমল। বন্ধুরা রসিকতার ছলে যেন তার মনের সব চেয়ে বড় দাবির স্বপ্নটাকেই চেঁচিয়ে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নোংরা ক'রে দিচ্ছে। এ স্বপ্ন যে তার সত্তার মধ্যে মিশে রয়েছে। পৃথিবীর এক নারী পরিমলের এই রূপধন্য পৌরুষকে যেচে বরণ ক'রে তারই ঘরে নিয়ে যাবে। আর কোন ভাবনা থাকবে না পরিমলের জীবনে। সব ভার তার, সেই প্রেমিকা নারীর। কাজের চাকর হয়ে থাকার বদলে রূপের দেবতা হয়ে থাকা সে-জীবনের গর্ব গৌরব ও পৌরুষ তার কল্পনার বুকে কাণ রেখে অনুভব করতে পারে পরিমল। কিন্তু যাক্, কল্পনার কথা বন্ধুদের রূঢ় ভাষায় আলোচনা থেকে দূরে রাখা আর গোপন রাখাই ভাল।

কিন্তু বন্ধুদের একটি অনুরোধ রক্ষা করেছিল পরিমল। মাঝে মাঝে মেসের ঘর থেকে বের হয়ে পথে এসে দাঁড়াত, তারপর যতটুকু হাঁটতে এবং যেখানে যেতে ভাল লাগত, তার বেশি ঘোরাফেরা না ক'রে মেসে ফিরে আসত। এই-ভাবেই একদিন এবং অকস্মাৎ চোখে দেখার ছোট একটা ঘটনা শুধু ঘটে গেল। বীথিকা আর পরিমলের সাক্ষাৎ। সে ঘটনার একমাত্র সাক্ষী হলো ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের শ্বেতপাথরের সিঁড়ি, এবং তার পরের ক'দিনের ইতিহাস মাত্র ওরা দু'জনই জানে। তারপরেই বিয়ে, যথারীতি বৈবাহিক রেজিস্ট্রারের খাতায় সই করে, সাক্ষী রেখে, আইন অনুসারে। এবং তারপরেই নীলকমলের তিনতলার ফ্ল্যাটের এই রঙীন ঘর।

বীথিকা রায় আর পরিমল রায়! রূপের আর কামনার জীবনকে সুন্দর ক'রে আর অনন্ত ক'রে রাখবার এক অপার্থিব শিল্প যেন ওরা জানে। ধুলো কাঁটা আর সমস্যায় ভরা এই পৃথিবীর কোন কুঞ্জে চিরবসন্ত জেগে থাকে কি না কে জানে, কিন্তু বীথিকা রায় আর পরিমল রায়ের হাসিতে নিঃশ্বাসে ও দৃষ্টিতে চিরবসন্তের আমোদ এসে বাসা বেঁধেছে। ওরা দু'জনেই সত্যিই বিশ্বাস করে, ওদের জীবনের এই রঙ কখনো ফিকে হবে না, ফুরোবে না, ঝরে পড়বে না। দু'জনে প্রতিমুহূর্ত দু'জনের মুখের দিকে তাকিয়ে আর মুগ্ধ হয়ে এ-জীবনকে এক খণ্ড হলিউড ক'রে রাখবে।

গুলমোর শান্ত। লেকের জলে তারার ছায়া। চারদিকের শব্দ প্রায়

লুকিয়ে পড়েছে। ভদ্রলোক হঠাৎ যেন চমকে ওঠে, এবং পরমুহূর্তে মহিলার কাছ থেকে বেশ তফাতে সরে গিয়ে, মহিলার মুখের দিকে তাকিয়ে পাথরের মূর্তির মত স্তব্ধ হয়ে থাকে।

পাশের বাড়ির ছাদে আর সামনের বাড়ির বারান্দার উপর সতর্ক চক্ষুর ক্যামেরাগুলি বিব্রত হয়, বিস্মিত হয় এবং বিরক্ত হয়। এ আবার কোন্ দৃশ্য! আজ প্রায় এক বছরের মধ্যে কোন দিন কোন মুহূর্তেও ঐ কিন্নর আর কিন্নরীকে তো এতটা তফাৎ হয়ে যেতে, আর ঐ ভঙ্গীতে স্তব্ধ হয়ে থাকতে কখনো দেখা যায় নি। নিতান্তই আকস্মিক, অভাবিত এবং বিসদৃশ। চোখের ক্যামেরাগুলি আশাভঙ্গের বেদনা নিয়েই ঘুমোতে চলে যায়।

বীথিকা বলে—ওরকম করে চমকে উঠলে কেন? ওভাবে বোবার মত তাকিয়ে থেকেই বা কি লাভ হচ্ছে? ছিঃ।

পরিমল—শুনতে ভাল লাগল না তোমার কথাগুলো।

বীথিকা—আমার কথাগুলো শুনতে ভাল লাগল না? আশ্চর্য!

পরিমল—আজ ওসব কথা নাই বা আলোচনা করলে। কাল ব'লো। কারণ আমি এখনি কি বলব, ঠিক ভেবে পাচ্ছি না।

বীথিকা—তুমি ভাববে কেন? তোমাকে ভাবতে বলছেই বা কে? আমি শুধু জানতে চাইছি, এরকম কোন ডাক্তার তোমার জানা আছে কি না?

এক টান দিয়েই গলার বউীন টাই এর গেরো কস্ করে খুলে ফেলে পরিমল। জোরে একটা নিঃশ্বাস ছাড়ে।

বীথিকা—উত্তর দিচ্ছ না যে?

পরিমল—জানা আছে, এণ্টালির প্রকাশ ডাক্তার এসব করেন ব'লে শুনেছি।

বীথিকা—তাহ'লে প্রকাশ ডাক্তারকেই কাল ডেকে নিয়ে এসো।

পরিমল—তার জন্য এখনি এত ব্যস্ত হয়ে উঠছ কেন? আর দু' একটা দিন ভাল করে ভেবে দেখ, তার পরেও যদি বোঝ যে…।

বীথিকা—ভেবে দেখবার আর কি আছে? যত তাড়াতাড়ি পারা যায় পরিষ্কার হয়ে যাওয়াই ভালো।

আর একবার চমকে ওঠে পরিমল। হাত ঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে এবং মুখে হাসি টেনে নিয়ে বলে—গান গাইবার সময় তুমি হঠাৎ এ কোন্ প্রসঙ্গ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠলে? এখন ওসব কথা থাক। নাও, এসরাজটা নিয়ে বসো।

এসরাজটা তুলে নিয়ে এসে বীথিকার কোলের উপরেই তুলে দেয় পরিমল। অন্যমনস্কের মত এক হাতে এসরাজটাকে ধরে কোলের উপর থেকে তুলে নিয়ে পাশে রেখে দেয় বীথিকা। অপ্রস্তুত হয়ে আর ভীতভাবেই তাকিয়ে থাকে পরিমল। বীথিকার মুখ-চোখ আর চিবুকের গড়নটাই যেন মুহূর্তের মধ্যে বদলে গিয়েছে। ঐ নিবিড় দুটি ভুরুর মধ্যে কেমন একটা কঠিনতা আগেও দেখেছে পরিমল, কিন্তু এখন দেখে মনে হয়, যেন ইস্পাতের দুটি ছোট ছোট বাঁকা ফলকের মত কঠিন দুটি ভুরু। যেন জগৎছাড়া এক সংকল্পের মেয়ে। আজ এক বছরের মধ্যে বীথিকাকে কোনদিন দেখে এরকম মনে হয় নি, দেখতেও এরকমও লাগে নি।

পরিমল অনুনয়ের সুরে বলে—চুপ করে রইলে কেন বীথি? কথা বল। তুমি জান, তুমি গম্ভীর হলে আমার কত খারাপ লাগতে পারে।

বীথিকা—তুমি কি চাও যে আমি ছয় সাত মাসের ছুটি নিয়ে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে চটাই আর একটা প্রমোশন নষ্ট করি?

পরিমল—এ কি কখনো আমি চাইতে পারি?

বীথিকা—তুমি কি চাও যে, আমি এই বয়সেই শরীরের রক্ত খুইয়ে কতগুলো হাড় আর কাঠ হয়ে যাই?

পরিমল এগিয়ে এসে বীথিকার একটা হাত ধরে—বড় ভুল প্রশ্ন করছ বীথি। তোমার মুখ শুকনো হয়ে গেছে, এ দৃশ্য আমি স্বপ্নের মধ্যে দেখলেও বোধ হয় সহ্য করতে পারব না।

বীথিকা—তুমি কি চাও যে, এর মধ্যে আমাদের জীবনের সব ফুর্তি বন্ধ হয়ে যাক?

পরিমল—কখনো বন্ধ হতে দেব না। তুমি অনর্থক একটা আতঙ্ক কল্পনা করছ বীথি।

বীথিকা—তোমাকে ভালবেসেছি, একমাত্র তোমাকে নিয়েই চিরকাল বেঁচে থাকবার জন্য।

পরিমল—তোমার ভালবাসার তুলনা হয় না বীথি। তুমি আমাকে এত আপন ও এত নিশ্চিন্ত করেছ বলেই তো আমি নিজেকে নিয়ে গর্ব করি। পৃথিবীতে ক'জনের এমন স্ত্রী আছে দেখাক তো কেউ? তুমি তো আমার গর্ব।

বীথিকা—তুমিও তো আমার গর্ব। তবে আমার নিজের গর্ব এই যে,

তোমাকে সুখে রাখবার জন্য টাকা-পয়সার সব চিন্তা, সব ভার আর সব দায় আমি মেয়েমানুষ হয়েও সহ্য করছি, আর চালিয়েও যাচ্ছি।

পরিমলের উজ্জ্বল চক্ষু হঠাৎ একটু নিষ্প্রভ হয়ে ওঠে, যেন হঠাৎ একটা ধোঁয়া এসে লেগেছে। কুণ্ঠিতভাবে বলে—সেকথা এত স্পষ্ট করে কেন আর বলছ? বলতেই বা হবে কেন? একশোবার স্বীকার করি, তোমার তুলনা নেই।

বীথিকা—যাক, কথা বাড়িয়ে আর লাভ নেই। মোট কথা হলো, এমন সুখের জীবনে যেন কোন ঝঞ্ঝাট না আসে। শুধু তুমি আর আমি, এর মধ্যে কোন ঝঞ্ঝাট আমি আসতে দেব না।

পরিমল—ঝঞ্ঝাট কেন আসবে? ঝঞ্ঝাটের কোন প্রশ্নই ওঠে না।

আর্তনাদের মতই শোনায় পরিমলের কণ্ঠস্বর। আবার উঠে গিয়ে একটু তফাতে বসে, তারপরেই পায়চারী করে, জানালার কাছে এসে দাঁড়ায়, গুলমোরের মাথার দিকে নিষ্পলক চক্ষে তাকিয়ে থাকে।

হাত-ঘড়ির দিকে তাকায় পরিমল। খাবার সময় হয়েছে। জানালার কাছ থেকে সরে এসে এক হাতে কপাল টিপে ধরে আর নীরবের দিকে তাকায়। তারপরেই বীথিকার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলে—শুনছ?

—কি?

—তুমি খেয়ে নাও। আমার আজ আর কিছু খাওয়া উচিত হবে না। কি রকম একটা অস্বস্তি বোধ করছি।

—কিসের অস্বস্তি?

—মাথা ধরেছে, আর কেমন একটা বমি-বমি ভাব।

—তা হ'লে খেও না।

স্নানের ঘরে গিয়ে সাজ বদল ক'রে আর ভিতরের বারান্দায় গিয়ে আলমারিতে রাখা হোটেলের খাবার খেয়ে, আবার নবীন ঘরের ভিতরে ঢুকল বীথিকা।

জানালার কাছে একটা মোড়ার উপর স্থির হয়ে বসেছিল পরিমল, যেন নিঃশব্দে গুলমোরের কাছে একটু বাতাস প্রার্থনা করছে। কিন্তু গুলমোর বড় শান্ত।

দপ্‌ ক'রে ঘরের আলোর রঙ বদলাস। সুইচ টিপেছে বীথিকা। ঘনঘোর মেঘে ঢাকা চাঁদের আলোর মত অন্ধকার-মাখানো একটা থমথমে কালো রঙের আলো।

একটা বালিশ জড়িয়ে খাটের উপর এলিয়ে পড়েই বীথিকা বলে—তাহ'লে কথা রইল, তুমি কালই একবার এণ্টালির ডাক্তার প্রকাশের খোঁজ নেবে।

—না, পারব না।

অত্যন্ত গম্ভীর ও উত্তপ্ত এক কণ্ঠের গর্জন। প্রত্যুত্তর দেয় পরিমল।

উঠে বসে বীথিকা।—কি বললে? আবার এত জোর-গলা ক'রে বললে? লজ্জা করে না ওভাবে ধমক দিয়ে কথা বলতে? তোমার ঐ ধমকের দাম কত?

উত্তর দেয় না পরিমল। শোনা যায়, পাশের ফ্ল্যাটের দেয়াল ঘড়িটা শুধু টিক্ টিক্ ক'রে এই রাত্রির স্তব্ধতাকে বিদ্রূপ করছে।

বীথিকা বলে—তাহ'লে শুনে রাখ, আমিই প্রকাশ ডাক্তারের খোঁজ নেব।

কোন উত্তর দেয় না পরিমল। বীথিকাও আর কোন কথা বলে না। মোড়ার উপরেই চুপ ক'রে বসে থাকে পরিমল, আর বীথিকা আবার বালিশ আঁকড়ে খাটের উপর পড়ে থাকে। বালিশটা অনেক রাতে ক্ষীণ কান্নার মত শব্দ করে একবার। কিসের কান্না কে জানে!

সকাল বেলার খবরের কাগজ বলে, হলিউডে একটা অগ্নিকাণ্ড হয়ে গিয়েছে। নীলকমলের তিনতলার ফ্ল্যাটের এই রঙীন ঘরের ইতিহাসেও কি এক বছর পরে আজ হঠাৎ মাঝরাত্রি পার হতে না হতেই আগুন লেগে গেল? থমথমে কালো আলো, যেন বহু যত্নে সাজানো একটা সেট অঙ্গারমাথা হয়ে পড়ে রইল সারা রাত। সকাল হবার পর সেই কালো আলো নিভল।

রোদের ঝাঁজ বড় বেশি। পথের ধুলোর ঘুর্ণি ওড়ে মাঝে মাঝে। গুচ্ছ ভাঙ্গা গুলমোর মাটিতে ঝ'রে পড়ে ঝুরঝুর ক'রে। জানালা বন্ধ।

বীথিকা গিয়েছে আফিসে। পরিমল আছে ঘরে। ঘরের আবছায়ার মধ্যে বন্দী একটা ছায়া যেন ছটফট করে।

জীবনে এই প্রথম যেন নিজেকে দেখতে পেয়েছে পরিমল। এক নারীর প্রতিমুহূর্তের ইঙ্গিতের ক্রীতদাস, একটা চেহারা মাত্র সে, একটা ভাড়া-খাটা পৌরুষ। রোজগেরে গৌরবে গরবিনী এক নারীর করুণার পোষ্য। এমন মানুষের ধমকের দাম কত? সত্যিই তো, কোন দাম নেই।

কিন্তু কি ভয়ানক বীথিকার ঐ কথাগুলি। একটা খুনের কথাও এরকম

হেসে হেসে বলতে পারে মানুষ? জীবনের কল্পনাগুলি সত্যিই বোধ হয় কতগুলি ফুলের স্তবক, কখনো সন্দেহই হয় না যে, ফুলের আড়ালে একটা সাপও লুকিয়ে থাকতে পারে। পরিমলের ঘুমন্ত হৃৎপিণ্ডে যেন হঠাৎ একটা সাপের ছোবল পড়েছে। এটাও এর আগে বুঝতে পারে নি পরিমল, তার এই চেহারার ভিতরে একটা হৃৎপিণ্ড আছে, আর সে হৃৎপিণ্ডের ভিতরে আবার একটা গর্ব ঘুমিয়ে আছে। হঠাৎ যেন একটা বিষের কামড় খেয়ে জ্বলে উঠেছে এই গর্ব। পরিমল সহ্য করতে পারছে না বীথিকার কথাগুলি।

গুণবতী ও শিক্ষিতা এক নারীর কাছে সে একটা সুন্দর ফটো মাত্র, স্বামী নয়। ফটোর ধমক গ্রাহ্য করবে কেন মানুষ? যে ফটো মানুষের স্বামী হতে পারে না, সে ফটো মানুষের বাপ হবে কেমন ক'রে?

মাথার ওপরে জোরে পাখা ঘোরে, কিন্তু কপাল বেয়ে দরদর ক'রে ঘাম ঝরে পরিমলের। আবর্জনা, বীথিকার কাছে সেই আগন্তুক প্রাণটা শুধু একটা আবর্জনা ছাড়া আর কিছু নয়। পরিমল নামে মাত্র একটা চেহারার মানুষকে স্বীকার করে বীথিকা, তার মনুষ্যত্বকে স্বীকার করে না। নইলে, যে মানুষের দু'বাহুর বন্ধনে আত্মহারা হয়ে যাবার জন্য নারীর চোখ দুটো লুব্ধ হয়ে জ্বলজ্বল করে, সেই মানুষের সৃষ্টির আত্মাটা বীথিকার কাছে একটা আবর্জনা হয়ে যায় কি ক'রে? কি ভয়ানক ঘৃণায় শিউরে উঠেছে বীথিকা! পরিমল যেন তার দেহের শোণিত দূষিত ক'রে দিয়েছে।

চোখ-মুখ ভাঙ্গা ভাঙ্গা, হাত পা আলগা-আলগা, পরিত্যক্ত মন্দিরের এক জীর্ণ পাথুরে মূর্তির মতো চেয়ারের উপর সুস্থির হয়ে বসে থাকে পরিমল। নিদারুণ এক অপমানের বাজ পড়ে তার জীবনের বহুদিনের লালিত সেই রূপের গর্বটা এতদিনে যেন চূর্ণ হয়েছে।

সিগারেটের পর সিগারেট পোড়ে। ছাই উড়ে পড়ে রঙীন ঘরের মেজেতে, আসবাবের গায়ে। রজনীগন্ধার ঝাড়টার মাথায় ফোটা কুঁড়ি নেতিয়ে পড়ে।

কিন্তু এ ঘরে আর একটা রাত্রিও থাকতে যে ভয় করে। আবার তো সেই একই অভিনয়ের পালা। সেই দুটি বিহ্বল নারীচক্ষুর দৃষ্টির ইঙ্গিতকে আর মত্ত দুটি ওষ্ঠের সঙ্কেতকে প্রতি মুহূর্তে সেবা করা। ভাবতে গিয়ে নিজের এই শরীরটার উপরেই ঘৃণা বোধ করে পরিমল। কিন্তু বীথি কি এই এক বছরের অভিনয়ের নিয়ম থেকে দূরে সরে থাকবার সুযোগ দেবে পরিমলকে? সেই পাউডার-ছিটানো একটা গলা আর স্নো-মাখানো একটা চিবুক পরিমলের

মুখের উপর লুটিয়ে পড়ার জন্য কাছে এগিয়ে আসছে, কল্পনা করতে আজ শিউরে ওঠে পরিমলের অভিশপ্ত মন। দুঃসহ, কিন্তু মুখ সরিয়ে নিতে পারবে কি পরিমল? আর সরিয়ে নিলে বীথিই বা কি সেই অপমান সহ্য করবে?

ভাঙ্গা-ভাঙ্গা চোখ-মুখ আর আলগা আলগা হাত-পাগুলি যেন হঠাৎ জোড়া লেগে শক্ত হয়ে ওঠে। এক লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায় পরিমল। এক মুহূর্ত কি কি যেন ভাবে। একটা চিঠি লিখে রেখে যেতে হবে কি? কি দরকার? একটা ছায়া চলে যাবার সময় তো কথা বলে না, চিঠিও লিখে রেখে যায় না। এখনি এভাবেই, এই রঙীন ঘরের কাছে কোন কথার কৈফিয়ৎও না রেখে, শুধু দারোয়ানের কাছে চাবি রেখে দিয়ে সরে যাওয়াই ভাল।

দরজা খুলে বের হয় পরিমল, দরজার বাইরের কড়ায় তালা লাগিয়ে চাবিটা হাতে নিয়ে দু' তিন ধাপ সিঁড়ি নেমেও আসে পরিমল। কিন্তু কি অদ্ভুত দুর্বলতা! বুঝতে পারে, পা দুটো কিরকম ভারি হয়ে উঠেছে, চোখ দুটোও ভেজা-ভেজা লাগে। কিসের যেন একটা ইচ্ছা, যেন ঘুমন্ত হৃৎপিণ্ডের ভিতর থেকেই একটা অন্ধ মমতার অনুরোধ তার হাত দুটো ধরে ঘরের ভিতর ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে। চলে গেলে আর কি হলো? অন্ধকারে ঢাকা একটা অঙ্কুর, সূর্যের আলো দেখবার আশায় যার প্রাণ তৈরী হয়ে উঠেছে, তাকে বাঁচাবে কে? এভাবে রাগ করে চলে গেলে সেই শিশু-প্রাণটাও যে আবর্জনা হয়ে যাবে।

আবার তালা খুলে ঘরের ভিতরে ঢুকেই পরিমল অসহায়ের মতো ছটফট করতে থাকে। কিন্তু থেকেই বা কি হবে? উপায় কি? এণ্টালির প্রকাশ ডাক্তারকে ঐ সিঁড়ির উপর থেকেই গলাধাক্কা দিয়ে বের ক'রে দেবার শক্তি কই তার? সারাজীবন চাকরে তেল মাখিয়ে আর স্নান করিয়ে এই শরীরটাকে যে পক্ষাঘাত ধরিয়ে দিয়েছে! আজ মনে প্রাণে বিশ্বাস করে পরিমল, এই দু'হাতে দু'মুঠো সোনার মোহর নিয়ে বীথির সামনে দাঁড়ালে, বীথির মতো মেয়েমানুষ তার ধমকের দাম বুঝত নিশ্চয়। শুধু ধমকের দাম কেন? বীথি তার নিজের দেহের ভিতরে ঘুমন্ত সেই অঙ্কুরের দামটাও বুঝত। ধমক দেবারই দরকার হতো না।

কাজ? কাজ কা'কে বলে তাই জানে না পরিমল। চেষ্টা কা'কে বলে তাও জানে না। কাজ দেবেই বা কে? কাজ করার যোগ্যতাই বা কোথায়?

উপায়? চিন্তা করতে করতে পরিমলের চেহারাটা কি রকমের যেন হয়ে

যায়। যেন একটা চোরের ছায়া, ধূর্ত অথচ অত্যন্ত কর্মঠ ও কঠোর। অকর্মণ্য হাত দুটোর পেশীগুলি যেন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। যেন একটা সিঁদকাটা পরিকল্পনার দিকে পরিমলের চোখ দুটো বড় বড় হয়ে তাকিয়ে আছে। একটা অকাজের পরিকল্পনা। বুদ্ধি নয়, ছোট একটা দুর্বুদ্ধি। সামান্য একটু অকাজের কৌশলে যদি মস্ত একটা সুকাজ হয়ে যায়, হোক না। বীথিকা বাঁচবে, বীথিকার ছেলে বাঁচবে, কাঁচা খুনের রঙ লাগবে না এই রঙীন ঘরে।

কিন্তু তারপর? তার পরের কথা আর চিন্তা করতে পারে না পরিমল। বুকের পাঁজরাগুলি হঠাৎ একবার দুর দুর ক'রে কেঁপে ওঠে। আর বেশি দেরি করলে এ'টালির প্রকাশ ডাক্তারের পায়ের শব্দ সিঁড়ি বেয়ে হুড়মুড় ক'রে উপরে উঠে আসবে।

শুধু গেঞ্জি ও পায়জামা, একটা জামাও গায়ে দিতে ভুলে গেল পরিমল। আলনা থেকে একটা আদ্দির চাদর কাঁধে ফেলে, যেন একটা জ্বর বিকারের জ্বালায় ঘর থেকে বের হয়ে, দরজায় তালা বন্ধ ক'রে, চৈত্রী দুপুরের তপ্ত পথের ধূলোর মধ্যে এসে দাঁড়াল পরিমল।

এ ফ্ল্যাটে আর ও ফ্ল্যাটের জানালায় কতগুলি বিস্মিত চক্ষু উঁকি ঝুঁকি দেয়। তিনতলার ফ্ল্যাটের কিন্নরকে এমন অসময়ে পথে বের হতে এই প্রথম দেখা গেল। বিস্ময়ের ব্যাপার বৈকি। আরও দুর্বোধ্য বিস্ময় হলো ঐ সাজ। গেঞ্জির উপর চাদর জড়িয়ে, অদ্ভুত চেহারা ক'রে, যেন একটা ছেলেধরার মতো চোখ ক'রে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে লোকটা কোথায় চলে গেল।

লেকের দিকে কোকিল ডাকে। চাঁদ ওঠে আকাশের পূবে। ডায়মণ্ড হারবারের ট্রেন সিটি বাজিয়ে দূরে চলে যায়। বেড়িয়ে ফেরে বীথিকা রায় ও পরিমল রায়।

আজ রবিবার। এবং রবিবার ছাড়া আর কোনদিন দু'জনের একসঙ্গে বেড়াবার উপায় নেই। কারণ রঙীন ঘরের জীবনটা ছন্দ বদল করেছে।

একটা কাজ পেয়েছে পরিমল। বিখ্যাত এক ইংরাজ কোম্পানির নতুন কারখানা হয়েছে বজবজের কাছে। এই কারখানারই ওয়েলফেয়ার অফিসার হয়েছে পরিমল। পরিমলেরই ছেলেবেলার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু হলো কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সুতরাং কাজটা পেতে খুব বেশি অসুবিধা

হয় নি পরিমলের। বন্ধুর সুপারিশে খুব সহজেই কাজ হয়ে গিয়েছে। এখন মাইনে হ'লো ছ'শো দশ টাকা। বছর খানেক পরে কোম্পানিরই খরচে মাস দু'য়েকের জন্য বিলেতে গিয়ে একটা ট্রেনিং নিয়ে ফিরতে হবে, তারপর মাইনে হবে আটশো পঁচিশ।

বীথিকা অফিস যায় সকাল দশটায়, পরিমল বের হয় সকাল এগারটায়। ফিরে আসতে বেশ রাত হয় পরিমলের। কাছাকাছি তো নয় বজবজ, ট্রেনে যেতে হয়, ট্রেনে ফিরতে হয়। সন্ধ্যাবেলাগুলি তাই নিতান্ত উৎসবশূন্য, একেবারেই শূন্য মনে হয় বীথির, একমাত্র রবিবারের সন্ধ্যা ছাড়া।

পরিমলের সার্ভিসের মাত্র দশটি দিন পার হয়েছে। এর মধ্যে মাত্র দু'টি রবিবারের সন্ধ্যাকে ওরা দু'জনে একসঙ্গে ধরতে পেরেছে। আজ হলো দ্বিতীয় রবিবার।

এই দশটি দিনের আগের দু'টি রাত্রির কথা কোন প্রসঙ্গে আর তুলতেই চায় না বীথি। সেই প্রথম রাত্রিটা, জানালার ধারে মোড়ার উপরে বসে পরিমল, আর খাটের উপর বালিশ আঁকড়ে বীথি যে রাতটা ভোর ক'রে দিল। তারপরেই সেই দ্বিতীয় রাত্রিটা। দু'জনে ঘরের দু'দিকে দু' চেয়ারে বসেই রাত কাটিয়ে দিল।

অফিস থেকে ফিরে এসে বীথিকা দেখেছিল, গেঞ্জির উপর চাদর জড়িয়ে আর চেয়ারের উপর শক্ত একটা চেহারার মত ব'সে গুলমোরের শোভা দেখছে পরিমল। দেখামাত্র সেই যে রাগ করেছিল বীথি, সেই রাগ সারারাত বীথিকে একেবারে বোবা ক'রে একটা চেয়ারের উপর বসিয়ে রেখে দিল। পরিমলের দিকে একবার তাকিয়েই অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল বীথি। মূর্তিমান একটা অকর্মণ্যতা যেন শুধু রূপের বড়াই নিয়ে বীথিকার ভালবাসার জগৎটাকে অশ্রদ্ধা করার জন্য বসে রয়েছে। কে ভেবেছিল, ঐ চওড়া বুকের ভিতর এত অকৃতজ্ঞতা লুকিয়ে থাকতে পারে? বীথিকার এই বয়সের সব আনন্দ অকালে ডুবিয়ে দেবার এই অভিসন্ধিই যদি ছিল লোকটার, তবে কেন .....।

একটা অভিমান জ্বলে উঠেছিল বীথিকার বুকের ভিতর। তবে কেন ভালবাসার এত ভান করল লোকটা এই এক বছর ধরে? বিশ্বাস করে বীথিকা, এ মানুষ অন্তরে অন্তরে ভালবাসে তার একটা ছা-পোষা শখকে, বীথিকাকে নয়, বীথিকা ওর কাছে গেরস্থালির একটা সামগ্রী মাত্র।

কিন্তু এতই যদি শখ ছিল, তবে.....। তবে কি? ভাবতে পারে না বীথি,

একেবারে পিছনের দেয়ালের দিকেই মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে রুমাল দিয়ে চোখ মোছে। সহ্য হয় না এই বোবা জ্বালা।

সকাল হয় বেশ একটু মেঘলা হয়েই। কতগুলি বৃষ্টির ফোঁটা গুলমোরের মাথা ভিজিয়ে দেয়। আর দরজার কড়া বেজে ওঠে।

চেয়ার থেকে উঠে দরজা খোলে পরিমল। কোন্ এক অফিসের পিয়ন সেলাম ক'রে মস্ত বড় একটা লেপাফা পরিমলের হাতে তুলে দেয়। পিয়নবুক সই করে পরিমল। পিয়ন সেলাম ক'রে চলে যায়।

লেপাফাটাকে টেবিলের উপর রেখে দিয়ে ব্যস্তভাবে স্নানের ঘরে চলে যায় পরিমল। যখন ফিরে আবার ঘরে ঢোকে তখন বীথিকা ছেঁড়া লেপাফা আর একটা চিঠি হাতে নিয়ে পরিমলের দিকে তাকিয়ে প্রায় চিৎকার ক'রে ওঠে—এ কি? এ আবার কি কাণ্ড করেছ?

পরিমল অতি মৃদু অথচ গম্ভীর স্বরে বলে—ও কিছু নয়, রেখে দাও।

—কোথাও বের হবে নাকি?

—হ্যাঁ।

—কোথায়?

হেসে ফেলে পরিমল।—আগে প্রতিজ্ঞা কর, আর কোনদিন কথা বন্ধ করবে না, তবে বলব।

বীথিকাও হেসে ফেলে। আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে পরিমলের কাছে দাঁড়ায়। পরিমলের হাতের উপর হাত রেখে বলে—সত্যিই প্রতিজ্ঞা করছি, কখনো কথা বন্ধ করব না। তবে তুমি অমন ক'রে ধমক দিও না লক্ষ্মীটি।

পরিমল তার কাজের আর কাজের চেষ্টার কাহিনী বর্ণনা ক'রে শুনিয়েছিল। শোনাতে বেশি সময় লাগে নি। এই রবিবারের দশ দিন আগের সেই মেঘলা সকালের এক পশলা বৃষ্টি আগের দু'টি কালরাত্রির সব অভিযোগের জ্বালা ধুয়ে দিয়েছিল।

নীলকমল ভবনের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে সেই দু'রাত্রির ঘটনাগুলিকে এখন একটা স্বপ্নে দেখা আতঙ্কের মত নিতান্ত অসার বলেই মনে হয় বীথির। শুধু সন্দেহ হয়, মাথাটা দুটো দিন খারাপই হয়ে গিয়েছিল বোধ হয়। নইলে ..... ভাবতে গিয়ে লজ্জা পায় বীথি।

দপ্ ক'রে আলো জ্বলে ওঠে তিনতলার ফ্ল্যাটের ঘরে। সাদা আলো। ঘরের ভিতরে কিছুক্ষণ মাত্র দাঁড়িয়ে থেকে তারপরেই দু'জনে আলোর বাইরে চলে

যায়। ভিতরের বারান্দায় অন্ধকারের মধ্যেই রেলিং-এর হেলান দিয়ে দু'জনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে গল্প করে। পাশের বাড়ির ছাদ আর সামনের বাড়ির বারান্দা রঙীন ঘরের কিন্নর ও কিন্নরীকে দেখতে না পেয়ে আবার বিস্মিত হয়।

বীথিকা বলে—তুমি আজকাল যেন কেমন হয়ে যাও মাঝে মাঝে। ডাকলেও শুনতে পাও না। এত কি ভাবো বলতো ?

চমকে ওঠে পরিমল। তার হাত দুর্বল সিঁদেল-চোরের হাতের মত রেলিং-এর উপর আস্তে আস্তে কেঁপে কেঁপে ঘষা খায়, রেলিংটাকে শক্ত ক'রে আঁকড়ে ধরতে পারে না। বুকের ভিতর সব নিশ্বাস যেন মরতে বসেছে, শিরদাঁড়াটা থর থর করে কেঁপে উঠে।

বীথিকা আবার বলে—দেখ কাণ্ড, আবার সেই রকম চুপ করে কি যেন ভাবতে আরম্ভ করেছে।

সাড়া দেয় পরিমল, মুহূর্তের মধ্যে যেন একটা নিশ্বাসের জোরে নিজেকে শক্ত ক'রে নিয়ে জিজ্ঞাসা করে—কি বলছ ?

—এত গম্ভীর হয়ে কি ভাবছিলে বলো।

হঠাৎ দু'হাতে বীথির মাথা জড়িয়ে ধরে বুকের উপর টেনে নেয় পরিমল। বীথির কপালের উপর মুখ ছুঁইয়ে দিয়ে ব্যাকুলভাবে বলে—একটা কথা আমাকে দিতে হবে বীথি। এখনি শুনব। একেবারে স্পষ্ট করে শুনব।

—বল, কি শুনতে চাও ?

—এণ্টালির ডাক্তার-ফাক্তারকে কখনো কোনদিন ডাকা হবে না।

পরিমলের বুকের উপর মাথা গুঁজে দিয়ে নীরব হয়েই রইল বীথি, অনেকক্ষণ। পরিমলের কামিজের বুক আর আস্তিন ভিজিয়ে দিল বীথির দুই চোখ। ঢিপ ঢিপ করছে পরিমলের বুকের ভিতর একটা শব্দ। সে শব্দের অর্থ যেন এতদিনে বুঝতে পেরেছে বীথি। একটা অন্ধ স্নেহের উদ্বেগ যেন ঢিপ ঢিপ করছে এই বুকের ভিতর। এতদিন যেন তার এই পাথুরে দুল পরানো কান দুটোতে এ শব্দের অর্থ বুঝবার মতো শক্তিই ছিল না।

—বীথি ?

—বলো।

—বলো, ডাক্তারের দরকার নেই।

—না নেই। তুমি যখন ডাক্তার আনতে চাও না, তখন আমিও চাই না।

আর একটা রবিবার। বীথিকা আবার অভিযোগ করে ব'সে—তবুও তুমি কি যে ভাবো, বুঝতে পারি না।

মিথ্যা বলে নি বীথিকা। পরিমলের মনের ভিতর একটা প্রচণ্ড অভিপ্রায়ের পরিকল্পনা যেন লুকিয়ে রয়েছে; একটা প্রাণের অঙ্কুরকে সর্ব আপদ থেকে মুক্ত করার পরিকল্পনা। কথা দিয়েছে বীথি, কিন্তু সে কথায় নিশ্চিন্ত হতে পারে নি পরিমল। নিজের ইচ্ছাকে নয়, পরিমলেরই একটা ইচ্ছাকে সম্মান দিবার জন্য দশ মাসের যাতনা স্বীকার করবে বীথি। এই তো তার প্রতিশ্রুতি। এই প্রতিশ্রুতিতে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না।

চুপ ক'রে মাঝে মাঝে অন্যমনস্কের মত পরিমল যা ভাবে, পরিমলই জানে যে, সে ভাবনা চুপ করে সহ্য করা কত কঠিন। মাটির মূর্তি তো নয়; জীবন্ত এক নারীর মূর্তিকে কি চক্ষুদান করা যায়, আর সে চোখে কি আবার স্বপ্ন দান করতে পারা যায়? তাই দুশ্চিন্তা না ক'রে পারে না পরিমল, নিজেকে চেনার চোখ করে পাবে বীথিকা?

পরিমল হেসে হেসে বলে—আজকাল তোমার চোখমুখের চেহারা কি রকম হয়ে গিয়েছে, খোঁজ রাখ কিছু?

আতঙ্কিত হয় বীথি—তার মানে?

পরিমল—জীবনে কোনদিন বোধ হয় তুমি আজকের মতো এত সুন্দর ছিলে না।

বীথি হেসে ফেলে—আমার মুখের গুণে নয়, তোমার চোখের গুণে এই মুখকে আজ বেশি সুন্দর দেখছ।

পরিমল—আমার চোখের গুণে নয়, তোমার কোলে যে আসছে, তার গুণেই তুমি এত সুন্দর হয়ে উঠেছ।

মাথা হেঁট করে বীথি, জীবনে বোধ হয় এই প্রথম একটা কথার কাছে মাথা হেঁট করল। প্রস্তুত ছিল না এমন কথা শোনবার জন্য। ভাবতেও পারে নি বীথি, শোনা মাত্র মাথাটা এভাবে ঝুঁকে পড়বে।

বোঝা যায় না, ঘরের মেজের দিকে না তার নিজেরই কোলের দিকে তাকিয়ে আছে বীথি। যেন নিশ্চল ও নিস্পন্দ এক অভিবাদনের ভঙ্গী আঁকা রয়েছে এ ঘরের বাতাসে। যেন ছোট হাত পায়ের খেলায় ভরা একটা পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে আছে বীথিকার বুকের সব নিশ্বাস আর চোখের সব বিস্ময়।

পরিমল ডাকে—বীথি।

বীথি মুখ তুলে তাকায়। উঠে গিয়ে পরিমলের হাত চেপে ধরে—তুমি আজ আমাকে একটা কথা দাও।

—বল, কি কথা চাও।

—তুমি আর কখনো ওরকম চুপ ক'রে কিছু ভাববে না।

এক মহান সাফল্যেব হাসি হো হো কবে হেসে পবিমল বলে—আব ওবকম ক'বে নিশ্চয় ভাবব না। এবাব আমি নিশ্চিন্ত।

সফল হযেছে পবিমলেব প্রচণ্ড অভিপ্রায়েব পবিকল্পনা। বীথিকাব চোখে স্বপ্নদান কবা হয়ে গিয়েছে। ভাবনাব ভাব নেমে গিয়েছে পবিমলেব।

এই ববিবাবেব সন্ধ্যাটা বঙীন ঘবেব জীবনে যেন একেবাবে নতুন একটা জ্যোৎস্না ডেকে দিযে চলে গেল। তাবপব থেকে প্রতিদিনই একটা না একটা নতুন পবিণাম দেখা দিয়ে অপার্থিব এই বঙীন ঘবটাকে পার্থিব ক'রে তুলতে থাকে।

হোটেলেব খাবাব আসা বন্ধ হলো এক দিন। বীথি বলে—তুমি যখন সন্ধ্যাবেলাটা থাকই না, আব বেডাতে যাওয়াও হয় না, তখন বেঁধে বেধেই সন্ধ্যাটা কাটিযে দেব। আব সকালবেলা? সেটাও এমন কি সমস্যা! আব একটা স্টোভ থাকলেই খুব তাডাতাডি সকালেব বান্নাও সেবে ফেলতে পাবব।

আব একদিন, একটু বেশি রাত ক'বে পবিমল ঘবে ফিবতেই বীথিকা বলে—তোমাকে বলি-বলি কবেও একটা কথা এখনো বলতে পাবি নি। ভয় হয়, বললে আবাব কি ভেবে বসবে।

—কি কথা?

—তোমাব চেহাবা এই ক'টা দিনেব মধ্যে বড বেশি খাবাপ হয়ে গিয়েছে। এতটা শুকিয়ে গেলে কেন?

একটু উদ্বিগ্নভাবেই আবও প্রশ্ন কবতে থাকে বীথি—খাটুনি কি খুব বেশি? অফিসেব টিফিন কি বকমেব? খেতে পাব তো?

পবিমল হাসে—টিফিনটা মন্দ নয়।

ভিতব বাবান্দাব টেবিলেব উপব খাবাবেব প্লেট আব বাটি সাজাতে সাজাতে বীথিকা বলে—আব একটা কথা। আমি একটা লম্বা ছুটিব জন্য দবখাস্ত কবেই দেব ভেবেছি। তুমি কি বল?

—এখনই ছুটি না নিলেও চলতে পাবে। আব কিছুদিন পবে দবখাস্ত কবো।

খাওয়ার পাট শেষ হবার পর বীথি আবার প্রশ্ন করে—হ্যাঁ, আর একটা কথা। ব'লে হঠাৎ চুপ করে যায় বীথি। তখনি বলতে পারে না, কথাটা কি। মুখ ঘুরিয়ে যেন একটা লাজুক হাসি লুকিয়ে ফেলবার চেষ্টা করে বীথি।

পরিমল বলে—বল, কি বলছিলে?

বীথি—এই ফ্ল্যাটে আর বেশিদিন থাকা উচিত হবে কি? এই একটু খানি একটা ঘর, আর এই ফালির মত বারান্দা, এর মধ্যে কি করে যে জায়গা হবে, মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারছি না।

পরিমল—এ ঘরে থাকা আর চলবে না বলেই বুঝতে পারছি। অন্য জায়গা খুঁজতে হবে।

বীথিকার চিন্তাগুলিই যেন একটু অন্যমনস্ক হয়েছিল। ফস্ ক'রে বলে ফেলে বীথি—ছোট একটা দোলনা দুলবে, এমন একটু জায়গাও এখানে নেই।

পরিমল মুখ টিপে হাসে—কি বললে?

বীথি অপ্রস্তুত হয়েও বলে—বলেছি, বেশ করেছি।

এঁটো প্লেট ও বাটিগুলিকে একটা থালার উপর তুলে নিয়ে জলের ট্যাপের নীচে রাখে বীথি। হাত ধুতে ধুতে বলে—এ ছাই চাকরিই ছেড়ে দেব। আর ভাল লাগে না। তোমার যখন একটা ভাল কাজ হয়েই গিয়েছে, তখন আর কেন...।

হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকায় পরিমল। যেন সিঁদেল চোরের একটা ছায়ার বড় বড় দুটো চোখ পালিয়ে যাবার পথ ঠাহর ক'রে রাখছে।

বৈশাখী সন্ধ্যা ঘনায় লেকের জলের আশেপাশে, বড় বড় নারকেলের মাথায়, আর আকাশে। পোড়া বাতাস একটু একটু ঠাণ্ডা নিঃশ্বাস ছাড়ে। সারা দুপুর আর বিকালের মূর্ছা থেকে মানুষের কলরবগুলি এতক্ষণে আবার জেগে উঠেছে। আর এক রবিবার।

বেড়িয়ে ফেরে বীথিকা রায় ও পরিমল রায়। এ ফ্ল্যাট আর ও ফ্ল্যাটের জানালাগুলি, সামনের বাড়ির বারান্দা আর পাশের বাড়ির ছাদ দেখে অবাক হয়ে যায়, কিন্নর ও কিন্নরী আর হাত জড়াজড়ি ক'রে বেড়ায় না, ফটকের আলোর কাছে দাঁড়িয়ে সেই লজ্জার মাথা খাওয়া লীলাকলাও আর দেখা যায় না। দেখা যায়, কিন্নরীর হাতেই একগুচ্ছ রজনীগন্ধা। দপ দপ

ক'রে ঘরের রঙীন আলোও আজকাল আর খেয়ালের আনন্দে ক্ষণে ক্ষণে রঙ বদল করে না। কি আশ্চর্য, আজকাল ফ্ল্যাটের ভিতর-বারান্দা থেকে ধোঁয়া উড়তেও দেখা যায়। রান্না-বান্না করে না কি কিন্নর আর কিন্নরী?

নীলকমলের সিঁড়ি ধরে এই বৈশাখী সন্ধ্যার প্রথম অন্ধকারের মতোই শান্ত দুটি মূর্তি গল্প করতে করতে উপরে ওঠে। দুই চোখ ভরা এক অদ্ভুত হাসির ঝলক তুলে বীথি পরিমলের দিকে তাকায়।—তোমার প্রথম মাসের মাইনেটা প্রথম কিসে খরচ করবে বল?

হঠাৎ পা দু'টো যেন টলে ওঠে পরিমলের। দেয়াল ধরবার চেষ্টা করে। নিঃশ্বাস বিচলিত হয়। আস্তে আস্তে হেসে পরিমল উত্তর দেয়—তুমি যা'তে যেভাবে খরচ করতে চাও, তাই করব।

ঘরের ভিতরে ঢুকে কাশ্মীরী সুরাহির ভিতরে রজনীগন্ধার গুচ্ছ সাজিয়ে রাখতে রাখতে বীথি বলে—একটা কথা।

পরিমল—বল।

বীথি—চাকরিটা ছেড়েই দেব ঠিক করেছি।

কথা বলে না পরিমল। আয়নার দিকে অপলকভাবে তাকিয়ে যেন তার চোখেরই একটা ভীরুতাকে জোর ক'রে লুকিয়ে ফেলবার চেষ্টা করে।

বীথি বলে—মন লাগিয়ে অফিসের কাজ আর করতে পারছি না, কাজে ভুলও হচ্ছে, সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ধমক ধামকও দিচ্ছেন।

কোন মন্তব্য করে না, উত্তর দেয় না পরিমল।

বীথি বলে—শরীরটাও কেমন হাসফাঁস করে। এখন থেকেই সাবধান না হ'লে ভুল হবে।...না, আর অফিস যাওয়াই সম্ভব হবে না।

একটা বইয়ের ভিতর থেকে টাইপ-করা একটা চিঠি বের করে বীথি। পরিমলের কাছে এসে হাসতে হাসতে বলে—যে কথাটা তোমাকে এখনো বলি নি। আর অফিসে যাব না, চাকরির ইতি ক'রে দিলাম, কালকেই বাই পোস্ট অফিসে পাঠিয়ে দেব এই চিঠি।

আতঙ্কিতের মত দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত ক'রে হঠাৎ চিঠিসুদ্ধ বীথির হাত চেপে ধরে পরিমল।

বীথি বিস্মিত হয়—তুমি আপত্তি করছ?

পরিমল—হ্যাঁ।

যেন একটু অভিমান মেশানো ক্ষোভের সুরে বীথি বলে—কেন? তুমি থাকতে আমার আবার চাকরি করার দরকার কি?

—আমি নেই, আমি নেই, আমার কথা ছেড়ে দাও। কিন্তু তুমি ভুল করো না বীথি।

বলতে বলতে একেবারে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ায় পরিমল। পাগলের মতো দু'টো চোখ নিয়ে সিঁড়ির দিকে একবার তাকায়। যেন এই মুহূর্তে দরজার এই চৌকাঠ থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করার জন্য তৈরী হয়েছে একটা বিকারের রোগী।

সন্ত্রস্তের মতো তাকিয়ে বীথি বলে—এ কি? কি বলছ তুমি? কিসের ভুল?

পরিমল—আমি ভুল, আমার চাকরি ভুল। ঐ বজবজের কারখানা, ঐ চাকরির চিঠি, ঐ পিয়ন আর পিয়নবুক, ঐ ছ'শো-দশ টাকা মাইনে, সবই ভুল।

চিৎকার ক'রে ওঠে বীথি—তবে ওগুলো কি?

পরিমল—আমার জোচ্চুরি।

বীথি—এ শয়তানি কেন করলে?

পরিমল—শয়তানের ছেলেকে প্রকাশ-ডাক্তারের বিষ থেকে বাঁচাবার জন্য। বুঝতে পেরেছিলাম, ছ'শো-দশ টাকার অনুরোধ তুমি না মেনে পারবে না।

বীথিরই দু'চোখে বিষের ধোঁয়া জ্বলতে থাকে।—তুমি মুখ্খু, কালই তোমারই চোখের সামনে প্রকাশ ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে আসব, তারপর···।

যাত্রা-নাটকের দানবের ভঙ্গীতে হো হো ক'রে হেসে ওঠে পরিমল—পারবে না বীথি, কখ্খনো পারবে না। সে সাধ্যি এখন আর তোমার নেই!

খাটের উপর লুটিয়ে পড়ে বীথি। বালিশে মুখ গুঁজে দিয়ে ছটফট করতে থাকে। মিথ্যে বলে নি শয়তান। তার সারা দেহের শোণিত যে আর কয়েকমাস পরের মধুর এক আবির্ভাবের প্রতীক্ষায় দিন গুনছে। তার সারাক্ষণের ভাবনাগুলি যে এরই মধ্যে পীযূষময় হয়ে উঠেছে, অনাগত এক তৃষ্ণার্তকে কোলের উপর তুলে নেবার আশায়।

গুলমোরের মাথা দুলিয়ে দিয়ে বৈশাখী সন্ধ্যার একটা ঝড়ো বাতাস ঘরের ভিতর ঢোকে। হঠাৎ শান্ত হয়ে যায় বীথি। কি কথা ভাবতে গিয়ে মনের রাগগুলি হঠাৎ যেন কোথায় পালিয়ে গিয়েছে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে, অতি সুন্দর চেহারা আর অমন অকর্মণ্য জীবনের অভিশাপ নিয়ে যে লোকটা, তাকে ঘৃণা করতে গিয়ে কেমন একটা মমতাও এসে পড়ে।

জোচ্চুরি করেছে লোকটা, কিন্তু কি করুণ জোচ্চুরি! বীথিকে অ-মাতা হবার কলঙ্ক থেকে বাঁচাবার জন্যই জোচ্চুরি করেছে ঐ লোকটার বুকের ভিতর লুকানো একটা স্নেহান্ধ শখ।

কিন্তু কত ধূর্ত একটা জোচ্চুরি! বীথিকার চোখের দৃষ্টি আবার হঠাৎ অপ্রস্তুত হয়ে দুঃসহ একটা লজ্জার ভিতর ছটফট করতে থাকে। জোচ্চুরিটা কত সহজে ধরা পড়িয়ে দিয়েছে বীথিকে। মানুষের স্ত্রী নয় বীথি, ছ'শো দশ টাকার স্ত্রী; হৃদয়ের অনুরোধে নয়, টাকার অনুরোধে আর টাকার ধমকে শান্ত হয় যারা।

কিন্তু ঐ লোকটা যে টাকাও নয়, একেবারে ভুয়ো, ধূর্ত একটা টাকার গল্প মাত্র। লোকটাকে কি আর এ জীবনে শ্রদ্ধা করতে পারা যাবে? আবার একটা যন্ত্রণা ক'রে ওঠে মাথার ভিতরে। দুর্ভাগ্যটা যেন ক্ষতের মতো মনের ভিতরে জ্বলতে থাকে। স্বামী থেকেও তার স্বামী নেই। আর লোকটারও কি দুর্ভাগ্য! স্ত্রী থেকেও স্ত্রী নেই। ঐ অকেজো জীবনের একটা মূর্তি, কোনদিন নিজের দিকে তাকিয়ে নিজের দুর্ভাগ্যটাকে চিনতে শিখবে না, সম্মান চাইবে না, পাবেও না, শুধু পুরুষের একটা ফটোর মতো এই দরজার চৌকাঠে চিরকাল দাঁড়িয়ে থাকবে, তাড়িয়ে দেওয়া যাবে না, সহ্য করাও যাবে না, এ অভিশাপ কতকাল সহ্য করবে বীথিকা?

বালিশটাকে এক ঠেলা দিয়ে দূরে সরিয়ে দিয়ে, খাটের উপর উঠে বসে বীথিকা। পরিমলের দিকে তাকাতেই আবার চোখ জ্বলে ওঠে।—তোমার লজ্জা করছে না?

—করছে বৈকি।

—তবে আর ভঙ্গী ক'রে দাঁড়িয়ে থাকছো কেমন ক'রে?

—যাবার জন্যেই দাঁড়িয়ে আছি।

—কি বললে?

—শুধু একটি কথা বলে যাবার জন্যে দাঁড়িয়ে আছি।

—কি কথা?

—ছেলেকে বেনামী ক'রে দিও না।

কটমট ক'রে তাকায় বীথি—তার মানে?

পরিমল—তার আগেই খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে আমার খোঁজ ক'রো, আমিই এসে ছেলেকে নিয়ে যাব।

চমকে ওঠে বীথি। পবিমলের কথাগুলি শুধু নয়, গলাব স্বরটাও অদ্ভুত। শান্ত অথচ কঠিন এক কণ্ঠের ভাষা। মনে হয়, ঐ সুন্দর চেহারাটা নিজের গর্বে শেষবাবেব মতো কতগুলি সুন্দর কথার ছলনা রেখে দিয়ে চলে যাচ্ছে। কিন্তু কোথায়? ঐ রূপের চেহাবা কি নতুন কোন ঠাঁই পেয়ে গেল? সন্দেহ হয় বীথিব। কি দুঃসহ এই সন্দেহ!

খাটেব উপর থেকে নেমে, আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে পবিমলের চোখেব সামনেই শক্ত হযে দাঁড়ায বীথি।—চাকবিটা তো ভুয়ো। তবে রোজ রোজ কোথায় যাও, আব কেনই বা যাও?

উত্তর দেয় না পবিমল, বাইবেব সিঁড়িব দিকে দৃষ্টি ঘুবিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বীথিকাব মুখেব দিকে যেন আব তাকাতে চায় না পবিমল।

বীথিকা বলে – জায়গাটাব নামটা বলতে দোষ কি?

উত্তব দেয় না পবিমল। নিঃশব্দে যেন এই এক বছবেব বঙীন বন্ধন তুচ্ছ কবে চ'লে যাবাব জন্য একটা মুক্তিপথেব দিকে তাকিযে দাঁড়িয়ে আছে পবিমলেব বুকেব ভিতবেব একটা প্রতিজ্ঞা।

বীথিকা বলে—সে জায়গাটা বুঝি আমাব চেয়ে অনেক বেশি সুন্দব?

মুখ ফিবিয়ে বীথিকাব দিকে তাকায পবিমল।— সে জায়গাটা হ'লো একটা দোকান।

— দোকান? দোকানে গিযে জাযগা নিযেছ? কেন?

— নিতে হলো, নিতে হয।

—ক তদিন থেকে?

—এইতো তিনদিন হ'লো, বিশটা দিন ঘুবে ঘুবে তবে পাওয়া গেছে।

দপ্ ক'বে বীথিকাব সন্দেহটাবই বঙ বদলে যায। বিস্ময়েব সুবে চেঁচিয়ে ওঠে বীথিকা—কিন্তু দোকানে ব'সে কি কব তুমি?

উত্তব দেয না পবিমল।

পবিমলেব মুখেব দিকে অপলক চোখে তাকিযে থাকে বীথি। এত ভাল কবে খুঁটিয়ে খুঁটিযে পবিমলেব মুখেব চেহাবা জীবনে বোধ হয় কোনদিন লক্ষ্য কবে নি বীথি। অনেক ময়লা হযে গিয়েছে পবিমলেব মুখেব বঙ। কপালেব উপব যেন বোদে-পোড়া একটা বিবর্ণতাব ছাপ। হাড় দেখা দিয়েছে গলাব দু'পাশে। হাত দুটোব মধ্যেও যেন পাথবঘাঁটা একটা ককশতা ফুটে উঠেছে।

দরজার পথ আটক ক'রে দাঁড়ায় বীথিকা। পরিমলের একটা হাত দু'হাতে শক্ত ক'রে ধরে। দুঃসহ কৌতূহলে অস্থির দু'চোখের তারা সুস্থির ক'রে পরিমলের উদাস মুখের কাছে প্রশ্ন করে।—বলো, দোকানে বসে কি কর তুমি ?

পরিমল—কাজ করি। আশি টাকা মাইনে।

আস্তে আস্তে নত হয়ে আসে বীথিকার মাথা। কিসের ভারে অথবা কিসের ঝোঁকে, বুঝতে পারে না বীথিকা। পরিমলের একটা হাতের উপর কপাল নামিয়ে দিয়ে অলস ও অবসন্নের মত প'ড়ে থাকে বীথিকার মাথা। উদ্‌ভ্রান্ত জীবনের সব আক্ষেপ ও অভিযোগ মিটে গিয়ে শুধু একটা তৃপ্তি যেন প'ড়ে আছে।

পাশের ফ্ল্যাটে দেয়াল ঘড়ি টিক্ টিক্ করে। মাথা তোলে না বীথি, তুলতে ইচ্ছাই করে না। বীথি নিজেই বুঝতে পারে না, এ কোন্ চেহারার গায়ে জীবনে এই প্রথম এরকম প্রণামের ভঙ্গীতে সে আজ মাথা ঠেকিয়ে রয়েছে।

—বীথি। বিচলিতভাবে ডাক দেয় পরিমল।

মুখ তুলেই বীথি জিজ্ঞাসা করে।—দোকানে বুঝি থাকবার জায়গা আছে ?

—দোকানের কাছেই আছে।

—কেমন জায়গা ?

—একতলার একটা ছোট ঘর।

একটা সুন্দর প্রতিধ্বনি যেন আছড়ে এসে পড়ে বীথিকার অন্তরাত্মার উপর। একটা ছোট ঘর! স্বামীর সঙ্গে থাকবার মত ঘর! এতদিন ধ'রে ঘর চিনতে দেয় নি, ঘর করবার রীতি শিখতে দেয় নি বন্ধ্যা নাগিনীর মতো যে বিষাক্ত একটা সাধের ভুল, সে ভুলটা যেন নিজের লজ্জায় জ্বলে পুড়ে ম'রে যায় এই ছোট একটি প্রতিধ্বনির স্পর্শে।

সব নিঃশ্বাসের চাঞ্চল্য সংযত করে মুখের উপর সূক্ষ্ম একটা তুষ্টু হাসির ছায়া ছড়িয়ে বীথি প্রশ্ন করে—তাহ'লে সেই ঘরেই যাচ্ছ ?

—হ্যাঁ।

—আমাকে নিয়ে যাবে না ?

—তুমি তো যেতে পারবে না।

—পারবো, যদি একটা কথা দাও।

—বলো।

গুলমোরের মাথা থেকে একটা ঝ'ড়ো বাতাস ঘরের ভিতরে আছড়ে এসে পড়ে। থর থর করে কেঁপে ওঠে বীথিকার ত্রিশ-বছর বয়সের ভঙ্গি-মনোহর সুকঠিন ভ্রূলতা। হীরা গলানো বেদনার মতো দুটো বড় বড় স্বচ্ছ ও তপ্ত জলের ফোঁটা টলমল ক'রে ওঠে দু'চোখের কোণে। বীথি বলে—বলো, চিরকাল আমাকে ঘেন্না করবে, আর ছেলেকে ভাল বাসবে?

দপ্‌ ক'রে আলো কি আশ্চর্য, আলো নিভে যায়। যাঃ, লোকটা ঝট্‌ ক'রে সুইচ টিপে দিয়েছে। পাশের বাড়ির ছাদে আর সামনের বাড়ির দোতলায় এতগুলি দর্শক চক্ষু হঠাৎ হতাশ হ'য়ে যায়। এত কাছাকাছি দু'টো ব্যাকুলতা চরম মীমাংসা খুঁজতে গিয়ে এই নবীন ঘরটাকেই যেন হঠাৎ মিথ্যা ক'রে দিল আর অন্ধকারে লুকিয়ে পড়ল।

সকালের আলো দেখা দিতে আরও মিথ্যা হয়ে গেল নীলকমলের তিনতলার ফ্ল্যাটের নবীন ঘর। এরই মধ্যে কে জানে কখন্‌ এসে ঘর, ঘরের ফার্নিচার আর ঘরের চাবির জিম্মা নিয়েছে দারোয়ান। ভদ্রলোক আর মহিলা নেমে এসে দাঁড়িয়েছে ফটকের কাছে। রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে আছে একটা ট্যাক্সি, কেরিয়ারে জিনিসপত্র বাঁধা।

এ ফ্ল্যাট আর ও ফ্ল্যাটের জানালায়, পাশের বাড়ির ছাদে আর সামনের দোতালার বারান্দায় অনেকগুলি নারীচক্ষুর সমাবেশ কৌতূহলে ছটফট করে। কি আশ্চর্য, মহিলার সিঁথিতে যে সিঁদুর দেখা যায়। তার উপর আবার মাথায় কাপড়। এতদিন পরে? কি মনে ক'রে?

ট্যাক্সি স্টার্ট নেবার সঙ্গে সঙ্গে পাশের বাড়ির ছাদ বলে ওঠে—স্বামী স্ত্রী, নিশ্চয়ই স্বামী স্ত্রী।

তিনতলার ফ্ল্যাটের জানালা দু'টা বন্ধ। গুলমোরের মাথায় বাসি রজনী-গন্ধার একটা গুচ্ছ আটকে প'ড়ে রয়েছে। তার উপর প'ড়েছে পুব আকাশের একটুখানি আলো। দেখলে সত্যিই আশ্চর্য না হয়ে পারা যায় না, যেন কোথাকার এক নববধূ এসে ঐ নবীন ঘরে মাত্র একটা বাসররাত কাটিয়ে দিয়ে, সকাল হ'তে না হ'তেই নতুন ঘরে চলে গেল।

মান্না মানিক

মানিক আর মানিক স্টোর্সের বয়স সমান। একই দিনে মানিক আর মানিক স্টোর্সের জন্ম। কিন্তু বয়সটা কত?

মাত্র তিন বছর। বিগত তিনটি বছরের বাতাসে একটু একটু ক'রে বড় হয়ে মানিক আজ চার বছরে পা দিল। আজ মানিকের জন্মদিন।

কিন্তু মানিক স্টোর্সেরও কি জন্মদিন? বিগত তিনটি বছরের বাতাসে একটু একটু ক'রে কেমনতর হ'য়ে শেষ পর্যন্ত কি হয়ে গেল মানিক স্টোর্স, সে কথা আপাততঃ থাক।

আজ আবার সেই এগারই চৈত্রটি দেখা দিয়েছে, আজ থেকে তিন বছর আগে যেদিনে মানিক আর মানিক স্টোর্স দেখা দিল পৃথিবীতে।

তিন বছর আগের সেই অদ্ভুত একটা দিনের ইতিহাসই সবার আগে বলে নিতে হয়। এই পাড়ার এবং এই ঘরেরই জানালার কাছে বসে তিন বছর আগের সেই এগারই চৈত্রকে দু'চোখের বিস্ময় দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করেছিল নরেন, এবং বুঝতেও পেরেছিল।

আকাশের রঙটা যেন কেমন-কেমন মনে হয়; মল্লিকবাবুদের বাগানে মস্ত বড় অশথের মাথায় বুকে ও কোলে লক্ষ লক্ষ নতুন পাতা ঝিরঝির করে। দেখা যায়, ঘুঁটেওয়ালির ঘরের চালা ছাপিয়ে মালতীর লতা নরেনের বাড়ির উঠানের উপর এসে নেমে পড়েছে। বাতাসের গা থেকে দুপুরের জ্বালা পালিয়ে যায়, হঠাৎ কেমন মিষ্টি-মিষ্টি আর ফুরফুরে হয়ে ওঠে। বড় অদ্ভুত এই দিনটা। আর অদ্ভুত, অশথের এই লক্ষ লক্ষ কচি পাতার ভিড়। যেন লক্ষ লক্ষ শিশু-প্রাণের কতগুলি পিপাসী ওষ্ঠ। যেমন কোমল, আর রঙটাও তেমনি, নতুন শোণিতের আভার মত।

হঠাৎ শাঁখের শব্দ বেজে ওঠে পাশের ছোট ঘরটার ভিতর। সে শব্দে রঙীন হ'য়ে ওঠে নরেনের মুখ। ঐ শাঁখের শব্দে এগারই চৈত্রের সমস্ত আলো ছায়া আর শব্দগুলি যেন একটা ফুল হয়ে ফুটে উঠল।

ছোট বাড়ি, ছোট দুটি ঘর, এবং ছোট একটা উঠান। পাড়াটাও ছোট,

এবং প্রতিবেশীরাও ছোট ছোট মানুষ। কিন্তু এইসব ছোটত্বার মধ্যেই মুহূর্তের ভিতরে মস্ত বড় একটা জগতের গর্ব এনে দিল ঐ শাঁখের শব্দ।

ছোট ঘরের ভিতর প্রতিবেশিনী মেয়েদের ভিড়। উঠান ভরা কলরব আর চাঞ্চল্য। সব শব্দের স্নায়ুজাল জড়িয়ে একটা নবাগত প্রাণের কান্না থেকে থেকে কেঁপে উঠছে।

ধাই এসে ডাক দেয়—কই গো ছেলের বাপ? ছেলের কপালে সোনা ছুঁইয়ে মুখ দেখে যাও।

বাক্স হাতড়ে সোনা খোঁজে নরেন। সত্যিই তো, এই আনন্দকে সোনা ছুঁইয়ে অভ্যার্থনা করাই তো উচিত।

আরও বেশি আহ্লাদের সুর ছড়িয়ে ধাই ছড়া কাটে—মানিক এল ঘরে। এ মানিক যেমন তেমন নয়, মানিকের ছোঁয়া লেগে ধুলো সোনা হয়!

ধাইয়ের ছড়া বর্ণে বর্ণে বিশ্বাস করতে পারে নরেন। মনে হয়, একটুও বাড়িয়ে বলে নি ধাই। ছেলের কপালে সোনা ছুঁইয়ে ঘরের বাইরে এসে একবার দাঁড়ায় নরেন, যদিও আর বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার সময় ছিল না। কারণ, আজ তার জীবনের আর একটা সোনা-ছোঁয়ানো আকাঙ্ক্ষার প্রতিষ্ঠার দিন।

এই ছোট পাড়া থেকে বেশ কিছুটা দূরে, বাজারের দিকে অনেকখানি এগিয়ে যাবার পর, পথের পাশে সারি সারি অনেকগুলি টিনের একচালা ঘর দেখা যায়। এর মধ্যে একটি একচালা ঘর ভাড়া নিয়েছে নরেন। নরেনের দোকান। রকমারি পুতুল, লেস, ফিতা, আলতা, এসেন্স, বিস্কুট, লজেন্স ও চকোলেটের সম্ভার রাধাবাজারের মহাজনের আড়ত থেকে চলে এসেছে। মহাজনের লোক এবং মুটে অনেকক্ষণ থেকে দোকানী নরেনের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে।

ছোট একটি মাটির গণেশ, কিছু ফুল এবং একটি ধূপদান হাতে নিয়ে একচালা ঘরের কাছে এসে থামল নরেন। জিনিস-পত্র বুঝে নিয়ে মহাজনের লোককে বিদায় দিল। ধূপ জ্বালিয়ে সিদ্ধিদাতা গণেশের পায়ের কাছে সোনার একটা কুচি এবং ফুল রেখে প্রণাম করে নরেন। খেরো বাঁধানো একটা খাতার উপর চন্দনের ফোঁটা দিয়ে বার বার তিনবার প্রণাম করে।

টিনের চালা এবং কাঁচা ইটের দেয়াল, ছোট্ট এই দোকান ঘরকে ভরে তুলতে খুব বেশি জিনিসের দরকার হয় না। সব জিনিস সাজিয়ে ফেলতে খুব বেশি সময়ও লাগে না।

দোকান সাজান হলো। হ্যাঁ, আর একটি কাজ বাকি আছে। দোকানের নামকরণ।

খুব পয়া নাম দিতে হবে, যে নামের দৈবী প্রভাবে নরেনের জীবনের সব দীনতা ঘুচে যাবে। ভাগ্যের দুয়ার খুলে যাবে যে নামের অমোঘ গুণে, সেইরকম একটি সোনামাথানো নাম চাই। যে নাম নরেনের কারবারী আকাঙ্ক্ষাকে লাভে-লাভে সোনা ক'রে দেবে, সেইরকম একটি সর্বশুভ নাম।

এগারই চৈত্রের আত্মাটা যে আনন্দে মুখর হয়ে উঠেছে, সেই আনন্দেই কে যেন নরেনের বুকের ভিতরে মুখ এগিয়ে দিয়ে ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে বলে গেল—ওর নাম মানিক।

জ্বলন্ত ধূপকাঠি সৌরভ ছড়ায়। চুপ করে ভাবতে থাকে নরেন। তার পরেই প্যাকিং বাক্স থেকে একটা তক্তা খুলে নিয়ে তার উপর আঠা দিয়ে সাদা কাগজ সেঁটে দেয়। নীল-লাল পেন্সিল দিয়ে বড় বড় অক্ষরে লেখে—মানিক স্টোর্স।

ছেলের নাম মানিক এবং দোকানের নাম মানিক স্টোর্স। নরেনের জীবনে দু'টি সৌভাগ্যের আবির্ভাব দিবস হ'লো এই এগারই চৈত্র। দু'টি সোনা-ছোঁয়ানো ঘটনার নামকরণের দিবস হ'লো এই এগারই চৈত্র।

মানিক আর মানিক স্টোর্স, যেন দুটি যমজ ভাই ভূমিষ্ঠ হয়েছে একই দিনের এক সকালে, একই সোনা ছোঁয়ানো আশার শঙ্খধ্বনির সঙ্গে। সত্য সত্যই মনে প্রাণে বিশ্বাস করে নরেন, সুখের দিনের শুরু হলো এবার। না হ'য়ে পারে না। নইলে, দু'টি সম্পদের আবির্ভাব কেন এমন ক'রে প্রায় লগ্নে লগ্নে মিলে যায়?

মানিক স্টোর্স ও দেখতে মানিকের মতোই, ছোট্ট অথচ বড় সুন্দর করে সাজানো। সন্ধ্যাবেলা আলো জ্বেলে মানিক স্টোর্সের রঙান রূপের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে যায় নরেন। কত জিনিস ধরেছে এইটুকু জায়গার মধ্যে! পাঁচ টাকা দামের চীনে-মাটির ফুলদান থেকে শুরু ক'রে এক পয়সা দামের বাংতার রিস্টওয়াচ। রঙীন রবারের বেলুন দুলতে থাকে, দার্জিলিং পাথরের রঙীন মালা ঝুলতে থাকে, কাগজের বাঘের লাল জিভ লক্‌লক্‌ করে। রাত হলে বাতি নিভিয়ে দোকানের ঝাঁপ বন্ধ ক'রে যখন বাড়ি ফিরবার জন্য তৈরী হয় নরেন, তখন মনটাও কেমন যেন একটু ভার ভার বোধ হয়। ছোট্ট মানিক

স্টোর্স কে এভাবে সারা রাত একা একা অন্ধকারের মধ্যে রেখে দিয়ে চলে যেতে ভাল লাগে না। বাড়ি ফিরে গিয়ে দেখতে পায় নরেন, মানিক তার ছোট নরম বিছানার উপর ঘুমিয়ে রয়েছে।

মানিক আর মানিক স্টোর্সের মধ্যে মায়ার পার্থক্য করতে চায় নি নরেন। করবার দরকারই বা কি? ওরা হলো নরেনের জীবনের একই লগ্নে আবির্ভূত একই ভাগ্যের দু'টি আশীর্বাদ।

ভবিষ্যৎটাকেও খুব সহজে হিসাব ক'রে বুঝতে পারে নরেন। খুব বেশি ক'রে নয়, খুব কম ক'রেই লাভের অঙ্কগুলিকে কল্পনা করে। প্রথম বছরের বিক্রিতে লাভ যা হবে, তাতে শুধু খরচটাই উঠে আসবে। এর বেশি আশা করা উচিত নয়। দ্বিতীয় বছরটায় ভাল লাভ হবেই হবে। মাসে অন্তত এক মণ বিস্কুট কেটে যাবেই, এবং তাতে লাভের হিসাবে প্রতি মাসে চলে এল কুড়ি বাইশ টাকা। এই রকমের আরও তো পঁচিশটি বড় রকমের চলতি মাল রয়েছে। রকম পিছু যদি মাসে দশ টাকা ক'রেও লাভ আসে, তবে সারা মাসের লাভ হবে গিয়ে•• ভালই তো হবে।

হবেই হবে, কোন সন্দেহ নেই নরেনের মনে। মানিক স্টোর্স, তার জীবনের সব চেয়ে সুন্দর ও সুপ্রসন্ন দিবসের আত্মার নামে, তার ছেলের নামে নাম দেওয়া হয়েছে এই দোকানের। লাভ হবেই হবে, ঐ মানিক নামের মধ্যেই সব সাফল্য ও উন্নতির যাদু লুকিয়ে রয়েছে।

—কমলা, কমলা, ও ছেলের মা। ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?

চেঁচিয়ে ডাক দেয় নরেন। কমলা কাছে আসতেই নরেন বলে—আর ভাবনা করি না।

কমলা—কিসের ভাবনা?

নরেন—টাকা-পয়সার ভাবনা।

কমলা—বড়লোক হয়েই গেছ নাকি?

নরেন—হই নি, হবো।

কমলা—হও।

নরেন—হবোই তো।

গলার স্বর একটু নামিয়ে ফিসফিস ক'রে নরেন বলে—আমার কেমন একটা বিশ্বাস হ'য়ে গেছে কমলা, মানিকের নামে যখন দোকানের নাম দিয়েছি, তখন লাভ হবেই। এ দোকান জমে উঠবেই।

কমলা বলে—আমারও তাই মনে হয়

মানিক স্টোর্সের প্রথম পাঁচ মাসের বিক্রির হিসেব করতে গিয়ে অনেক যোগ-বিয়োগ আর গুণ-ভাগের অঙ্কে খাতা ভরে ফেলল নরেন। বোঝা গেল, লাভ তেমন কিছু হয় নি, ক্ষতিও তেমন কিছু নয়। কিন্তু প্রথম পাঁচ মাসে এর চেয়ে আর কি বেশি আশা করা যায়?

এক গুচ্ছ ধূপকাঠি জ্বালিয়ে এবং মাটির গণেশের চার দিকে ধুনোর ধোঁয়া বার বার ছড়িয়ে নরেন তার খেরোবাঁধানো খাতাটার উপর বার বার মাথা ঠেকায়। মনে পড়ে, পূজা আসতে আর বেশি দেরি নেই। এইবার বাজার জমবে। বিক্রির জোর খুব বেশি হ'লে একটা চাকর না রেখে পারা যাবে না।

পাশের দোকানে আলুওয়ালা অমূল্যকে ডাক দিয়ে নরেন প্রশ্ন করে—ও অমূল্যদা, একটা লোক দিতে পার? শুধু সকালটা আর সন্ধ্যেটা আমাকে একটু সাহায্য করবে।

অমূল্য আশ্বাস দেয়—লোকের আর অভাব কি?

কিন্তু পূজাও এল, এবং পূজার বাজারও জমল। তবে মানিক স্টোর্সকে তার জন্য একটুও ব্যস্ত হবার কারণ দেখা দিল না। এদিকে নয়, এ রাস্তাতেও নয়, পূজার সাড়া জাগল গিয়ে একেবারে ঐদিকে, মোড় পার হয়ে, বড় বড় নতুন স্টলের লাইনে।

ছোট মানিক স্টোর্সে গ্যাসবাতি জ্বলে অনেক রাত পর্যন্ত। অনেক ধূপ-কাঠি পোড়া এবং ধুনোর ধোঁয়াতে ছোট দোকান-ঘরের বাতাস বড় বেশি পবিত্র হয়ে যায়। কিন্তু কোন গ্রাহকের পদধ্বনি এ দোকানের কাছে এসে থামে না। পথচারীর দল যেন সন্ন্যাসীর মত নির্বিকার দৃষ্টি দিয়ে মানিক স্টোর্সের এত রঙীন সমারোহের দিকে তাকাতে তাকাতে চলে যায়। সবারই লক্ষ্য ঐ মোড়ের দিকে। সেই বড় বড় স্টল, যেখানে রেডিও বাজে, পাখা ঘোরে, এবং জিনিস তো নয়, জিনিসের পাহাড় যেন থরে থরে সাজানো রয়েছে।

কিন্তু এক পূজাতেই তো বাজারের ইতিহাস ফুরিয়ে যায় না। আসছে বছরও পূজা আসবে। মানিক স্টোর্সের এই ছয় মাসের পরিণামকেই ভাগ্যের চরম ব'লে মেনে নিতে রাজি নয় নরেন। দুর্বল নয় নরেন। আশা করবার সাহস এত সহজে ফুরিয়ে দেবার মানুষ নয় নরেন।

আর এক পূজা আসবার আগেই এগারই চৈত্র দেখা দিয়ে চলে গেল।

বড় হয়েছে, এবং আবও ফুটফুটে হয়েছে মানিক। এবং মানিক স্টোর্স আর একটু বঙীন হয়েছে, ধারে কেনা নতুন নতুন রাধাবাজারী মনোহাবীর সম্ভাবে। জন্মদিনেব উৎসবে চন্দনেব ফোঁটা পড়েছে মানিকেব কপালে এবং মানিক স্টোর্সের সাইনবোর্ডে।

লাভ-লোকসানেব হিসাব খতিয়ে দেখেছে নবেন। হিসাবের অঙ্কগুলিব দিকে তাকিযে যদিও বিষণ্ণ হয়েছে, তবুও আশা ছাড়ে নি, ববং আবও বেশি করে ধূপকাঠি জ্বালিয়েছে। বিশ্বাস কবে নবেন, এ লোকসানেব বিভীষিকা আব বেশি দিন থাকবে না।

লোকসানেব বিভীষিকাকে দূবে সবিযে দেবাব একটা উপাযও অনেক চিন্তা ক'বে খুঁজে বেব কবেছে নবেন। এবাব থেকে প্রতিদিন সকালে মানিককে কোলে ক'বেই দোকানে নিয়ে আসে। দোকানেব মাঝখানে ছোট একটা বাক্সেব উপব মানিককে বসিযে বাখে। কাঠেব ঘোড়া নিয়ে খেলা করে মানিক। ঘণ্টা খানেক পবে ঘুঁটেওযালি এসে মানিককে কোলে ক'বে বাড়িতে নিয়ে যায়।

বিশ্বাস কবে নবেন, মানিক এসে এইভাবে একবাব এই দোকানেব বাতাস স্পর্শ ক'বে গেলে, দোকানেব বিক্রি বাড়বে। এবং বিশ্বাসেব পবীক্ষাতেই আবও একটা বছব কেটে গেল। আবাব এগাবই চৈত্রেব সকাল বেলায মানিকেব কপালে এবং মানিক স্টোর্সের সাইন বোর্ডে চন্দনেব ফোঁটাও পড়ল।

কিন্তু বিক্রি বাড়ে নি। দোকান ভাড়া বাকি পড়েছে। মহাজন কড়া তাগিদ দিযে গিযেছে। মহাজনেব একটা কিস্তি শোধ কবতে গিয়ে কমলাব গলাব হাবটা বেচে দিতে হয়েছে।

আজকাল আব মানিককে সঙ্গে নিযে আসে না নবেন। কিন্তু আজকাল আরও বেশি ব্যস্ত হযে উঠেছে নবেন। ভোব হতে না হতেই এসে দোকানেব ঝাঁপ খুলে ধূপ জ্বালে। দিনে দু'বাব ক'বে ধুলো মযলা মুছে মানিক স্টোর্সকে আবও তকতকে এবং ঝকঝকে ক'বে বাখে। বোগী শিশুব পিতা যেমন মনেব উদ্বেগে ঘুমোতে পাবে না, প্রায় সেইবকমই দশা হয়েছে নবেনেব। ছোট বঙীন মানিক স্টোর্স, শিশুব মতই তো দেখতে, এবং বোগেও ধবেছে। উদ্বিগ্ন বিষণ্ণ ও ব্যস্ত না হযে পাবে না নবেন।

কিন্তু কি নিষ্ঠুব বোগ! মুক্তিব কোন লক্ষণ দেখা যায় না। ধাবেব উপর ধার বেড়েই চলেছে। মহাজন মামলাব ভয় দেখিয়ে গিযেছে। বাড়িওয়ালা

অপমান করেছে। কমলার গায়ের সোনা এক এক ক'রে বেচে দিয়ে কোনমতে আজও মানিক স্টোর্সকে বঙীন ক'রে রাখবার খরচ যুগিয়ে চলেছে নরেন। আলুওয়ালা অমূল্য-দা'ও বিরক্ত হয়ে বলে—ও নরেন, এমন দোকান কি না রাখলেই নয়?

কি আশ্চর্য, তবুও মানিক স্টোর্সের উপর একটুও বাগ হয় না নবেনেব। দোষ মানিক স্টোর্সের নয়। কোথায় যেন একটা ভয়ানক ভুল হয়ে গিয়েছে, তাবই জন্য মানিক স্টোর্সেব এই দুর্ভাগ্য। যে বিশ্বাসটা বলতে গেলে এতদিন ধবে নবেনেব বুকেব প্রতি অস্থি জড়িয়ে বড় হ'যে উঠেছিল, সেই বিশ্বাসটাই ভাঙতে আবম্ভ কবেছে। তাই সন্দেহ, মানিক স্টোর্সেব ভাগ্যেব সঙ্গে একটা অপয়া স্পর্শ মিশে বয়েছে নিশ্চয়, নইলে…নইলে এমন ক'বে সব আশা চূর্ণ হয়ে যাবে কেন?

সন্দেহটাই ক্ষণে ক্ষণে মনেব ভিতব প্রশ্ন জাগায়, কিসেব অপয়া স্পর্শ? কাব স্পর্শ? কালো ছায়া দিয়ে তৈবী একটা কুৎসিত মুখ যেন ফিস্‌ফিস্ ক'বে বলে—নিজেব ছেলে হ'লে হবে কি? ঐ তোমাব ছেলেটিই যে অপয়া। হিসেব ক'বে দেখ, সেই এগাবই চৈত্রেব পব থেকে আজ পর্যন্ত কপাল তোমাব পুড়েই চলেছে। ক্ষতি আব ক্ষতি, লোকসান আব লোকসান। ছেলের নামে দোকান কবেছ, ঐ নামটা যে অপয়া।

ভাবতে গিয়ে কপাল টিপে ধবে নবেন। কি দুর্ভাগ্য, এমন সন্দেহও মানুষেব হয়! মাঝে মাঝে নিজেব মাথাটাকেই সন্দেহ কবে নবেন, খাবাপই হয়ে গিয়েছে বোধ হয়।

তবু, এমন সন্দেহেব একটা হেস্তনেস্ত ক'বে ফেলাই উচিত। আবাব একদিন মানিককে কাজলেব টিপ পবিয়ে আব মুখে পাউডাব মাখিয়ে দোকানে নিয়ে গেল নবেন।

বঙীন মানিক স্টোর্স। একটা নতুন জগতেব আস্বাদ পেয়ে নতুন ক'বে চঞ্চল হয়ে উঠল মানিকেব কৌতূহল দুবন্ত দুটি চোখের দৃষ্টি আব দুটি ছটফটে হাত। প্রথমেই নাটাই ববা লালবঙা বিবন আব ফিতেগুলিকে খুলে তছনছ কবে মানিক। তাবপবেই সোনালী বঙেব কাগজে জড়ানো লজেন্সেব বয়ামেব মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিল। মানিকেব চঞ্চল হাত ক্ষান্ত হয় না। তাকেব উপব থেকে কতগুলি টিনেব বাঁশি এক থাবা দিয়ে ঠেলে নিচে ফেলে দিল মানিক। নিষ্পলক ও সতর্ক দুই চক্ষুব দৃষ্টি তুলে নবেন লক্ষ্য করতে থাকে,

কোন্ কোন্ জিনিস স্পর্শ করছে মানিকের হাত, ঐ মিষ্টি মিষ্টি এবং আদুরে-কোমল ছুটি কচি-কচি হাত।

ঘুঁটেওয়ালি এসে মানিককে নিয়ে যায়। সারাদিন ধ'রে দোকানদারি করে নরেন। সন্ধ্যা পাব হলো, রাতও বেশ হলো। এইবার তার সন্দেহের হিসাবটাও বেশ সাবধানে যাচাই ক'রে নিল নরেন। ঠিকই হয়েছে, কোন ভুল নেই। যে জিনিসগুলি মানিক আজ সকালে ছুঁয়ে দিয়ে গিয়েছে, ঠিক সেই জিনিসগুলিই বিক্রি হয় নি। এক পয়সাব একটা টিনের বাঁশিও বিক্রি হয় নি। এইটুকু ছেলেব কতটুকু দু'টো হাত, কিন্তু কি ভয়ানক হাত।

ঝাঁপ বন্ধ কবার আগেই বাড়িওয়ালা ও রাধাবাজারেব তিন মহাজন দোকানের সামনে উগ্রমূর্তি নিয়ে উপস্থিত হয়! মহাজন গালি দিয়েই বলে—এ'কে দোকানদাবি বলে, না চুবিবাজি বলে? মহাজনেব টাকা আটক ক'বে কাববার ফলাচ্ছ, এ কেমন ধাবা কারবাব হে?

নবেন বলে—টাকা নেই তো দেব কেমন ক'বে?

মহাজন—তবে মাল ফেবত দাও।

নবেন—তাই দেব।

মহাজন—কবে?

নরেন—কাল সকালে। খুব সকালে।

আলো নিভিয়ে দোকানের ঝাঁপ বন্ধ কবাব সময শো কেসেব কাঁচটা চিক্‌মিক্ করে উঠতেই মুখ ফিবিয়ে পিছনেব দিকে তাকায় নবেন। পাকেব মাঝখানে একটা তালগাছ দাঁড়িয়ে আছে, তাব উপর একটা ভাঙা চাঁদ, এবং তাবই জ্যোৎস্না এসে ছুঁয়েছে মানিক স্টোর্সে'ব শো-কেসেব কাঁচ। বাস্, এই তো শেষ। মানিক স্টোর্সে'ব জীবনকে আর কোন বাতেব জ্যোৎস্না ছুঁতে আসবে না।

চাঁদটাও চেনা চেনা। আজ তাবিখটা কত? এক মুহূর্তেই মনে পড়ে যায়, আজ হলো দশই চৈত্র এবং চাঁদটা হলো সেই এগাবই চৈত্রেব আগেব রাতেব চাঁদ।

বাত ফুবোতেই দেখা দিল সেই প্রত্যাশিত কাল! চৈত্র মাসেব এগাব। কমলাকে কোন কথা না জানিয়ে, এবং সূর্য ওঠবার আগেই বেব হয়ে গেল নরেন।

বাগবাজারের তিন মহাজন এবং বাড়িওয়ালা আগেই [illegible] দাঁড়িয়েছিল নিঃশব্দ ও ঘুমন্ত মানিক-স্টোর্সের সম্মুখে। ঝাঁপ খুলে দোকানে ঢুকেই দু'হাত দিয়ে হিড়হিড় ক'রে জিনিসসুদ্ধ একটা তাক নামিয়ে ফেলে নরেন।

মহাজন বলে—আহা, এলোমেলো করো না। আমরাই লিষ্টি ক'রে ফেলছি, তুমি শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ।

জিনিসপত্রের লিষ্টি করতে এবং দামের হিসাব করতে খুব বেশি সময়ও লাগল না। তিন মহাজন ও বাড়িওয়ালা হিসেব ক'রে মাল ভাগাভাগি ক'রে ফেলে। বাড়িওয়ালা বলে—তাহ'লে নরেন, এইবার তোমার কাছে পাওনা গিয়ে দাঁড়ালো মোটমাট বাষট্টি টাকা বার আনা।

উত্তর দেয় না নরেন। তাকিয়ে দেখে, 'মানিক-স্টোর্স' সাইন বোর্ডটা ঝুলছে। যেন চিতায় চড়ানো মানুষের মুখটা এখনো দেখা যাচ্ছে, পুড়ে ছাই হয়ে যায় নি। এক লাফ দিয়ে একটা টুলের উপর উঠে দাঁড়ায় নরেন। এক টান দিয়ে সাইনবোর্ডটাকে খুলে নিয়ে মাটির উপর ছুঁড়ে দেয়। সাইন-বোর্ডের লোহার আংটা ক্ষীণ আর্তনাদ ক'রে দূরে ছিটকে পড়ে।

আলুওয়ালা অমূল্যদা ডাকে—ও নরেন, এখানে এসে বসো।

বসল না নরেন। সোজা বাড়ির দিকেই ফিরে চলল। যেন জীবনের এক রঙীন আকাঙ্খার শব চিতায় তুলে দিয়ে ধীরে ধীরে হেঁটে চলে যায় এক শোকার্তের মূর্তি।

ঘরে ঢুকেই মেঝের উপর মাদুর পেতে শুয়ে পড়লো নরেন।

কমলা কাছে এসে বিস্মিত ভাবে বলে—শরীর খারাপ হলো না কি?

নরেন—শরীর খুব ভাল।

কমলা—তবে ওঠো?

নরেন—কেন?

কমলা হাসে—কেন, মনে পড়ছে না?

নরেন—না।

শুয়ে শুয়েই পাশ ফিরে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নেয় নরেন।

কমলা বলে—মানিকের জন্য নীল রঙের একটা কামিজ কিনে নিয়ে এস।

নিরুত্তর নরেনের গায়ে হাত দিয়ে ঠেলা দিয়ে কমলা আবার বলে—আর, আধ সের বাতাসা।

নরেন ঘাড় ফিরিয়ে তিক্তস্বরে প্রশ্ন করে—কিসের জন্য ?

কমলা বিস্মিত ভাবে বলে—আজ তোমার মানিকের জন্মদিন।

মাদুরের উপর উঠে বসে নরেন। কমলার দিকে আর একবার তীব্রভাবে তাকিয়ে বলে—আজ হলো আমার মানিক-স্টোর্সের মৃত্যুদিন।

আর্তনাদ ক'রে নরেনের হাত চেপে ধরে কমলা—কি হয়েছে, বলো। বাড়িয়ে বলো না।

নরেন বলে—দোকান উঠে গেল।

আস্তে আস্তে চলে গিয়ে রান্নাঘরে উনানের কাছে এসে বসে কমলা। হাঁটুর উপর কপাল পেতে চুপ ক'রে বসে থাকে। উনানের উপর হাঁড়িতে জল ফুটতে থাকে টগবগ ক'রে। চাল ছাড়তে হবে, একেবারে মনেই পড়ে না। উঠানের দিকে তাকিয়ে কমলার উদাস চোখের দৃষ্টিটাও যেন স্তব্ধ হয়ে থাকে। তারপরেই কেঁদে ফেলে কমলা।

যেন কাঁদছে এগারই চৈত্র। ছেলে হারানো মায়ের কান্নার মতই করুণ।

ওদিকে উঠানের উপর ঘুরে ফিরে নিজের মনে খেলা করে মানিক। ঘুঁটেওয়ালির মালতী লতা ধ'রে একবার ঝাঁকুনি দেয়। প্রজাপতি আর ফড়িং ছটফট ক'রে পাতার আড়াল থেকে উড়ে পালিয়ে যায়। দাওয়ার উপর খাঁচার ভিতর থেকে পোষা টিয়া কর্কশ স্বরে মানিককে ধমক দেয়—ওরে ও ছেলে! খবরদার!

যেন একটা অপয়া আর অলক্ষুনে দিনকে কর্কশ স্বরে ধমক দিচ্ছে খাঁচার টিয়া। মাদুরের উপর শুয়ে শুধু ছটফট করে নরেন, যেন গাড়ির চাকায় চাপা পড়া একটা আহতের শরীর ছটফট করছে। সেই এগারই চৈত্রকে ভালবাসবার শক্তি খুঁজে পাচ্ছে না নরেন, যে এগারই চৈত্রের মায়ালী বাতাস সোনালী স্বপ্ন ছড়িয়ে দিয়েছিল নরেনের চোখে।

বেলা বাড়ে। রোদ তেতে ওঠে। এতক্ষণে কান্না থামিয়েছে কমলা। একেবারে বোবা হয়ে গিয়েছে এই বাড়ির বাতাস। যেন একটা কাঁটা বিঁধেছে এগারই চৈত্রের বুকের ভিতর, তাই তার সব মায়া ফুটো বেলুন-খেলনার বাতাসের মতো বের হয়ে গিয়েছে। মল্লিকবাবুদের অশথ ঝির্‌-ঝির্‌ করে, তবু কোন উৎসবের ইচ্ছা যেন জেগে উঠতে পারছে না নরেনের চোখের দৃষ্টিতে।

ওঘর থেকে মাঝে মাঝে কমলা উঠে এসে একবার এই ঘরের মাদুরের

কাছে দাঁড়ায়। কোন কথা বলে না কমলা, নরেনও কিছুই জিজ্ঞাসা করতে পারে না। চলে যায় কমলা।

বিকেল হয়ে আসছে, ধীরে ধীরে ফুরিয়ে যেতে চলেছে এগারই চৈত্রের দিনের আলোক। যেন এই বাড়ির বিষাদ দেখে ভয় পেয়ে চুপ ক'রে দূরেই সরে রয়েছে মানিকের জন্মদিনের আনন্দ। নরেন আর কমলা, রাধাবাজারী খেলনারই মতো দুটি প্রাণ ভাগ্যের ফাঁকি সহ্য করতে না পেরে যেন এইবার নিজেকেই ফাঁকি দিয়ে মিথ্যে ক'রে রাখবার চেষ্টা করছে। নাই বা হলো মানিকের জন্মদিন। না হলে ক্ষতি কি? আর হলেই বা লাভ কি?

মাদুরের উপর উঠে বসে নরেন। যেন নিজেরই বুকের ভিতরে একটা লজ্জার আর্তনাদ শুনতে পেয়েছে নরেন। একটা দোকানকে ছেলের মতো ভালবেসে আর ছেলেকে দোকানের মতো ভালবেসে একি একটা যাচ্ছেতাই মনের অবস্থা হয়েছে, বুঝতে পেরে নিজেরই উপর রাগ করে নরেন।

কিন্তু এমন রাগেই বা লাভ কি? এমন একটা মিষ্টি শব্দও বাজে না এই ঘরের বাতাসে যে, নরেনের মনের এই অদ্ভুত রাগগুলিকে হাসিয়ে দিতে পারে। খাঁচার টিয়াটাও বোধ হয় ঝিমোতে শুরু করেছে।

ইচ্ছা করে নরেনের, এখনি উঠে গিয়ে হৈ-হৈ ক'রে কমলাকে ব্যস্ত ক'রে তুলতে, আর মানিকের জন্মদিনের আয়োজন করতে। চন্দন ঘষতে, ফুল আনতে আর বাতাসা দিয়ে পায়েস তৈরী করতে। কিন্তু কেমন যেন একটা বিশ্রী অভিমানে মনের ইচ্ছাটাই শক্তি হারিয়ে অবসন্নের মতো পড়ে রয়েছে। বড় অস্বস্তি। ঘর থেকে বের হয়ে ক্লান্তের মতোই ভিতরের দাওয়ার উপর এসে বসে থাকে নরেন।

চমকে ওঠে নরেনের চোখ। দাওয়ার উপর এক কোণে বসে খেলা করছে মানিক। কিন্তু ও কি রকম খেলা! এগারই চৈত্র যেন ঠাট্টা ক'রে নরেনের মনের বাজে শোকগুলিকে একেবারে হাসিয়ে দেবার জন্য খেলা জমিয়ে বসেছে। খাঁচার টিয়াও হঠাৎ চিৎকার করে—ওরে ও ছেলে, ওকি?

টুক্‌রো-টুক্‌রো কাগজ, কতগুলি দেশলাইয়ের খোল, কতগুলি কাঁকর, মালতীলতার কতগুলি পাতা, দুটো ইঁট এবং আরও পাঁচ-সাত রকমের আবর্জনা সাজিয়ে বসে আছে মানিক।

চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে নরেন। তার পরেই গলা ভাঙ্গা স্বরে প্রশ্ন করে নরেন—এ কি হচ্ছে মানিক?

মানিক উত্তর দেয়—আমার দোকানে।

হাসতে গিয়ে চোখে হাত দেয় নরেন। মানিক আবার বলে—ভাল চকোলেট আছে বাবা।

নরেন বলে—দাও, দু'পয়সার চকোলেট দাও।

ছুটো কাঁকর নরেনের হাতে তুলে দিয়ে মানিক বলে—খাও।

খাওয়ার ভঙ্গী ক'রে নরেন বলে—খেয়েছি।

মানিক প্রশ্ন করে—মিষ্টি ?

নরেন বলে—খুব মিষ্টি বাবা।

চোখের কোন ছুটো মুছবার জন্য হাত তুলেই দেখতে পায় নরেন, কমলা এসে দাঁড়িয়েছে।

কমলার বিষণ্ন মুখ স্মিত হয়ে ওঠে।—এ আবার কোন্ খেলা হচ্ছে ?

নরেন বলে—দোকান দোকান খেলছি।

তারপরেই ব্যস্ত হয়ে ওঠে নরেন। এলোমেলোভাবে ঘরের এদিক থেকে ওদিক যায় আর আসে। জামার পকেটে হাত দেয়।

কমলা আস্তে আস্তে বলে—বোধ হয় ভুলেই গিয়েছ যে…।

নরেন বলে—মোটেই ভুলি নি। কি-যেন কি-রঙের জামার কথা বললে তুমি ? নীল রঙের ?

কমলা বলে—হ্যাঁ।

মানিকের কপালে জন্মদিনের আনন্দ এঁকে দেবার জন্য চন্দন খোঁজে কমলা, আর নীল-রঙের জামা কিনতে চলে যায় নরেন।

রামগিরি

—ঐ যে রামটেক পাহাড়, ওর আসল নামটা বলতে পার?

—না।

প্রশ্ন করে ফর্সা ছিপছিপে ছোকরা বয়সের যে মানুষটি, সে হলো এই স্টেশনের তার বাবু।

আর উত্তর দেয়, দেখতে বেশ সুন্দর যে মেয়েটি, সে হলো স্টেশন-মাস্টারের মেয়ে।

নাগপুর থেকে কিছু দূর উত্তরে সুলতানপুর নামে এই স্টেশনে প্রথম চাকরি নিয়ে এসেছে অনুপম। এই তো মাত্র মাস চারেক হলো এসেছে এখানে, টেলিগ্রাফি পাশ ক'রে বছর খানেক ঘরে বসে থাকার পর।

স্টেশন মাস্টার পরেশবাবু সপরিবারে এখানে আছেন এক বছরেরও বেশি সময়। বদলি হবার চেষ্টা করেন, কিন্তু চেষ্টার কোন ফল হয় না। বাংলা দেশের কাছাকাছি অঞ্চলের দিকেই বদলি হবার ইচ্ছা। কারণ, মেয়ের বিয়ে দেবার দরকার দেখা দিয়েছে, বয়স হয়েছে মেয়ের।

বাংলা দেশের কাছাকাছি থাকলে, ঝট ক'রে একটা দিন কলকাতায় গিয়ে দু' একটা সম্বন্ধের খোঁজ-খবর আনা যায়। এমন কি, দরকার হলে মেয়েটাকে সঙ্গে নিয়ে ধীরেনের বাড়িতে একটা দিন থাকাও যায়, আর পাত্রপক্ষ এসে মেয়ে দেখেও যেতে পারে।

পরেশবাবু আর একটু দুশ্চিন্তিত হয়েছেন, ঐ ছোকরা তারবাবু অনুপম এখানে আসার পর থেকে। ছেলেটা তো দেখতে শুনতে মন্দ নয়, কিন্তু... কিন্তু প্রশ্ন হলো এত অল্প মাইনের একটা মানুষের সঙ্গে তাঁর প্রথম মেয়ে রেণুর বিয়ে? না, সম্ভব নয়।

অনুপমের সঙ্গে রেণুর বিয়ের কথাই বা তাঁর মনে আসে কেন?

মনে না এসে পারে না। কারণ, দু'জনের মধ্যে বেশ একটা ভাব হয়েছে ব'লে মনে হয়।

পরেশবাবু জানেন, এ রকম ভাবের ব্যাপার ঐ বয়সে আপনা হতেই এসে

যায়। শুধু একটু চোখে চোখে রাখতে হয়, যেন মাত্রার বাইরে না চলে যায়। রূঢ়ভাবে বাধা দিতে গেলে ফল ভাল হয় না। সব চেয়ে ভাল হলো, ভালয় ভালয় এবং যত শীঘ্র সম্ভব অন্য কোথাও সরে যাওয়া। কিছুদিন অ-দেখার পর এই ধরনের ভাব আপনা হতেই আবার অ-ভাব হয়ে যায়।

অফিস ঘর থেকে বাইরে এসে পরেশবাবু দেখতে পান, হ্যাঁ, ঠিক তাই। প্ল্যাটফর্মের শেষ প্রান্তে দু'জনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রামটেক পাহাড়ের গম্ভীর চেহারার দিকে তাকিয়ে কি জানি কি দেখছে।

সন্ধ্যা হবার ঠিক আগে রেণু বেড়াতে বের হয়ে যাবার আগে একবার এখানে এসে এই প্ল্যাটফর্মের উপর কিছুক্ষণ ঘোরা ফেরা করত। একটু পরেই পার্সেল ক্লার্ক যোশির চারটে ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে কোথা থেকে লাফাতে লাফাতে ছুটে আসত রেণুর কাছে। রেল-ডাক্তার নাইডুর কোয়ার্টারের জানালায় দাঁড়িয়ে নাইডুর স্ত্রী ও বোনেরা হাততালি দিয়ে রেণুকে ডাকত। রেণু তার দল নিয়ে প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে চলে যেত। তারপরেই নাইডুর কোয়ার্টারে মেয়েদের আড্ডা জমে উঠত। এমন কি ওভারসিয়ার যশোবন্তর মা'ও এক জোড়া তাস হাতে নিয়ে চলে আসতেন, এবং আড্ডার গল্প নষ্ট ক'রে দিয়ে খেলা জমিয়ে তুলতেন।

এই তো ছিল রেণুর প্রতি সন্ধ্যার নিয়মিত অভ্যাস। কিন্তু এ নিয়ম ভেঙ্গে গিয়েছে এবং অভ্যাসও বদলে গিয়েছে ঐ ছোকরা তারবাবু আসবার পর থেকে। নাইডুর কোয়ার্টারের জানালায় দাঁড়িয়ে নাইডুর স্ত্রী ও বোনেরা শুধু তাকিয়ে থাকে। হাততালি দিয়ে রেণুকে আর ডাকে না।

পরেশবাবু চুপ ক'রে রামটেক পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন অনেকক্ষণ, তারপর অফিস ঘরের ভিতর থেকে একটা চেয়ার তুলে আনতে বলেন হেড কুলিকে। অডিটরের জরুরি চিঠির ফাইলটাকেও অফিস ঘরের টেবিল থেকে আনিয়ে নিয়ে চেয়ারের উপর বসেন পরেশবাবু।

ফাইলটা কোলের উপরেই পড়ে থাকে। পরেশবাবুর চোখের দৃষ্টি থাকে প্ল্যাটফর্মের শেষ প্রান্তে দাঁড়ানো দুটি মূর্তির দিকে। সূর্য ডুবে আসছে। রামটেকের মাথাটা দেখায় জমাট মেঘের মতো, আর দু'পাশে লাল আলোকের ছটা দিয়ে তৈরী দুটো ডানা। কি দেখছে ওরা? এত মুগ্ধ হয়ে কি দেখছে? আর, মুগ্ধ হ'লেও এতক্ষণ ধরে এত কথাই বা কি আছে বলবার মতো আর শুনবার মতো?

শুধু অনুমানই করতে পারেন পরেশবাবু, কিন্তু শুনতে পান না নিশ্চয়ই, কি কথা বলছে অনুপম আর রেণু।

অনুপম বলে—ঐ রামটেক পাহাড়ই হলো রামগিরি। সেই কালিদাসের সময়ের রামগিরি ; ভাবতে সত্যিই আশ্চর্য লাগে !

রেণু—রাজা বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের কালিদাস ?

অনুপম—হ্যাঁ, কবি কালিদাস। মেঘদূত পড়েছ ?

রেণু—না।

অনুপম—ঐ রামগিরিতে থাকত এক যক্ষ। মেঘের কাছে তার মনের ব্যথার কথা বলত।

রেণু—যক্ষের মনে ব্যথা ছিল কেন ?

অনুপম হাসে—প্রিয়াকে দেখতে না পেয়ে।

হঠাৎ অন্যদিকে কথার মোড় ঘুরিয়ে কালিদাসের যুগ থেকে একেবারে রেলের যুগে এসে পড়ে অনুপম। কথাগুলি অবশ্য রেলের যুগেরই কথা, কিন্তু চোখের মধ্যে কালিদাসের যুগের বা তারও আগের কালের সেই মেঘের দিকে তাকিয়ে থাকা দুটি চক্ষুর ব্যথাই যেন দেখতে পাওয়া যায়।

অনুপম প্রশ্ন করে—পরেশবাবু কি সত্যিই দূরের কোন স্টেশনে বদলি হয়ে যাবার চেষ্টা করছেন ?

রেণু বলে—হ্যাঁ।

অনুপম—তা'হলে।

কোন উত্তর দেয় না রেণু। আনমনার মত রামটেক পাহাড়ের গম্ভীর চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকে। জমাট মেঘের মতো দেখতে রামটেকের মাথার উপর দিয়ে যেন শ্বেতহংসের পালক দিয়ে তৈরী একটা মেঘ আস্তে আস্তে ভেসে চলেছে। ডুবন্ত সূর্যের গায়ের রঙের গুঁড়ো গুঁড়ো আভা এসে পড়েছে সাদা মেঘের উপর।

অনুপম বলে—তোমার সঙ্গে আমার দেখা না হওয়াই ভাল ছিল রেণু।

উত্তর না দিয়ে রেণু আসন্ন সন্ধ্যার ছায়ায় ঢাকা পুবের পাহাড়টার দিকে তাকিয়ে থাকে। পাহাড়ের পায়ের কাছে যেন অদৃশ্য একটা রুষ্ট মেঘ গর গর শব্দ করছে। ছুটে আসছে ডাউন এক্সপ্রেস। ইঞ্জিনের ধোঁয়া একটা ক্রুদ্ধ লালরঙা আলেয়ার মতো দপ দপ ক'রে নাচতে নাচতে ছুটে আসছে।

অনুপম বলে—দেখা হয়েছিল, কিন্তু কথা না হলেই বোধ হয় ভাল ছিল।

রেণু হঠাৎ বলে—আপনি আমার উপর রাগ করেন কেন? বাবাকে বললেই তো পারেন।

অনুপম—বলতে পারি, যদি তুমি সাহস দাও।

রেণু—বলুন, কি সাহস দেব?

অনুপম—বলো, তোমার একটুও আপত্তি নেই।

রেণু—আপনার কি মনে হয় যে, আমার আপত্তি আছে?

অনুপম—আমার যে এই পঁচাশি টাকা মাইনের চাকরি, তার ওপর এখনো পার্মানেন্ট হই নি!

রেণু—ওসব কথা আমার মনেই আসে না।

অনুপম—বলো, সত্যিই আমাকে তোমার ভাল লাগে?

রেণু—বলবো না। যদি এখনো না বুঝে থাকেন, তবে বললেও কোনদিনই বুঝতে পারবেন না।

রেণুর একটা হাত ধরবার জন্য অনুপমের হাতটা হঠাৎ চঞ্চল হয়েই আবার শান্ত হয়ে যায়। চোখে পড়ে, অফিস ঘরের বাইরে প্ল্যাটফর্মের উপরেই চেয়ারে ব'সে আর ফাইল হাতে নিয়ে পরেশবাবুও যেন বামটেক পাহাড়ের শোভা দেখবার জন্য এইদিকে তাকিয়ে রয়েছেন। অনুপমের ডিউটির সময়ও হয়ে এসেছে, বড় জোর আর পাঁচ মিনিট বাকি।

বিরতভাবে অফিস ঘরের দিকে ফিরে আসতে থাকে অনুপম। ওদিকে নাইডুর কোয়ার্টারের জানালায় দাঁড়িয়ে নাইডুর স্ত্রী অনেকক্ষণ থেকে রেণুকে ঘুসি দেখিয়ে ঠাট্টা করছিল। ছোট ওভারব্রিজের উপর দিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে, বেড়াতে বেড়াতে নাইডুর কোয়ার্টারের দিকে চলে যায় রেণু।

এসেছেন ডিভিসনাল ডেপুটি, সুলতানপুর স্টেশনের জীবন ব্যস্ত হয়ে উঠল। ঝাড়ুদার থেকে শুরু ক'রে স্টেশন মাস্টার পরেশবাবু পর্যন্ত সকলেই উদ্বিগ্ন, উৎকণ্ঠ, পরিচ্ছন্ন পোশাক, সময়-নিষ্ঠ ও কর্মব্যস্ত।

ডিভিসনাল ডেপুটি সাহেব হলেন মিস্টার মিটার অর্থাৎ শ্রীযুক্ত মিত্র। বয়স পঁয়তাল্লিশ হয়ে গিয়েছে ব'লে মনে হয়। দেখতে সত্যই বেশ সদাশয়। বেশ হেসে হেসেই কথা বলেন, চোখে অফিসারী ভ্রূকুটি কদাচিৎ দেখতে পাওয়া যায়।

শ্রীযুক্ত মিত্রকে উদারচেতাও বলা যায়। নিজের থেকেই ব্যবস্থা ক'রে

নাইডু, যশোবন্ত আর যোশিকে নিয়ে সন্ধ্যায় সময় ব্যাডমিন্টন খেললেন। এবং নিজের থেকেই যেচে নেমন্তন্ন নিয়ে পরেশবাবুর বাড়িতে রাত্রিবেলা ভাত খেলেন। ডিভিসনাল ডেপুটি মিস্টার মিটারের আচরণে উপরওয়ালা অহমিকা একেবারে নেই বললেই চলে।

সুতরাং, পরেশবাবু তাঁর দাবি একটু মন খুলে বলতেই সাহস পেয়ে গেলেন।—বড়ই অসুবিধায় পড়বো, যদি আমাকে তাড়াতাড়ি, অন্তত খড়্গপুরের কাছাকাছি কোথাও বদলি না ক'রে দেন।

—বদলি হবার জন্যে এত ব্যস্ততা কেন আপনার? খড়্গপুরের কাছাকাছিই বা যেতে চাইছেন কেন?

—বড় মেয়েটি অনেক বড় হয়ে উঠেছে, এইবার বিয়েটা আর না দিলেই নয়। পাত্রের খোঁজ খবর নেওয়া অথবা মেয়ে-দেখানো, এই সব ঝঞ্ঝাটগুলো একটু সহজেই সেরে ফেলতে পারতাম, যদি বাংলা দেশের একটু কাছাকাছি জায়গায় থাকতে পেতাম।

হেসে ফেললেন শ্রীযুক্ত মিত্র—তাই বলুন।

ট্রের উপর চায়ের কাপ আর খাবারের প্লেট সাজানো, দু'হাতে ট্রে ধরে আস্তে আস্তে ঘরের ভিতর ঢুকে শ্রীযুক্ত মিত্রের সামনে ট্রে নামায় রেণু। তারপরেই হাত তুলে শ্রীযুক্ত মিত্রকে নমস্কার জানিয়ে পরেশবাবুব পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

পরেশবাবু বলেন—এই হলো আমাব বড় মেয়ে বেণু।

শ্রীযুক্ত মিত্র বেশ সম্ভ্রমের সঙ্গেই হাত তুলে রেণুকেও একটা ছোট নমস্কারে পাল্টা অভিবাদন জানান।

চা খেতে খেতে কেমন যেন হয়ে গেলেন শ্রীযুক্ত মিত্র। কখনো মনে হয়, একেবারে আনমনা হয়ে রয়েছেন, কখনো চিন্তাকুল। পরেশবাবু একটা প্রসঙ্গ তুলতেই কথার মাঝখানে দু' একবার হাসলেন শ্রীযুক্ত মিত্র, কিন্তু হাসিটাও যেন নিতান্ত খামকা একটা লজ্জায় এলোমেলো হয়ে গেল।

রেণু অন্য ঘরে চলে যাবার পরেও শ্রীযুক্ত মিত্র অনেকক্ষণ বসে রইলেন, পরেশবাবুর সঙ্গে আলাপ উপভোগ করার জন্যই নিশ্চয়। কিন্তু আলাপটাই বাদ পড়ল সব চেয়ে বেশি। দু'বার জল চাইলেন শ্রীযুক্ত মিত্র। চাকরে এসে জল দিয়ে গেল। আর একবার সামান্য একটু মশলা চাইলেন শ্রীযুক্ত মিত্র—এই একটা এলাচ আর দু'টো লবঙ্গ হলেই হবে। পরেশবাবুর ছোট মেয়ে বুলি এসে মশলার কৌটা শ্রীযুক্ত মিত্রের সামনে রেখে দিয়ে চলে গেল।

ঘরের দরজার দিকে শ্রীযুক্ত মিত্রের চোখের দৃষ্টিটা হঠাৎ এক একবার তৃষ্ণার্তের মতো ছুটে যায়। কখনো বা একেবারেই আনমনা হয়ে যেন নিজের মুগ্ধ মনের একটা কল্পনার দিকেই তাকিয়ে থাকেন। দুটি বড় বেণী, বেণীর প্রান্তে নার্গিসের কুঁড়ি, একটা সুন্দর মুখ আর চোখের বড় বড় পাতা, আসমানী নীল একটা শাড়ি, আর অদ্ভুত ভঙ্গীতে রেশমী জালির একটা ওড়না জড়ানো গায়ে। কল্পনাকেও মুগ্ধ করে দেবার মতো একটি মূর্তি বটে।

ওঠবার সময় শ্রীযুক্ত মিত্র বললেন—মনে রইল আপনার অনুরোধের কথা।

তারপর একটু ভেবে নিয়ে বললেন—আমারও একটা অনুরোধ আছে আপনার কাছে। কিন্তু আজ আর কিছু বলতে চাই না। আমাকে এখনি রওনা হতে হবে, এই প্যাসেঞ্জারেই নাগপুর পৌঁছিয়ে দুপুরের আগেই একটা কাজ সেরে ফেলতে হবে।

এক সপ্তাহ পরেই আবার সুলতানপুরে দেখা দিলেন ডিভিসনাল ডেপুটি শ্রীযুক্ত মিত্র। এবার এসে ব্যাডমিণ্টনও খেললেন না, এবং একটা ফাইলও স্পর্শ করলেন না। সারাটা দিন ইনস্পেকশন বাংলো'র ভিতরে বসে আর শুয়েই কাটিয়ে দিলেন।

সন্ধ্যা হবার আগেই বেড়াতে এলেন স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে। ডাক দিলেন পরেশবাবুকে এবং কিছুক্ষণ বেড়াবার পর প্ল্যাটফর্মের উপরেই দু'জনে দু' চেয়ারে বসলেন গল্প করার জন্য।

শ্রীযুক্ত মিত্র বললেন—সেই অনুরোধের কথাটাই বলতে চাইছি।

—বলুন।

—আপনাকে এখান থেকে বদলি না ক'রেও যদি আপনার মেয়ের বিয়ের একটা সুযোগ এনে দিই, তাহ'লে কি আপনার আপত্তি আছে?

—কিছুই না।

—আপনি কি জানেন যে, পাঁচ বছর হলো আমার স্ত্রী বিগতা হয়েছেন।

—না, তা' তো জানতুম না।

—আমার কোন ছেলেপিলেও নেই।

—তাহ'লে দেখছি আপনি নিতান্তই…একেবারে নিতান্তই একটা বেদনার মধ্যে রয়েছেন।

—ঠিকই বলেছেন। কিন্তু আর এভাবে থাকতে চাই না।

—থাকা উচিত নয় বলেই মনে করি।

—তাই অনুরোধ, আমার সঙ্গেই যদি আপনার মেয়ের বিয়ে দিতেন, তাহ'লে আমি সুখী হতাম।

পরেশবাবু বিচলিত হয়ে ওঠেন—আপনি অনুরোধ বলছেন কেন, এ আপনার অনুগ্রহ। আমি সত্যিই এতটা আশা করতে পারি নি। আমার কোনই আপত্তি নেই, থাকতেও পারে না।

শ্রীযুক্ত মিত্র—আপনার মেয়েব কি কোন আপত্তি থাকতে পারে?

হঠাৎ গম্ভীব হয়ে পড়েন পরেশবাবু। কুণ্ঠিতভাবে বলেন—আমাব তো মনে হয় না যে, বেণুব মনে কোন আপত্তি থাকতে পারে। কিন্তু ··।

হঠাৎ যেন ভাষা হারিয়ে চুপ হয়ে রইলেন পরেশবাবু। প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে, পাওয়ার হাউসটাও ছাড়িয়ে মস্ত বড় দেওদাবেব ছায়ার মধ্যে যে কালো পাথরটা পড়ে রয়েছে, সেই দিকে হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে পবেশবাবুর।

কালো পাথবটার উপব দাঁড়িয়ে আছে দুই মূর্তি, ঠিক সেই রকমেই পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রামটেক পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে আছে দু'জনে। ছোকরা তাববাবু অনুপম, আব স্টেশন মাস্টারের বড় মেয়ে রেণু।

শ্রীযুক্ত মিত্র প্রশ্ন করেন – চুপ কবে গেলেন কেন?

পবেশবাবু বলেন—না না, বেণুব মনে কোন আপত্তিই থাকতে পারে না। আমার মেয়ে সে-রকমেব মেয়ে নয়। তবে···।

শ্রীযুক্ত মিত্র—আবার চুপ কবলেন যে?

পবেশবাবু—তবে, এই মাত্র কিছুদিন হলো একটি ছেলের সঙ্গে বেণুর আলাপ-পবিচয় হওয়ায় মাঝে মাঝে আমি দুশ্চিন্তা বোধ কবেছি। যদিও ব্যাপারটা কিছুই নয়, সামান্য আলাপ-পবিচয় মাত্র; মনেব ব্যাপার কিছু ঘটে নি।

শ্রীযুক্ত মিত্রের মুখটা হঠাৎ বড় বেশি বিষণ্ণ হয়ে ওঠে। শ্রীযুক্ত মিত্র বলেন—সে সব তো আপনাব হাত, আপনি ইচ্ছে করলেই তো আলাপ-পবিচয়েব সুযোগ বন্ধ কবে দিতে পারেন।

পবেশবাবু—পাবতাম, কিন্তু পাবি নি এই ভেবে যে, মিছিমিছি বাধা দিলে, যেটা চাইছি না সেটাই হয়ে দাঁড়াতে পাবে।

শ্রীযুক্ত মিত্র—এটাও ঠিকই বলেছেন।

পবেশবাবু—আর আলাপ-পরিচয়ের যে সুযোগ বন্ধ ক'রে দেবার কথাটা বললেন, সেটার উপর আমার চেয়ে আপনাবই বেশি হাত।

বিস্মিত হন শ্রীযুক্ত মিত্র—কি রকম ?

পরেশবাবু—ছেলেটি হলো, এই সুলতানপুর স্টেশনেরই সিগন্যালার ক্লার্ক।

শ্রীযুক্ত মিত্র—নামটা কি ?

পরেশবাবু—অনুপম বসু।

শক্ত একটি অফিসারি ভ্রূকুটি নির্মম ভঙ্গীতে ফুটে ওঠে শ্রীযুক্ত মিত্রের কপালের চামড়া কুঞ্চিত ক'রে দিয়ে। তারপরেই বলেন—তিন দিনের মধ্যেই সে ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

তিন দিন পরেই ডিভিসনাল অফিস থেকে অর্ডার এল, সিগন্যালার ক্লার্ক অনুপম বসুকে বদলি করা হয়েছে মথুরাগঞ্জে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মথুরাগঞ্জে এসে কাজে হাত দিতে হবে। জরুরী অর্ডার। মথুরাগঞ্জ হলো সুলতানপুর থেকে প্রায় দু' শো মাইল দূরের এক স্টেসন।

রওনা হবার আগে, এবং এক্সপ্রেস ট্রেনে উঠবার আগে প্ল্যাটফর্মের উপর অনেকক্ষণ ছটফট ক'রেছিল অনুপম। একটা কথা বলে যাবারও সুযোগ পাওয়া গেল না। কাল রাতেই রেণুকে সঙ্গে নিয়ে নাগপুর চলে গিয়েছেন পরেশবাবু, ডাক্তারের কাছে রেণুর চোখ পরীক্ষা করাতে হবে। কিন্তু চোখ পরীক্ষা করিয়েও আজ সন্ধ্যার মধ্যেই তো অনায়াসে ফিরে আসতে পারতেন। যা কল্পনা করতেও পারছে না রেণু, এসে দেখবে তাই সত্য হয়ে গিয়েছে। না ব'লে ক'য়ে বিশ্বাসঘাতকের মতো লোকটা চলে গিয়েছে। জরুরি অর্ডার এসে গিয়েছে। কি হিংস্র অর্ডার!

এক্সপ্রেস ট্রেনের ভিতরে বসেও নিজেকে শান্ত করতে অনেকক্ষণ সময় লাগে অনুপমের। নাগপুরের দিক থেকে আগন্তুক প্যাসেঞ্জার ট্রেনটাও হু হু শব্দে এক্সপ্রেসের পাশ কাটিয়ে সুলতানপুরের দিকে চলে গেল। একবার শুধু চমকে উঠেছিল অনুপম। রেশমী জালির ওড়না গায়ে জড়ানো একটা মূর্তি কি প্যাসেঞ্জার ট্রেনের একটা কামরার আলোর সঙ্গে চকিত বিদ্যুতের মতো দেখা দিয়ে উধাও হয়ে গেল ? চোখ পরীক্ষা করিয়ে নাগপুর থেকে ফিরে যাচ্ছে রেণু ? তাই তো মনে হলো। ইস, যদি আর তিনটে ঘণ্টা আগে ট্রেনটা সুলতানপুরে ফিরত !

যাই হোক্, মথুরাগঞ্জ থেকে অনুপমকে আর সুলতানপুরে ফিরে আসতে হয় নি। সপ্তাহ পরে নয়, এক মাসের মধ্যেও নয়। এসেছিল প্রতি সপ্তাহে

একটি ক'রে চিঠি, সে চিঠির সদ্‌গতিও ক'রে দিয়েছেন পরেশবাবু, ছিঁড়ে কুচি কুচি ক'রে আর পায়ের পাশে বাজে-কাগজের ঝুড়ির মধ্যে নিক্ষেপ করে।

অপরাহ্ণ-বেলায় প্ল্যাটফর্মের প্রান্তে দাঁড়িয়ে রামটেক পাহাড়ের মাথার উপরে আকাশের বুকে আস্তে আস্তে ভেসে-যাওয়া সাদা মেঘ আর কালো মেঘগুলিকে আরও দেখেছে রেণু। একদিন দু'দিন তিনদিন। তারপর আর নয়। মেঘগুলিও তার নাগাল পাবে না, বোধ হয় এমনই একটা দূর জগতে গিয়ে বসে আছে মানুষটা? সহ্য করছেই বা কি ক'রে? কালিদাসের যক্ষও তো মেঘের কাছে মনের কথা না ব'লে থাকতে পারে নি। কিন্তু এই মানুষটা নিজেকে এত নীরব ক'রে রাখতে পারছে কেমন ক'রে? এত সহজে আর এত শিগগির সবই ভুলে গেল, একটা চিঠিও যে লিখতে পারল না, সে মানুষ মেঘদূতের গল্প ব'লে কি আনন্দ পেত, এ রহস্য এখন আর বুঝে উঠতে পারে না রেণু।

জরুরি অর্ডার এল, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চলে যেতে হবে, এটাই বা কোন্ রহস্য? চিন্তা করে রেণু।

এক মাস, দু'মাস, তিন মাস। এরই মধ্যে ঘটনাগুলি একে একে বদলে যেতে শুরু করে। শ্রীযুক্ত মিত্র প্রতি মাসেই অন্তত দু'বার ক'রে এসেছেন। পরেশবাবুর সঙ্গে অনেক আলোচনা আর অনেকবার আলোচনা হয়েছে তাঁর। এর মধ্যে বেশির ভাগই রেলের কাজের বাইরের বিষয় নিয়েই আলোচনা।

রামটেক পাহাড়ের মাথার উপরেও আর মেঘ দেখা যায় না। নাইডুর কোয়ার্টারে মেয়েদের তাস খেলার আসর আবার জমে ওঠে। রেণুকে দেখা যায় সেই আসরে। সুলতানপুরের সন্ধ্যাগুলি সেই অনেকদিন আগের মতোই এদিক-ওদিকে বেড়িয়ে ঘোরার আনন্দে কেটে যেতে থাকে। এবং পরেশবাবু দেখে খুশি হন, রেণুর মনের ভিতরে কোন মেঘ যদি আগে দেখা দিয়েও থাকে, তবুও সে মেঘ এখন আর নেই। রামটেক পাহাড়ের উপর প্রকাণ্ড আকাশ ক'দিন থেকে একেবারে ঝকঝকে ও পরিষ্কার।

আর বেশিদিন দেরি হয় নি। এই আশ্বিনটা ফুরিয়ে যাবার আগেই, সুলতানপুরের স্টেশন মাস্টারের কোয়ার্টার ফুল আর পাতা দিয়ে একদিন সাজানো হলো। সারারাত আলো জ্বলল। ভাড়াটে বাঁশিওয়ালা দিনরাত বাঁশি বাজিয়ে সুলতানপুর স্টেশনের হৃদয়ে উৎসব জাগিয়ে তুলল। তারই

[illegible] বরবেশে দেখা দিলেন শ্রীযুক্ত মিত্র, এবং বধূবেশে তাঁর পাশে বসল পরেশবাবুর বড় মেয়ে রেণু।

বিয়ের রাত ভোর হতেই শ্রীযুক্ত মিত্র প্রসন্ন মনে তাঁর নবপরিণীতা রেণুর মুখের দিকে মুগ্ধভাবে তাকিয়ে বলেন।—চল, আজ এই সকালেই রামটেক পাহাড়ে বেড়িয়ে আসি।

রেণু বলে—চলো, কিন্তু বাবাকে একবার জিজ্ঞাসা ক'রে নাও।

শ্রীযুক্ত মিত্র বলেন—জিজ্ঞাসা করেছি।

রেণু—কি বললেন বাবা?

শ্রীযুক্ত মিত্র—বললেন, হ্যাঁ, রেণুও রামটেক পাহাড়ের শোভা দেখতে খুব ভালবাসে।

রেণু হাসে—আশ্চর্য, বাবা দেখছি এখনো মনে ক'রে রেখেছেন। কিন্তু তবে কেন…।

কি বলতে গিয়ে আর কি-যেন ভেবে চুপ ক'রে গেল রেণু। মুখের হাসিটাও অন্য রকমের হয়ে যায়।

শ্রীযুক্ত মিত্র বলেন—কি বললে রেণু?

রেণু—তবে কেন বাবা বদলি হতে চেয়েছিলেন?

শ্রীযুক্ত মিত্র হাসেন—ভাগ্যিস আমি ওঁর বদলি বন্ধ ক'রে দিয়েছিলাম।

রেণু—বদলি করা বা না-করার কর্তা কি তুমিই?

শ্রীযুক্ত মিত্র—হ্যাঁ।

চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে রেণু। শ্রীযুক্ত মিত্র বলেন—চল রেণু, আর দেরি না ক'রে…।

আরও কিছুক্ষণ নীরব হয়েই থাকে রেণু। শ্রীযুক্ত মিত্রের হাতের আঙ্গুলে হীরে বসানো দুটো আংটির দিকে দুটো নিষ্পলক চক্ষুর দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে থাকে। হঠাৎ চোখের তারা দুটো চমকে ওঠে, যেন অদ্ভুত একটা কিছু এতক্ষণে দেখতে পেয়েছে রেণু।

আর কোন সন্দেহ নেই, বোঝা গেল এতদিনে, জরুরি অর্ডারের রহস্য লুকিয়ে রয়েছে ঐ হীরের আংটি পরানো আঙ্গুলগুলির মধ্যে। ঐ হাতই সই করেছে সেই ভয়ানক জরুরি অর্ডার, যে অর্ডারে রামটেক পাহাড়ের মাথার উপরে আকাশের সব রঙীন মেঘ শুকিয়ে উবে গেল। যাক্…। ব্যস্তভাবেই রেণু বলে—না আর দেরি ক'রেই বা লাভ কি?

রামটেক পাহাড়ে পৌঁছতে খুব বেশি দেরি হয় নি, আর উপরে উঠতে পা ব্যথা করলেও চারদিকের চোখ-ভোলানো শোভায় সে ব্যথাও ভুলে যেতে পারল রেণু।

শ্রীযুক্ত মিত্র বলেন—এই রামটেক পাহাড়ই হলো রামগিরি।

চমকে মুখ ফিরিয়ে নেয় রেণু।

শ্রীযুক্ত মিত্র বলেন—এই রামগিরিতেই তপস্যা করতো শম্বুক। সে গল্প জান তো রেণু?

রেণু—একটু একটু জানি।

শ্রীযুক্ত মিত্র উৎসাহের সঙ্গে বর্ণনা করতে থাকেন।—বেচারা শম্বুক এখানেই তপস্যা করতো। এই মাত্র তার অপরাধ যে, সে শুধু তপস্যা করতো। মাত্র এই অপরাধেই রামচন্দ্র শম্বুককে একদিন হত্যা করলেন।

চুপ ক'রে শুনতে থাকে রেণু। শ্রীযুক্ত মিত্রও কিছুক্ষণ যেন ভাবাভিভূত অবস্থায় চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকেন। তারপর আবার নিজের মনের উৎসাহেই বলতে থাকেন।—উঃ, ছেলেবেলায় দেখা সেই যাত্রা-গানের কথাই মনে পড়ছে, কি করুণ সেই কথাগুলি!

রেণু—কা'র কথা?

শ্রীযুক্ত মিত্র—শম্বুকের কথা। রামের বাণে আহত হয়ে মরে যাবার আগে শম্বুক বলছে; দোষী নাহি জানিল কি দোষ তাহার!

রেণু বলে—চলো, এবার নেমে যাই।

শ্রীযুক্ত মিত্র আরও উৎসাহিত হয়ে বলেন—কিন্তু রামগিরি আজও শম্বুকের সেই ব্যথার চিহ্ন লুকিয়ে রেখেছে।

হাতের স্টিক দিয়ে পাহাড়ের গায়ের মাটি খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তুলতে থাকেন শ্রীযুক্ত মিত্র। মাটির একটা বড় ঢেলা উপড়ে আসতেই দেখা যায়, কাঁচা আলতার মতো লাল রঙে মাখা রয়েছে রামটেক পাহাড়ের ভেজা-ভেজা মাটি।

শ্রীযুক্ত মিত্র বলেন—লোকে বলে, শম্বুকের রক্ত এখনো রামটেক পাহাড়ের মাটিতে লেগে রয়েছে, এখনো শুকিয়ে যায় নি!

শ্রীযুক্ত মিত্রের মুখের দিকে গভীর কৌতূহলের একটি দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে থাকে রেণু। তার মধ্যে শানিত একটা প্রশ্নের তীক্ষ্ণ মুখ যেন চিক্‌চিক্‌ ক'রে জ্বলছে।

হঠাৎ প্রশ্ন করে রেণু—তুমি কি এই গল্পটা বিশ্বাস কর?

অপ্রস্তুতভাবে শ্রীযুক্ত মিত্র বলেন—গল্প হলো গল্প, এর মধ্যে বিশ্বাস অবিশ্বাসের কি আছে ?

রেণু—গল্পটা ভাল না মন্দ ?

শ্রীযুক্ত মিত্র—বড় করুণ।

রেণু—বলতে বেশ কষ্ট হয় ?

শ্রীযুক্ত মিত্র—হ্যাঁ।

রেণু—তবে বলতে পারলে কি ক'রে ?

বিব্রতভাবে প্রশ্ন করেন শ্রীযুক্ত মিত্র—অ্যাঁ ? কি বললে ?

রেণু বলে—চলো, নেমে যাই।